অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মলয় বসু

আ হ ম দ পা ব লি শিং হা উ স

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৭৮
এপ্রিল ১৯৭১

তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ় ১৩৮১
জুন ১৯৭৪

প্রকাশক
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা

মুদ্রণে
আলহাজ আবদুল গফুর
দি ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭৮, মৌলবী বাজার, ঢাকা—১১

প্রচ্ছদপট
কালাম মাহমুদ

উৎসর্গ—

৺ চিন্মোহন সেহানবীশ
৺ সুরজিৎ বসু ও
শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে—

সূচীপত্র

১

অক্টোবর মহাবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোনো দেশে 'বিপ্লব' হয়েছে—এই কথাটি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, সেই দেশের দীর্ঘ অতীত-ইতিহাসে শোষণ লুণ্ঠন অত্যাচার ও রাজনৈতিক অপশাসন, নিপীড়িত মানুষকে অবধারিত ও ঐতিহাসিকভাবেই এমন এক বেপরোয়া পথে নিয়ে যায়, যাকে কখনো বিদ্রোহ, কখনো বিপ্লব বলে। বিপ্লবের পথ নিশ্চিতভাবেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়—কিন্তু এটা ঠিক যে, কোনো সমাজে শোষণ, অত্যাচার ও অপশাসন যদি থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচারী ক্ষুব্ধ জনগণ যদি সংগঠিত হয় তাহলে 'বিপ্লব' জয়ী হতে বাধ্য। 'বিপ্লব' সার্থক মানেই প্রাক্তন শোষকশ্রেণীর অবলুপ্তি বা অপসারণ। কিন্তু কোনো বিপ্লবের পিছনে যদি একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি না থাকে, নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্ন বা সাধ না থাকে, তাহলে সেই বিপ্লব পরিণামে মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণের ন্যূনতম উন্নতিও করতে পারে না। কিন্তু সব অসম্পূর্ণ বিপ্লবেরই কিছু শিক্ষণীয় দিক আছে—যেটি মানুষের হৃদয় থেকে সঞ্চারিত হয়ে পরবর্তী বিপ্লবগুলিকে আরো সার্থক ও পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে।

আধুনিক মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিপ্লব-চেতনার প্রথম সচেতন উন্মেষ হয়েছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর 'ইংলিশ-রিভলিউশন' থেকে। হাজার বছরের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিজেকে প্রকাশ করেছিলো (১৬৮৮) এক ধর্মীয় খোলসে। তারপর ফরাসী-বিপ্লব। 'ফরাসী বিপ্লব'ই সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ 'বিপ্লব'। এই বিপ্লবই প্রথম প্রাক্তন শাসক ও শোষকদের নির্মমভাবে বিলোপ করার চেষ্টা করেছিলো এবং এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। 'ইংলিশ রিভলিউশন' কেবলমাত্র 'নাগরিক স্বাধীনতা' চেয়েছিলো ; তারা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা

চেয়েছিলো যাতে স্বৈরতন্ত্রী দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ আইনত সিদ্ধ নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করতে পারে। বিক্ষুব্ধ সপ্তদশ শতাব্দির মধ্যবর্তী বছরগুলিতে ইংলণ্ডে একটি নতুন 'আদর্শ' বোধ রূপ নিচ্ছিলো যে 'একটি মানুষ অপর মানুষটির মতোই ভালো, এবং উভয়েরই অধিকার সমান'।[১] আধুনিক যুগে এই মূল্যবোধই 'সামাজিক ন্যায়' বা 'Social justice' নাম পেয়েছে। অবশ্যই 'ইংলিশ রিভলিউশনের' উদ্বেল দিনগুলিতে এই আদর্শ মুষ্টিমেয় কিছু অখ্যাত ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর চিন্তা ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু ইতিহাসের জটিল ঘূর্ণাবর্তে পড়েও এই 'আদর্শ' লুপ্ত হয়ে যায়নি, পরন্তু আধুনিক বিপ্লবগুলিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। 'ফরাসী বিপ্লব'ও রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্য'কে মানুষের প্রাপ্তব্য অন্যতম অধিকার বলে গণ্য করেছিলো। 'ফরাসী বিপ্লব'-এর এই মনোভঙ্গি অবশ্য ইংলিশ 'রিভলিউশন'-এর সেই 'Social justice'-এর উদাত্ত আহ্বানেরই অনুসারী। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব-এর এই 'স্বাধানতা' ও 'সাম্য' বোধ 'ইংলিশ রিভলিউশন'-এর মতো সাংবিধানিক দাবি মাত্র ছিল না। 'ফরাসী-বিপ্লব'-এর শিকড় তৎকালীন সমাজ ও অর্থ নৈতিক জীবনের গভীরে প্রোথিত ছিলো এবং তার ফল হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী।

'ফরাসী বিপ্লবে'ই আমরা প্রথম লক্ষ্য করলাম, বিপ্লবের 'আদর্শ' অতীতচারী না হয়ে ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্য অগ্রবর্তী পথ নির্দেশ করলো। 'ইংলিশ রিভলিউশনের' তাত্ত্বিকরা বিদ্রোহ করেছিলেন অতীতের ন্যায় ও সাম্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'স্টুয়ার্ট' রাজগণ যদি অতীতে প্রচলিত মানবিক স্বাধীনতাকে অন্যায়ভাবে বাতিল না করতেন তাহলে হয়তো 'ইংলিশ রিভলিউশনের' প্রয়োজন হত না। এ থেকেই ঐ 'রিভলিউশনের' সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা যায়। 'আমেরিকান রিভলিউশন' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। আসলে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলি কোনো দেশে বিদেশি অভিযান ও তজ্জনিত মাৎস্যন্যায় কিংবা মানুষের সাধারণ অধিকার হরণের ভুলের জন্যই সংঘটিত হয়েছিলো।

কিন্তু 'ফরাসী-বিপ্লব' ঘটনাপ্রবাহের পারম্পর্যে ঘটেছিলো। এই বিপ্লবেই প্রথম 'উৎপাদিকা শক্তির চেতনা' (Concept of Productivity) মানুষের মানবিক বিষয় সমূহে প্রধান স্থান দখল করেছিলো। প্রাচীন যুগের যাজকতান্ত্রিক (Hierarchical society) সমাজ ব্যবস্থায় শাসকদের একমাত্র অর্থনৈতিক তৎপরতা ছিলো কেবলমাত্র সামরিক ও প্রশাসনিক খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ তোলবার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে 'কর' আদায় করা। পূর্ব পূর্ব যুগে রাষ্ট্রের মূলধন (wealth) সংগৃহীত হোত মূলত 'বাণিজ্য' থেকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন physiocrats (শরীর বিজ্ঞানী) ও অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ ঘোষণা করলেন 'জাতীয় সম্পদ' (National wealth) কথনই কেবলমাত্র 'বাণিজ্য'

থেকে অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় দেশের 'উৎপাদিত' বস্তুসমূহ থেকে। জাতীয় মূলধন যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োজিত হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় আয়ও লাফিয়ে বাড়ে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে বাণিজ্য থেকে সংগৃহীত অর্থ মুষ্টিমেয়ের হাতে সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব যখন প্রস্তুতি-পর্বে তখন ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত 'শিল্প-বিপ্লব' নানা রকম অর্থনৈতিক তৎপরতা ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দ্রুত তার প্রভাব বিস্তার করছিলো। 'বাণিজ্যিক সম্পদ' (Commercial capital) অতি দ্রুত 'শিল্প সম্পদে' (Industrial capital) পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিলো।

শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী-বিপ্লবের ফলে এমন এক ধনাঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী 'শ্রেণীর' উদ্ভব হলো, যাদের উপার্জন মূলতঃ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক তৎপরতার ফলে অর্জিত হয়েছিলো। এই মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থেই 'রাষ্ট্রের' সম্পদ ও ক্ষমতার ভিত্তি রচিত হয়েছিলো, এবং 'রাষ্ট্র' তখন মূলতঃ এই শ্রেণীর যাবতীয় অর্থনৈতিক তৎপরতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করেছিলো ও নানা স্বাধীনতা প্রদান করেছিলো।

কার্ল মার্কস ১৮৪০ সালে যখন তাঁর সমাজ-চিন্তাকে রূপদান করার কথা ভাবছিলেন তখন তিনি পূর্ববর্তী ঐ বিপ্লবগুলির ঐতিহ্যের একজন উত্তরসূরি ছিলেন। কিন্তু কার্ল মার্কসই প্রথম, একজন শোষিত মানুষকে কেবলমাত্র একজন সামাজিক মানুষ (social being) বলে গণ্য না করে তাকে 'সর্বহারা' (Proletariat) বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে 'সর্বহারা' মানুষ এমন এক 'শ্রেণী', যাদের চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্র এক বা বিশ্বজনীন, যেহেতু তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণাভোগও বিশ্বজনীন [The class which "has a universal character because its sufferings are universal", K. Marx, Early Writings, ed. Bottomore (1963), p. 58.]

কার্ল মার্কস অতঃপর তাঁর বিপ্লবী চিন্তাকে নেতিবাচক রাখলেন না—প্রগতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবর্তকে তিনিই প্রথম এই বিশ্বাসে স্থিত করালেন যে বিপ্লব হচ্ছে 'ইতিহাসের চালিকাশক্তি' [Locomotive of history]। এইভাবে, এই প্রথম পৃথিবীতে 'বিপ্লবের তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত হলো। কার্ল মার্কস অতীত ও সমসাময়িক কালের উন্নত-বুদ্ধির চিন্তাবিৎ এবং শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদদের মতবাদের উপর দাঁড়িয়েই প্রচার করলেন যে 'উৎপাদন'ই হচ্ছে প্রধানতম অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং অন্য স্তরগুলি হচ্ছে এর অনুসারী। কার্ল মার্কস সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর চাবিকাঠি রয়েছে শিল্প-শ্রমিকদের হাতে, এবং প্রতিটি চাষী হচ্ছে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া উৎপাদন ব্যবস্থার এক একটি একক (unit)। কার্ল মার্কস ঘোষণা করলেন যে, উৎপাদন-পদ্ধতিই হচ্ছে সমাজ-গঠনের অন্যতম স্থাপক। তাঁর মতে, 'বিপ্লবের' কাজই হচ্ছে

এই উৎপাদন-পদ্ধতিটিকেও সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' এই বদলে ফেলবার অঙ্গীকারই করা হয়েছে।

কিন্তু কোন্ 'উৎপাদন পদ্ধতিটিকে' বদলে ফেলার কথা মার্কসবাদে বলা হয়েছে সে কথাটি পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা 'প্যাট্রিশিয়ান', 'যোদ্ধা' (Knights), 'প্লিবিয়ন', 'সামন্ত প্রভু', 'অনু-সামন্ত' (vassals) 'গিল্ডকর্তা'দের নিয়ন্ত্রিত সামন্ত-সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নতুন বুর্জোয়া সমাজের। এই সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরণ। এই বুর্জোয়া সমাজ অবশ্যম্ভাবী কারণেই সৃষ্টি করেছে দুইটি বিশাল শত্রু-শিবির। সৃষ্টি করেছে দুইটি বিরাট শ্রেণী— বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত।

ইতিমধ্যে আমেরিকা-আবিষ্কার ও আফ্রিকা-প্রদক্ষিণে বুর্জোয়াদের কাছে সোনার খনি উন্মোচিত হলো। পূর্ব-ভারত ও চীনে বাজার সৃষ্টি, আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন, সেই উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থার ফলে পণ্যের প্রসার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেলো। ফলে বাণিজ্যে, নৌযাত্রায় ও শিল্প ক্ষেত্রে এলো এক দারুণ উদ্যম ; আরম্ভ হলো বুর্জোয়া-সমাজের অবিশ্বাস্য দ্রুত বিকাশ। ফলে অনিবার্যভাবে হস্তশিল্প কারখানার বদলে এলো বাষ্প ও কলের যন্ত্র। ফলে শিল্পোৎপাদনে ঘটলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ছিলো অনিবার্য, কারণ বিশ্বজুড়ে পণ্যের বাজার বাড়ছিলো, বাড়ছিলো পণ্যের চাহিদা। ফলে হস্তশিল্প কারখানার জায়গায় এলো এক একটা গোটা শিল্প-বাহিনীর হর্তা-কর্তা, আধুনিক বুর্জোয়ারা। অর্থনীতির যাদুদণ্ডটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে আসতেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী পরিণত হলো এই বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতের পুতুলে।

এই বুর্জোয়া-সমাজ মানুষের ব্যক্তি মূল্যকে পরিণত করলো বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার বদলে এরা খাড়া করলো একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য। সামন্তযুগে যে শোষণ ছিল ধর্মীয় শোষণে ও রাজনৈতিক বিভ্রমে ঢাকা এরা সেই শোষণকেই নির্লজ্জ, নগ্ন পাশবিক রূপদান করলো। মানুষের কিছু কিছু 'বৃত্তি' যা এতদিন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ছিলো এই বুর্জোয়া-শ্রেণী তার মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিলো। বিজ্ঞানী, কবি, চিকিৎসাবিদ্, আইন-বিশারদ্ ও পুরোহিত-শ্রেণীকে এরা পরিণত করলো তাদের মজুরী-ভোগী-শ্রমজীবী রূপে। আর্থিক সম্পর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো সমস্ত পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে।

বুর্জোয়া-শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। সমস্ত বিশ্বকে তারা করে তুলেছে তাদের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যাকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে,

উৎপাদনের উপায়গুলিকে কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে অনায়াসে। এই শ্রেণী অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত চতুর। উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফৎ এই বুর্জোয়ারা 'সভ্যতায়' টেনে আনছে সভ্য, অসভ্য এবং অসভ্যতম জাতিগুলিকেও। পণ্যের সস্তাদরের কাছে ক্ষুধিত মানুষ, সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে, আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। এর বিরোধীতা করা মানে সেই জাতি বা সভ্যতার ধ্বংস হয়ে যাওয়া। সুতরাং বাধ্য হয়ে তারাও বুর্জোয়া-শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক কথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

কিন্তু এর ফলে বুর্জোয়া-সমাজ নিজের অজান্তেই এমন এক অজানা শত্রুকে গড়ে তুললো যে শত্রু ঘুরে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া-শ্রেণীকেই প্রচণ্ড আঘাত হানলো। সে শত্রু হচ্ছে 'অতি উৎপাদনের মহামারী'। যে বুর্জোয়া-সমাজ এই উৎপাদনের উৎস সে সমাজই তার উৎপাদনকে ধারণ করার পক্ষে অনুপোযোগী হয়ে গেলো। ফলে উৎপাদনের বিপুল অংশকে নষ্ট করে ফেলতে তারা বাধ্য হলো, পরিবর্তে তাদের নতুন নতুন বাজার দখল করতে হলো এবং পুরনো বাজারকে আরো বেশি শোষণের বেড়াজালে ঘেরা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।

এইভাবেই যে অস্ত্রে বুর্জোয়া-শ্রেণী একদা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধুলিসাৎ করেছিল তা এবার তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত হলো। সুতরাং বুর্জোয়া-শ্রেণী শুধু তার নিজের কবর-ই খুঁড়লো না, সৃষ্টি করলো সেই শ্রেণী যাদেরকে বলা হয় 'শ্রমিক শ্রেণী' বা প্রলেতারিয়েত।

বুর্জোয়া-শ্রেণীর পুঁজি বাড়লেই বেড়ে যায় প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা। মেহনতজীবী এ-শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও শ্রমবিভাগের ফলে 'প্রলেতারিয়েত'-এর কাজ তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের আকর্ষণ লুপ্ত হয়। ফলে মজুর পরিণত হয় যন্ত্রের লেজুড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে তাই একটি 'মজুর' বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মত 'পণ্যদ্রব্যে'র সামিল। তাই সেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় 'মজুরের উৎপাদন খরচের'ও একটি সীমা ধরা হয়। সেটা হচ্ছে তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার বংশ রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু রাখা। সুতরাং তাদের কাছে পণ্যের দাম + শ্রমের দাম = উৎপাদন খরচার সমান হয়। তাই কাজের জঘন্যতা যত বাড়ে, মজুরি তত কমে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে চাপ—কখনো খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে বা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ আদায় করে, অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে।

বুর্জোয়া-শ্রেণী নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে চালাবার জন্য

বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তারের একটি সীমা আছে, কেননা পৃথিবী অনন্ত নয়। তাই ধনিক দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধ আসে। অন্যদিকে কিছুদিন পর পর বুর্জোয়া-শ্রেণীর তৈরি ধনতন্ত্রের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র আর্থিক-সংকট। যুদ্ধ ও সংকটের মধ্যে তখন ধনতন্ত্রের সর্বনাশ ঘনীভূত হতে থাকে।

বুর্জোয়া-সমাজের সৃষ্ট ধনতন্ত্রের সংকট যত তীব্র হতে থাকে শ্রমিক শ্রেণী তত সংখ্যায় বাড়ে, সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ধনতন্ত্র যতই শ্রমের পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে, মজুরী কমিয়ে আনে, ততই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থা সর্বত্র সমান হয়ে যেতে থাকে। শ্রমিকের জীবিকা ও জীবন যতই বিপন্ন হতে থাকে ততই তারা বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তখন এই সংঘর্ষ শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধে, অনিবার্য বিদ্রোহের জন্য আগে থাকতেই স্থায়ী সংগঠন গড়ে। শ্রমিক-মালিকের এই লড়াই বহু অগ্নিপরীক্ষা, বহু পরাজয়, লাঞ্ছনা, বিভেদ, দ্বন্দ্ব-সংকট ও অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল চলে শেষে ইতিহাসের অভ্রান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে তখন শাসক-শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দেয়। মজুরদের সংগ্রামকে চূর্ণ করতে তারা যতই হিংস্র হতে থাকে ততই তারা ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। তখন বুর্জোয়া-শ্রেণীর নানা অংশ এসে হাত মেলায় বিপ্লবী-শ্রেণীর সঙ্গে। শ্রমিক-আন্দোলন তখন দুর্বার হয়ে ওঠে। শেষে সমাজের ভিতরে চলতে থাকা কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।

যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় জারের রুশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অনেক পরে, কিন্তু রুশিয়া থেকে 'সার্ফডমের' অবলুপ্তির পর পঁচিশ বছরে (১৮৬৫-১৮৯০) ঐ ধনতন্ত্র বিস্ময়করভাবে তার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ১৮৬৫ সালের আগে সমগ্র রুশিয়ায় কল-কারখানার সংখ্যা ছিল নগণ্য, ফলে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সেই অনুপাতে কম।

১৮৬১ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জারের পরাজয় ও পরপর ঘটতে থাকা কৃষক-বিদ্রোহ জারতন্ত্রকে বাধ্য করেছিল 'সার্ফডমের' অবসান ঘটাতে। কিন্তু কৃষক-দের দাসত্ব-মুক্তি ঘটলেও তাদের অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটলো না। বকেয়া দেনার অজুহাতে ভূস্বামীরা কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত জমির বিরাট অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে এলো এবং দাসত্ব-মুক্তির পণ হিসাবে রুশিয়ার কৃষকদের নগদ কুড়ি কোটি রুবল দিতে বাধ্য করলো। শুধু তাই নয়, এরপর কৃষকরা বাধ্য হলো ভূস্বামীদের জমি ভাড়ার বিনিময়ে চাষ করতে এবং অত্যন্ত আপত্তিকর

শর্তে। অনেক কৃষককে বাধ্য করা হলো ভূস্বামীদের জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনা মজুরীতে নিজেদের যন্ত্রপাতি ও ঘোড়ার সাহায্যে চাষ করাতে।

'সার্ফডমের' অবসানের পর রুশিয়াতে বেশ দ্রুতগতিতে শিল্প-নির্ভর ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করলো। শিল্প-কারখানাগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যাও বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেলো। ১৮৬৫ সালে রুশিয়াতে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো সাত লক্ষ ষাট হাজার। ১৮৯০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চৌদ্দ-লক্ষ তেত্রিশ হাজার।

রুশিয়াতে ধনতন্ত্রের বনিয়াদ, শিল্প-সম্প্রসারণের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। 'সার্ফডম' ও তার অবসানের পরে রুশিয়ার কৃষকদের উপর অত্যাচার শোষণ ও নিপীড়ন সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কৃষকরা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়। ফলে ঐ বিপুল কৃষক-সমাজকে তারা বাধ্য করে গ্রাম ছেড়ে কলে-কারখানায় কাজ করতে। ফলে শিল্পপতিরা এই বিপুল সংখ্যক কৃষকদের শ্রম অতি নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেবার সুযোগ পায়। ফলে শিল্পপতিরাও অল্প বিনিয়োগে মাত্রাতিরিক্ত 'লাভের' আশায় নতুন নতুন শিল্প-স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৮৯০ এর দিকে রুশিয়াতে ব্যাপকভাবে রেলপথ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। এই উদ্যোগের জন্য বিপুল পরিমাণ ধাতু ও রসদের জোগান প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ফলে রুশিয়াতে বিপুলায়তন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে অবিশ্বাস্য হারে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রুশিয়াতে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার জনে।

এই বৃহদায়তন শিল্পকারখানাগুলিতেই যথার্থ অর্থে 'সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী' গড়ে ওঠে। এই শ্রমিকেরা সার্ফডমের আমলে কলে কারখানায় নিযুক্ত শিল্প-শ্রমিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 'শ্রেণী' হিসাবে তৈরি হয়ে যায়। এই সমস্ত শিল্প-শ্রমিকের বজ্রকঠিন ঐক্যবোধ তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক গুণাবলীর জন্ম দেয়।

শিল্প-উৎপাদনের মাত্রা ছাড়া বৃদ্ধি নানা সঙ্কটের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই। অতি-উৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর দাম পড়ে যায়, উৎপাদন ব্যয় বাড়ে—ফলে মজুরের মজুরী কমে। মজুরের অসন্তুষ্টি বাড়ে, আন্দোলন চলে। ফলে মজুর ছাঁটাই হয়, কারখানা বন্ধ হয়—ফলে বেকারী বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে দারিদ্র্য।

লক্ষ্য করবার বিষয় রুশিয়াতে সার্ফডমের অবসানের পর ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটলেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে রুশিয়া অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলো। ধনতন্ত্রের বিকাশে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও রুশিয়ার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশ তখনও কৃষিকার্যেই নিযুক্ত ছিলো। কৃষকের আনুপাতিক হার ১৮৯৭ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ছিলো মোট জনসংখ্যার ৬ ভাগের ৫ ভাগ।

ধনতন্ত্র রুশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হবার ফলে বর্ধিষ্ণু কৃষকরা পরিবর্তিত হলো ধনাঢ্য 'কুলাক' শ্রেণীতে। সৃষ্টি হল গ্রামীণ বুর্জোয়া-শ্রেণীর। তাদের শোষণের ফলে গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকেরাও 'সর্বহারা' বা 'প্রায় সর্বহারা' শ্রেণীতে পরিণত হয়ে গেলো। ১৯০৩ সালে রুশিয়াতে 'কৃষক পরিবারের' সংখ্যা ছিলো প্রায় ১ কোটির মত। লেনিন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন (To the village poor—a pamphlet) এই ১ কোটি 'কৃষক পরিবারের' মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের কোনো 'ঘোড়া' ছিলো না। এই বিপুল সংখ্যক শোষিত কৃষক-শ্রেণীকে লেনিনই বলেছিলেন 'গ্রামীন সর্বহারা' (rural proletariat or semi-proletariat) শ্রেণী।

এইভাবেই সমগ্র রুশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকের উপর দুঃসহ পীড়ন ও শোষণ ধনতন্ত্রের কবর রচনা করলো। সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকরা 'বিপ্লবের' মুখোমুখি এসে পড়লো। রুশিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আরম্ভ হয়ে আশীর দশকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামে পরিণত হলো। কারণ আশীর দশকে রুশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর শেষ সংগ্রামে নামা ছাড়া উপায় ছিলোনা। আশীর দশকে জার-শাসিত রুশিয়ার কলে-কারখানায় শ্রমিকের কার্যকালের ন্যূনতম সীমা ছিলো প্রতিদিন অন্তত ১২½ (সাড়ে বারো) ঘণ্টা। সুতাকলগুলিতে শ্রমিকদের দিনে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটতে হতো। মহিলা ও শিশু শ্রমিকদেরও এই ক্ষেত্রে কোনো রেহাই ছিলনা। তাদেরও কম করে দিনে ১২½ ঘণ্টা শ্রমদান করতে হতো। কিন্তু এই অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে মহিলা ও শিশুরা বয়স্কদের চেয়েও অনেক কম মজুরী পেতো। শ্রমিকদের মজুরীর হার ছিলো কদর্য। একজন শ্রমিক সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মজুরী পেত মাত্র ৭ কিংবা ৮ রুবল। একমাত্র ধাতু-শিল্পের শ্রমিকরা সর্বোচ্চ মজুরী পেতো—মাসে ৩৫ রুবল। কলে-কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কোনো নিয়মকানুন ছিলো না, কোনো রকম জীবন বা নিরাপত্তা 'বীমা' ছিলো না। এমন কি নিজেদের চিকিৎসার ব্যয় পর্যন্ত শ্রমিকদের নিজেদের বহন করতে হতো। শ্রমিকদের বস্তিগুলো ছিলো মানুষের বসবাসের অনুপযোগী। উৎপাদকরা এর পরেও ঐ শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চিত করতো। ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ চালিত দোকানগুলি থেকে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক চড়া দামে দ্রব্য সামগ্রী কিনতে বাধ্য করা হতো, নানা অজুহাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে 'জরিমানা' আদায় করা হতো।

এই অমানুষিক শোষণ পীড়নের ফলে রুশিয়ার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করলো। প্রথমে মালিকদের কাছে নানা দাবিপত্র পেশ। তারপর কর্মবিরতি বা

ধর্মঘট। সত্তর ও আশীর দশকের প্রথম দিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জরিমানা, মজুরী ছাঁটাই, কিম্বা মজুরী কমিয়ে দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হলো। উত্তেজিত শ্রমিকেরা তীব্র হতাশায় কলে কারখানায় ভাঙচুর শুরু করলো। কিন্তু রুশিয়ার অগ্রসর শ্রমিকরা এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলো যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে চাই 'শ্রমিক-সংগঠন'। তার ফলেই রুশিয়াতে নানা শ্রমিক-সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করলো। ১৮৭৫ সালে 'ওডেসা'তে প্রথম শ্রমিক-সংগঠন তৈরি হলো। তারপর নানা শ্রমিক-সংগঠন জেলা থেকে জেলায় তৈরি হয়ে গেলো। 'শ্রেণী-সংগ্রাম' আরম্ভ হলো ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে রুশিয়ায় অন্তত ৪৮টি ধর্মঘট হয়েছিলো যাতে প্রায় আশীহাজার শ্রমিক জড়িত ছিলো। ধর্মঘট যত ব্যাপক হতে লাগলো শাসক শক্তির দমন-পীড়নও তত বাড়লো। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দমন করতে এইবার সৈন্য-বাহিনীকেও কাজে লাগাতে হলো। তাতেও যখন শ্রমিক শ্রেণীকে দমানো গেলো না তখন জার-সরকার শ্রমিকদের উপর অন্যায়ভাবে ধার্য 'জরিমানা'র উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। তার ফলে শ্রমিকদের প্রদেয় জরিমানা উৎপাদকের পকেটে না গিয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত হলো।

ইতিহাসের এই সন্ধিকালে রুশিয়াতে এই প্রথম মার্কসবাদী শ্রমিক-সংগঠন গড়ে তুলবার প্রয়োজন অনুভূত হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে জেনিভা-প্রবাসী জি. ভি. প্লেখানভ ১৮৮৩ সালে রুশিয়াতে প্রথম 'মার্কসবাদী গোষ্ঠী' গড়ে তুললেন। এই 'গোষ্ঠী' রুশিয়াতে মার্কসবাদ প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। এই 'মার্কসবাদী গোষ্ঠী'ই রুশিয়াতে প্রথম মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলো। সেই অনুবাদের তালিকায় ছিলো 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', 'ওয়েজ অ্যাণ্ড লেবার', 'ক্যাপিটাল স্যোসালিজম', 'ইউটোপিয়ান অ্যাণ্ড সাইন্টিফিক' প্রভৃতি ছোট বড় গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলি মুদ্রিত হয়েছিলো বিদেশে এবং অত্যন্ত গোপনে এইগুলি সম্প্রচারিত হয়েছিলো রুশিয়ায়।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই সমস্ত পুস্তিকার মাধ্যমে রুশিয়ার জনগণ জানলেন যে, 'স্যোসালিজম' বস্তুটি স্বপ্নবিলাসী (ইউটোপিয়ান) মানুষদের স্বপ্নসৃষ্ট বিষয় নয় পরন্তু 'স্যোসালিজম' হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবধারিত ফলশ্রুতি। তারা এই অসম্ভব সম্ভাবনার কথা প্রথম শুনলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই ধনতন্ত্রের মৃত্যুবান নিহিত আছে এবং প্রতিটি সর্বহারা ব্যক্তির হৃদয়ই হচ্ছে ধনতন্ত্রের কবরস্থান। তাঁরাই মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন যে, একমাত্র সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রাম ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে অবিরাম লড়াইয়ে সর্বহারার বিজয়ী হওয়াটাই হচ্ছে ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে মানবতার মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়।

মার্কস এঙ্গেলস একথাও শেখালেন যে, এজন্য সর্বহারাদের নিজের শক্তি

সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, সচেতন হতে হবে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ বিষয়ে এবং সংঘবদ্ধ হতে হবে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে দাঁত চেপে লড়াই-এর জন্য। এবং এই লড়াই লড়লে ধনতন্ত্রের সমূলে পতন ঘটবে অবধারিতভাবেই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পতন ঘটলেও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার 'সম্পদ' (Property) কে শান্তিপূর্ণভাবে 'জনগণের সম্পদে' পরিবর্তিত করার কঠিন কাজটি করতে হবে 'সর্বহারার বিদ্রোহ' ঘটিয়ে—বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোষহীন নির্মমতা দেখিয়ে। এবং সেটা করতে গেলে সর্বপ্রথম চাই—সর্বহারাদের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা, যাকে বলা চলে 'সর্বহারা শ্রেণীর ডিক্টেটারশিপ'। এই প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে এবং শোষক-শ্রেণীর সবরকম শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করলে তবেই আসবে—কমিউনিস্ট-সমাজ। মার্কস, এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন যে সর্বহারা শিল্প-শ্রমিকরাই সবচেয়ে শক্তিশালী বিপ্লবী এবং সেইহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সবচেয়ে অগ্রসর 'শ্রেণী'। এই শ্রেণীই পারে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ সব শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে ধনতন্ত্রের উপর ঝড়ের মতো আঘাত করতে। কিন্তু পুরানো সমাজকে গুঁড়িয়ে দিয়ে একটি নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে প্রথমেই প্রয়োজন হয় সর্বহারাদের গঠিত একটি 'শ্রমজীবী পার্টি' বা দলের। যে দল বা 'পার্টি'কে মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন—'দি কমিউনিস্ট পার্টি'।

রুশিয়ায় 'কমিউনিস্ট পার্টি' গঠনের পূর্বে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ দল ছিলো 'নরোদ্‌নিক পার্টি'। রুশিয়ায় যখন ধনতন্ত্র বিকশিত হচ্ছিলো এবং শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী ও অগ্রসর শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছিলো তখনও 'নরোদ্‌নিক' নেতৃবৃন্দ এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসেছিলেন যে রুশিয়ার বিশাল বিপুল কৃষক-শ্রেণীর বিপ্লবই পারে জারতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করতে। আসলে 'নরোদ্‌নিক'রা শ্রমিক-শ্রেণীকেও বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারেননি কৃষক-শ্রেণীকেও। বুঝতে পারেন নি যে কৃষক-শ্রেণী যদি শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত না হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যদি অর্জিত না হয় তাহলে রুশিয়া থেকে 'জারতন্ত্রের' অবসান ঘটানো অসম্ভব।

'নরোদ্‌নিক'দের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভুল কাজকর্মের জন্য রুশ-বিপ্লব অনেক পিছিয়ে গেলো। কেননা রুশিয়ার নবজাত 'মার্কসবাদ'কে দীর্ঘকাল 'বিপ্লবের' জন্য নয়, 'নরোদ্‌নিক'দের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে 'মার্কসীয় আদর্শ'কে রুশদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিলো। এ সংগ্রাম কঠিন ছিলো, কেননা জার-সরকার কর্তৃক 'নরোদ্‌নিক'রা বিধ্বস্ত হলেও তাদের বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস রুশিয়ার বিপ্লব-পন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিলো। এবং সেই সমস্ত নরোদ্‌নিকরা রুশিয়াতে মার্কসবাদ প্রসারে সর্বাত্মক বাধা সৃষ্টি করেছিলো এবং শ্রমজীবী-শ্রেণীর সংগঠনের কাজকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিলো।

'নরোদ্‌নিক'দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে মানুষটির নাম ইতিহাসে সবচেয়ে

উজ্জ্বল, সেই প্লেখানভ, রুশিয়াতে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নরোদ্‌নিকদের বাধা দেওয়া ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে তছনছ করে দেবার জন্য তাঁর রচিত পুস্তকগুলি অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। ১৮৯৫ সালে মুদ্রিত প্লেখানভের বই "On the development of the Monistic view of History" সম্বন্ধে পরবর্তীকালে লেনিন বলেছিলেন যে এই বইটি "rear a whole generation of Russian Marxists." (Lenin—Collected works, Russ. ed., Vol. XIV, p. 347) প্লেখানভের—"Emancipation of Labour" গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে এই গোষ্ঠী "Only laid the theoretical foundations for the Social-Democratic movement and made the first step towards the working class movement".

লেনিনের পূর্বে মার্কসবাদ ও শ্রমজীবী-শ্রেণীর সংগ্রামকে একত্র করার তত্ত্বটিকে প্লেখানভ প্রতিষ্ঠা করলেও তাকে বাস্তবে পরিণত করার গুরু দায়িত্বটি এসে পড়লো ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ওপর। মার্কসবাদী লেনিনের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা রুশিয়াকে এর পর অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব-সংগঠনের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেলো। আমরা এই ঘটনা-ক্রমগুলিকে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত করেছি—

(১) ১৮৯৫ সালে লেনিন সর্বপ্রথম সেণ্ট পিটার্সবার্গের সমস্ত মার্কসবাদী শ্রমিক-সংঘগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। কুড়িটি সংঘের সমন্বয়ে একটি 'সংঘ' তৈরি হলো। এইভাবেই লেনিন একটি 'বিপ্লবী মার্কসিস্ট পার্টি' বা দলের গোড়াপত্তন করলেন।

(২) লেনিন-ই সংঘকে প্রথম নির্দেশ দিলেন, অন্যান্য শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে যাতে করে সেই আন্দোলনগুলি একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব পায়।

(৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশক ছিলো রুশিয়াতে ঘটতে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপযুক্ত পটভূমি। ১৮৯৫-১৮৯৯ সাল ছিল রুশিয়াতে শিল্পের চরম বিকাশের যুগ। এই বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে বেড়েছিল শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা। এর ফলে শ্রমজীবী শ্রমিকের আন্দোলনও শক্তি সঞ্চয় করছিলো। সেই সময়ে আনুমানিক ২,২১,০০০ শ্রমিক বিভিন্ন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলো। শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফলে মার্কসবাদীদের এই ধারণাই রুশ জনগণের অন্তরে বদ্ধমূল হচ্ছিলো যে কারা বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে।

লেনিন এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'লীগ অফ স্ট্রাগল' শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে মদৎ দিয়েও তাকে 'জারতন্ত্র

উচ্ছেদের' রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেলো। 'লীগ অফ স্ট্রাগল' শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললো।

৪। এরপর থেকে 'লীগ অফ স্ট্রাগল' লেনিনের সতর্ক নির্দেশনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করলো। একটি কারখানায় ধর্মঘট হলে সেই কারখানার 'লীগের' সদস্যরা প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে জানাতেন উৎপাদকরা কিভাবে শ্রমিকদের শোষণ করছেন, ব্যাখ্যা করতেন কিভাবে শ্রমিকদের লড়াই চালাতে হবে এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত করতেন শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার সনদপত্র। এই প্রচার-পুস্তিকাগুলির মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের দুর্বলতাগুলিকে শ্রমিকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হতো।

৫। এইভাবে সেণ্ট পিটার্সবার্গের 'লীগ অফ স্ট্রাগল' লাগাতার বিক্ষোভ, আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে রুশিয়ার প্রথম সর্বহারা বিপ্লবী 'পার্টি' গঠনের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করে ফেললো। সেণ্ট পিটার্সবার্গের 'লীগ অফ স্ট্রাগল'-এর বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে রুশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চল-গুলিতে 'মার্কসবাদী সংগঠন' তৈরি হয়ে গেলো।

৬। ১৮৯৮ সালে লেনিন যখন সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে তখন Russian Social Democratic Labour Party (R.S.D.L.P.)-র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো রুশিয়ার মিনশ্‌ক শহরে। এই কংগ্রেস রুশিয়ার সমস্ত মার্কসবাদী স্যোসাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলিকে একটি 'পার্টি'তে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু 'পার্টি' সেই কংগ্রেস থেকে তৈরি হতে পারেনি।

৭। সমস্ত রুশিয়াতে ছড়িয়ে থাকা এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী সংগঠন-গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের একটি 'পার্টি' তৈরির প্রয়োজনে লেনিন সরকারীভাবে নিষিদ্ধ পত্রিকা 'ইস্‌করা' প্রকাশ করতে থাকলেন। রুশিয়ার স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির মধ্যে যারা 'Economism'-এর প্রবক্তা তাদের বিরুদ্ধে এবং সর্বহারা শ্রেণীর একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠনের কাজে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিলো অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮। ১৯০০ সালের শুরুতে লেনিন সহ 'লীগ অফ স্ট্রাগল'-এর অন্যান্য কর্মীরা সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে এলেন। লেনিন উপলব্ধি করলেন যে নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত বিরোধে দীর্ণ রুশিয়াজোড়া মার্কসবাদী ছোট ছোট সংগঠনগুলিকে, ঐক্যমতা ও এক পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় আনতে একটি বৃহৎ পত্রিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এমন পত্রিকা জারতন্ত্রের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয় জেনে লেনিন সেই পত্রিকা দেশের বাইরে থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ইতিহাস বলে, 'ইস্‌করা'র নিয়মিত প্রকাশ রুশিয়ায় যে বিপ্লবী-চেতনা সঞ্চার করেছিলো তার প্রচণ্ডতার সম্মুখে সমগ্র জারতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। এই 'ইস্‌করা' পত্রিকার প্রকাশই রুশিয়াতে ঐক্যবদ্ধ

'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি' গঠনের কাজটি সুসম্পন্ন করেছিলো।

৯। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে ইউরোপের এক প্রচণ্ড মন্দা শিল্প-জগৎকে আঘাত করলো, এবং এই সঙ্কট রুশিয়াতেও বিস্তৃত হয়ে পড়লো, বিশেষ করে ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে। এর ফলে সেই সময়ে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেলো এবং প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লো। যে কারখানাগুলি চালু ছিল তার শ্রমিকদের 'মজুরী'ও ভয়ংকরভাবে কমিয়ে দেওয়া হলো। লাগাতার আন্দোলন ও ধর্মঘট করে শ্রমিকেরা পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে যতটুকু সুবিধা আদায় করেছিলো এই শিল্পে মন্দার দরুণ তাও হাতছাড়া হয়ে গেলো। এর ফলে কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলন দুর্বল হলো না পরন্তু বৈপ্লবিক চেহারা লাভ করলো। এতোদিনকার অর্থ নৈতিক দাবি দাওয়ার আন্দোলন এবার রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা নিলো। এই নতুন আন্দোলন শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক-অধিকার ও স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের পতনের শ্লোগান তুললো।

১০। ১৯০১ সালে 'মে'-দিবসের ধর্মঘট অবুখোভ 'মিউনিশন প্লাণ্ট'-এ শ্রমিক ও জারের সৈন্যদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হলো। বলা বাহুল্য, প্রায় নিরস্ত্র এই প্রতিরোধকে জারের সৈন্যরা তছনছ করে দিলো। প্রতিহিংসার আগুনে বহু শ্রমিক বন্দী হলো, বহু শ্রমিক জেল ও নির্বাসনে গেলো। কিন্তু 'অবুখোভে'র শ্রমিকদের এই প্রতিরোধের সাহসী দৃষ্টান্ত রুশিয়ার সমগ্র শ্রমিক সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত ও সহানুভূতিতে উদ্দীপ্ত করলো।

১১। ১৯০২-৩ সালে বাটুম, রোস্টভ, ওডেসা, কিয়েভ, একাটেরিনোস্লাভ-এ ক্রমান্বয়ে সমাবেশ, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট চলতে থাকলো। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আঞ্চলিক সংগঠনগুলি। শ্রমিকদের আন্দোলন এইভাবে 'জারতন্ত্র' উচ্ছেদের বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত হতে আরম্ভ করলো।

১২। শ্রমিক-আন্দোলনের এই প্রচণ্ডতা এবার রুশিয়ার বিপুল সংখ্যক কৃষক সম্প্রদায়ের ভিতর ছড়ালো। ১৯০২ সালে পোল্টাভা, খারকভ্ প্রভৃতি জেলার কৃষকেরা ধ্বংসলীলায় মাতলো। ভূস্বামীদের বাড়ি, খামার আগুনে ভস্মীভূত হলো, জমি জবর দখল হলো, বহু গ্রাম্য জমিদার ও মোড়লের প্রাণ গেলো। এই উন্মত্ত কৃষকদের দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হলো। সৈন্যদের বেপরোয়া গুলিতে বহু কৃষকের প্রাণ গেলো, হাজার হাজার কৃষক বন্দী, এবং তাদের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু তথাপি, বিপ্লবী কৃষক-সম্প্রদায়ের আন্দোলন থামলো না। শ্রমিক ও কৃষকদের এই বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে রুশিয়াতে একটি সর্বাত্মক বিপ্লবের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

১৩। শ্রমিক কৃষকের এই সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন এবার ছাত্র সমাজে

ভীষণভাবে প্রভাব ফেললো। তারাও এবার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়লো। ছাত্র বিক্ষোভ ও তাদের ধর্মঘটের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেন। বহু ছাত্রকে কারাগারে পাঠালেন। উপরন্তু সন্দেহভাজন ছাত্রদের জোর করে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করলেন, অবশ্যই সাধারণ সৈনিক হিসেবে। প্রতিবাদে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘটে সামিল হলেন। ১৯০১-১৯০২ সালের ঐ ধর্মঘটে আনুমানিক ৩০,০০০ ছাত্র অংশ নিলো।

১৪। এতে একটি বিপরীত কাণ্ড ঘটলো। শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন ও বিশেষ করে ছাত্র-সমাজের উপর সরকারী দমন-নীতির বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার হলেন উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও উদারচেতা ভূস্বামীরা। তারা বিশেষ করে ছাত্রদের উপর এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। এর পিছনে একটি কারণ অবশ্য ছিলো—কেননা দমন পীড়নের শিকার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলো তাদের সন্তান-সন্ততি।

১৫। ১৯০৩ সালে Social Democratic Circle-র দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রথম Russian Social Democratic Labour Party গঠিত হলো। 'পার্টি'র কর্মসূচী রচিত হলো এবং সেই সঙ্গে আবশ্যক কিছু কিছু নিয়মাবলীও স্থির করা হলো। সর্বোপরি একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠিত হলো।

১৬। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই R.S.D.L.P. থেকে বলশেভিক ও মেনশেভিক নামে দুইটি দলও তৈরি হয়ে গেলো। প্রথম রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে যখন রুশো-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন এই দুইটি দল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে লাগলো।

১৭। ১৯০০ সালে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রশান্ত মহাসাগর ও মহাচীনের অস্তিত্বকে দ্বিখণ্ডিত করার নির্লজ্জ চক্রান্তে ঐক্যমত হলো তখন রুশিয়ার জার-সরকারও সেই চক্রের অন্তর্ভুক্ত হলো। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধকে এই মিলিত শক্তি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চূর্ণ করে দিলো। এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে রুশিয়ার জার-সরকার দুটি মতলব হাসিল করতে চেয়েছিলো, প্রথমত নিজেকে রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করা ও দ্বিতীয়ত দেশের অভ্যন্তরের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা। কিন্তু ফল হল বিপরীত। যুদ্ধে পরাজিত চীন জারতন্ত্রী রুশিয়ার হাতে তার অনেক অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য ও মাঞ্চুরিয়াতে রেলপথ পাততে দেওয়ার অধিকার দেওয়ায় রুশিয়ার লোভ বাড়তেই লাগলো। সে তার লোলুপ হাত এবার বাড়ালো কোরিয়ার দিকে। এশিয়ার অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান, এশিয়াতে, জারতন্ত্রের এমত প্রসারে খুশি হলো না। ফলে অতর্কিতে 'পোর্ট আর্থার' আক্রমণ করে জাপান রুশো-জাপান যুদ্ধের সূচনা করলো। জারের দুর্বল সৈন্যবাহিনী, ততোধিক অপদার্থ ও

দুঃশ্চরিত্র সেনানায়কদের কর্তৃত্বে থেকে জাপানের হাতে প্রতিটি যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খেতে থাকলো। কিন্তু এই যুদ্ধের সুযোগে পুঁজিপতি, সরকারী আমলা এবং সেনানায়করা প্রভূত পরিমাণে ধনশালী হয়ে উঠলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা খাদ্য ও রসদ পেলোনা। যুদ্ধাস্ত্রের বদলে রুশ সৈন্যদের জন্য এলো গাড়ি ভর্তি অঙ্কিত বা খোদাই করা নানা প্রতিমূর্তি। বিশেষ ট্রেন, আহত সৈন্যদের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হলো জারের সেনানায়কদের লুটের মাল স্থানান্তরিত করার জন্য। এই অসম-যুদ্ধে (মুকদেনের যুদ্ধে) ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ সৈন্য নিহত, বন্দী কিংবা আহত হলো। 'তাসুসিমা'র (Tsushima) প্রণালীতে জাপানীরা রুশিয়ার ২০টি যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে ১৩টিকে ধ্বংস কিংবা ডুবিয়ে দিলো। নিরুপায় হয়ে রুশিয়াকে জাপানের কাছে অপমানজনক শর্তে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হলো। কোরিয়া, পোর্ট আর্থার ও সাকলিন দ্বীপের অর্ধাংশ জাপানের হস্তগত হলো। এর প্রতিক্রিয়া হল সুদূর প্রসারী। রুশিয়ার জনগণ এই যুদ্ধ চায়নি। এবার অনভিপ্রেত যুদ্ধের ভয়ংকর সর্বনাশের দিকটি তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে টের পেলো। এই যুদ্ধের ফলাফলকে বলশেভিক ও মেনশেভিকরা দুভাগে দেখলো।

১৮। ট্রট্স্কির মতো মেনশেভিকরাও জারতন্ত্রের পিতৃভূমি, জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বর্গকে রক্ষা করার জন্য আত্মরক্ষার পথ অনুসন্ধান প্রয়োজন মনে করলেন।

১৯। লেনিন ও বলশেভিকদল ঘোষণা করলেন যে এই লুণ্ঠনজীবী-যুদ্ধে জারতন্ত্রের পরাজয় প্রয়োজন কেননা এই পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র দুর্বল হবে এবং বাড়বে 'বিপ্লবের' শক্তি। হয়েছিলও তাই। জারতন্ত্রের পরাজয় জনসাধারণের কাছে ঐ তন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতাকে নগ্নভাবে প্রকটিত করেছিলো। ফলে জারতন্ত্রের প্রতি জনগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রতিদিন বেড়েই চলেছিলো। 'পোর্ট আর্থারের' পরাজয় প্রকৃতপক্ষে ছিল স্বৈরতন্ত্রের পতনের সূচক। কেননা এই রুশো-জাপান যুদ্ধ রুশিয়ার বিপ্লবকেই ত্বরান্বিত করেছিল। পুঁজিবাদের কঠোর চাপ জারতন্ত্রের নিষ্পেষণে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো। জনগণের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার আর সীমা-পরিসীমা ছিলো না। ১৯০০-১৯০৩ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটকে রুশো-জাপান যুদ্ধ আরো তীব্র করে তুলেছিলো ও জনগণের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। ফলে, রাজনৈতিক-সচেতন শ্রমজীবীরা সমগ্র দেশ জুড়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতে আরম্ভ করলো।

২০। ১৯০৪ সাল থেকে ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলো। প্রথমে বাকু, তারপর পুটিলভ., ধর্মঘটে অচল হয়ে গেলো। জারতন্ত্র অঙ্কুরেই এই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো—পশুশক্তি ব্যবহার করে। Gapon নামে এক ধর্মযাজককে দিয়ে রুশিয়ার পুলিশ এক কুৎসিত

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। 'পুটিলভে' ধর্মঘটের ঠিক প্রাক্কালে Gapon কিছু শ্রমিকদের নিয়ে এক সংগঠন গড়লেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গের সর্বত্র এই সংগঠনের শাখাও গঠন করলেন। যখন ধর্মঘট শুরু হলো তখন Gapon তার সংগঠনের সভায় এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। তাতে বলা হয়েছিলো যে ৯ই জানুয়ারী সমস্ত শ্রমিকরা সমবেত হয়ে গির্জার পতাকা ও জারের প্রতিকৃতি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে 'শীত প্রাসাদে' যাবে এবং জারের কাছে তাদের প্রয়োজনের তালিকা-সমন্বিত একটি আবেদনপত্র পেশ করবে। আশা দেওয়া হয়েছিলো যে মহামান্য জার তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, তাদের কথা শুনবেন এবং তাদের দাবিদাওয়া পূর্ণ করে দেবেন। ধর্মযাজক Gapon শ্রমিকদের উপর পুলিশের নির্বিচার গুলিচালনার একটি ক্ষেত্র পূর্ব-পরিকল্পিত উপায়ে স্থির করে রেখেছিলেন। শ্রমিকদের রক্তে আন্দোলনকারীদের সাহসকে তারা ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

২১। বলশেভিক-মতাবলম্বী শ্রমিকেরা ঐ ঐতিহাসিক মিছিলের আগে শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, স্বাধীনতা জারের কাছে দরখাস্ত করে আসে না, আসে অস্ত্রের শক্তিতে। বলশেভিক-পন্থী শ্রমিকেরা সমাবেশের উপর গুলি চলতে পারে এ বিষয়েও সমস্ত শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ ও হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও জারের প্রতি অন্ধ মোহ শ্রমিকদের 'শীত প্রাসাদের' অভিমুখে নিয়ে গেলো। সেই নিরস্ত্র মিছিলে শ্রমিকদের স্ত্রী পুত্র কন্যারাও অংশ নিয়েছিলো। প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছিলো ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারীর ঐ তারিখে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস শ্রমিকদের প্রত্যাশার জবাব দিলেন সমাবেশের উপর নির্বিচারে গুলি চালনার হুকুম দিয়ে। ফলে এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হলো, দু'হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হলো। সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাজপথ শ্রমিকের লালরক্তে নদী হয়ে গেলো।

সেই সমাবেশে শেষাবধি অনেক বলশেভিক-পন্থী শ্রমিকও অংশ নিয়েছিলেন। তাদেরও অনেকে নিহত হলেন, অনেকে বন্দী হলেন। শ্রমিকদের এই অকারণ বলিদান সুনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলো এই অপরাধের নায়ক কে এবং তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়া উচিত।

২২। শ্রমিকের ঐ রক্তস্রোত বৃথা গেলো না। জারতন্ত্রের অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে জেগে উঠল সমস্ত রুশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণী। দাবাগ্নির মতো এই শ্রমিক হত্যার খবর ছড়িয়ে গেলো রুশিয়ার সর্বত্র। আরম্ভ হলো সর্বাত্মক প্রতিরোধ। সমস্ত রুশিয়া 'ধর্মঘটে' স্তব্ধ হয়ে গেলো। ৪ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নিলো। একটি শ্লোগান সেদিন রুশিয়ার আকাশ বাতাস কম্পিত করতে থাকল—'স্বৈরতন্ত্র খতম কর'। শুরু হয়ে গেলো বিপ্লব।

২৩। ১৯০৫ সালের পর রুশিয়ার শ্রমিকদের বৈপ্লবিক অন্দোলন আরো তীব্র হলো, একটি রাজনৈতিক চেহারা লাভ করলো। অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন রূপান্তরিত হলো রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং অনেক জায়গায় জারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে। বিশেষ করে সেণ্ট পিটার্স-বার্গ, মস্কো, ওয়ার্‌শ., রিগা ও বাকুর মতো বৃহৎ শহরগুলিতে ধর্মঘট সবচেয়ে মজবুত ছিলো। এই ধর্মঘটে ধাতুশিল্প শ্রমিকরা সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করলো। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রামে 'স্যোসাল ডেমোক্রাট'দের প্রভাব ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেলো।

২৪। এরপর থেকে রুশিয়ার অনেক জায়গাতে ঘনঘন জারের সৈন্যদের সঙ্গে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সংঘর্ষ ঘটতে থাকলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটলো পোলাণ্ডের Lodz নামক শিল্প-নগরীতে। সেখানকার শ্রমিকরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তিনদিন জারের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। Lodz নগরীতেই প্রথম সশস্ত্র-সংগ্রামের সঙ্গে সাধারণ ধর্মঘটও চলেছিলো। এই সংগ্রামকে লেনিন রুশিয়ার শ্রমিকদের প্রথম যথার্থ 'সশস্ত্র-সংগ্রাম' বলে গণ্য করেছিলেন।

২৫। বলশেভিক 'নর্দার্ন কমিটি' পরিচালিত Ivanovo-Vozenescusk-এর শ্রমিকদের আড়াই মাসের ধর্মঘট সমগ্র রুশ-দেশের শ্রমিকদের নতুন সংগ্রামী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলো। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য জারের সৈন্যদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে প্রচুর শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছিলো, তবু তারা কাজে ফিরে যায়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা বাধ্য হয়েছিলো কাজে ফিরে যেতে। কিন্তু তাদের সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মত্যাগ সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপ্ত করেছিলো।

২৬। এবার আন্দোলনের আগুন রুশিয়ার কৃষক-শ্রেণীকেও জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত করলো। লক্ষ লক্ষ কৃষক ভূস্বামীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের সম্পদ লুঠ হলো, তাদের প্রাসাদ, খামার জ্বলে খাক হয়ে গেলো, অরণ্য নির্মূল হলো। ভূস্বামীরা আতংকে, প্রাণ বাঁচাতে নগরে আশ্রয় নিলো। জার তার সৈন্যবাহিনী এবং কসাক্‌দের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করলেন। নির্বিচার গুলি চললো, নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো, অমানুষিক নির্যাতন চললো। কিন্তু কৃষক আন্দোলন থামলো না। পরন্তু তা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, ভোল্‌গা এবং ট্রান্সককেশিয়া, বিশেষত জর্জিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

২৭। লেনিনের নেতৃত্বাধীন 'স্যোসাল-ডেমোক্রাট'রা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করলেন না। তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষক-সমাজের উদ্দেশ্যে আবেদন করলেন এই ভাষায়—"To you, Peasants, We Address Our Word!" গ্রামে গ্রামে স্যোসাল-ডেমো-

ক্রাটরা কৃষকদের নিয়ে 'মিটিং' করতে লাগলেন, কৃষকদের মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠী গড়ে তুলতে থাকলেন এবং অবশেষে গঠন করলেন 'কৃষক-সমিতি'। এই কৃষকরাই ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে কৃষক-আন্দোলনের সামিল হয়েছিলো। কিন্তু এটা ছিল রুশিয়ার কৃষক-আন্দোলনের সূচনা মাত্র।

২৮। শ্রমিক এবং কৃষকদের লাগাতার ধর্মঘট ও প্রতিরোধ আন্দোলন এবং রুশো-জাপানী যুদ্ধে জারের সৈন্যবাহিনীর অসহায় পরাভবের প্রতিকূল প্রভাব এবার সৈন্যবাহিনীর উপর এসে পড়লো। ফলে জারতন্ত্রের ভিত্তিভূমিই এবার প্রবল ধাক্কায় নড়ে উঠলো।

২৯। এই ধাক্কার সূচনা হলো যুদ্ধ-জাহাজ 'পটেম্‌কিন'-এর নাবিকদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সময়টা ছিলো ১৯০৫ সালের জুন মাস। 'ওডেসা'-তে যখন শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট চলছিলো তখন 'ওডেসা' বন্দরের অদূরে নোঙর ফেলেছিলো যুদ্ধ-জাহাজ 'পটেম্‌কিন'। যুদ্ধ-জাহাজের নাবিকেরা এমনিতেই তাদের অফিসারদের ঘৃণা করতো। এরই ফলস্বরূপ তারা 'পটেম্‌কিন'কে ওডেসা বন্দরে নিয়ে গেলো এবং ওডেসার শ্রমিকদের বিপ্লবে যোগ দিলো। লেনিন এই ঘটনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন যে রুশিয়ার আন্দোলনকারী এই সমস্ত শক্তিকে নেতৃত্ব দেবার ঐতি-হাসিক দায়িত্ব এবার বলশেভিকদের গ্রহণ করার সময় এসেছে।

৩০। বিদ্রোহী 'পটেম্‌কিন' জাহাজের নাবিকদের দমন করার জন্য জার এবার বেশ কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। সহকর্মী নাবিকদের উপর গোলাবর্ষণ করতে অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের নাবিকরা অস্বীকার করলেন। ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে বিপ্লবের লাল পতাকা 'পটেম্‌-কিন' জাহাজের মাস্তলে পত্‌পত্‌ করে উড়তে থাকলো।

সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনের এই মহান্ সুযোগ রুশিয়ার বিপ্লব-পন্থীরা কাজে লাগাতে পারলেন না। একটি 'পার্টি'র অভ্রান্ত নেতৃত্ব ছাড়া যে সর্বাত্মক বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় না এই ঐতিহাসিক সত্য ১৯০৫ সালের বিপ্লব-পরিস্থিতিকে জার-তন্ত্রের সমূল-উৎপাটনে ব্যবহার করতে না পারার ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হলো।

১৯০৫ সালে সমগ্র রুশিয়া জুড়ে যে আন্দোলন চলেছিলো তাতে বহু 'পার্টি' বা দল নেতৃত্বে ছিলো। 'পটেম্‌কিন' জাহাজের নাবিকদের মধ্যেও মেন-শেভিক, স্যোসাল রিভলিউশনারী, অ্যানার্কিস্ট নানাদলের সমর্থক নাবিকরা ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন কিছু স্যোসাল-ডেমোক্রাট সমর্থকও। কিন্তু বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত অভিজ্ঞতা-সহ দক্ষ কোনো নেতৃত্ব না থাকার ফলে বহু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্ত হলেন। ফলে 'পটেম্‌কিন'-এর বিদ্রোহী নাবিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল—অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের নাবিকদের

বিপ্লবে টেনে আনা গেলো না। উপরন্তু নিঃশেষিত জ্বালানি ও খাদ্যাভাবের ফলে 'পটেম্‌কিন' জাহাজের নাবিকেরা বাধ্য হলেন রুমানিয়া উপকূলে নোঙর ফেলে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। 'পটেম্‌কিন' জাহাজের বিদ্রোহ আত্ম-সমর্পণে শেষ হলো। নাবিকদের জারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বিচারে তাদের কেউ কেউ মৃত্যুদণ্ড পেলেন, অনেককে পাঠান হলো নির্বাসনে।

কিন্তু 'পটেম্‌কিন' জাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ জানিয়ে দিয়ে গেলো যে রুশিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সর্বাত্মক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু দক্ষ নেতৃত্বের।

ইতিহাসের এই ফাঁকে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত নিজেদের প্রতিপত্তিকে বিপ্লবের সর্বনাশ-সাধনে ব্যবহার করার সুযোগ পেলো। বিপ্লবের সম্ভাবনা এই মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো। তারা যখন দেখলো যে জারতন্ত্রও বিপ্লবের সম্ভাবনায় ভীত তখন তারা জারতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইলো। তারা জারতন্ত্রকে বোঝাতে পারলো যে জনগণের দাবির কিছু 'সংস্কার' সাধন করে 'উত্তেজিত' জনগণের তুষ্টিসাধন ও বিপ্লবী-শক্তির মধ্যে 'ভেদ' সৃষ্টি করে বিপ্লবকে বার্থ করা যেতে পারে। এই তথাকথিত উদার মধ্যবিত্তরা আসলে চাইছিলো সন্ত্রস্ত জারতন্ত্রের সঙ্গে 'ক্ষমতা' ভাগ করে নিতে। জারতন্ত্রও তখন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলো যে সন্ত্রাস ও অত্যাচার দিয়ে জন-গণের এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে আর রোধা যাচ্ছে না। তখন তারাও অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালু রেখে ও নানা মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার নির্লজ্জ দ্বিমুখী চক্রান্তে লিপ্ত হলো। অপর দিকে জনগণের কাছে প্রতি-শ্রুতি দিলো যে রুশিয়াতে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক Duma তৈরি করা হবে —কিন্তু সেই Duma-র কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না। এই সমস্ত প্রচেষ্টার একটিই লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী শক্তিকে বহুধা বিভক্ত করা এবং নরম-পন্থী জনগণকে নিজের পক্ষে টেনে আনা।

রুশিয়ার 'বলশেভিক'রা জার-মধ্যবিত্ত নরমপন্থীদের এই ষড়যন্ত্রের অংশভাগ হতে অস্বীকার করলেন। তারা 'ডুমা'কে বয়কট করলেন।

কিন্তু 'মেনশেভিক'রা এই 'ডুমা' গঠনে কোনো বিরোধীতা করলেন না পরন্তু তাতে অংশ গ্রহণেও স্বীকৃত হলেন।

মজার বিষয় এই যে, বলশেভিক ও মেনশেভিকরা বাহ্যত দুটো দলে পরিণত হলেও উভয় দল তখন 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির' পতাকাকে অস্বীকার করেনি। অথচ উভয় দল নিজস্ব স্নায়ুকেন্দ্র ও নিজেদের 'মুখপত্র' তৈরি করে ফেলেছিলো। বলশেভিক ও মেনশেভিকরা রুশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিকে সর্বাত্মক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে অভিন্ন কোনো নীতি গ্রহণ করতে না পারার জন্ন রুশিয়ার সর্বাত্মক বিপ্লবের দিনগুলি বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে গেলো।

বিচক্ষণ বলশেভিক দল এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় অবিলম্বে 'পার্টির' তৃতীয়-কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব করলো। কংগ্রেসে কৌশল-গত যে-নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হবে বলশেভিকরা সে সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে জানালেন। এ থেকেই সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনে বলশেভিকদের আগ্রহ ও সততার প্রমাণ মেলে।

অন্যপক্ষে মেনশেভিকরা পার্টি-কংগ্রেস আহ্বান না করেই কৌশলগত নীতি-নির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন করতে চাইলেন যাতে করে পার্টি-নীতি সমস্ত সদস্যরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মেনশেভিকরা জানতেন পার্টিতে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সুতরাং তাদের নির্ধারিত নীতি সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

সুতরাং বলশেভিকরা নিজেদের উদ্যোগেই তৃতীয়-কংগ্রেস আহ্বান করলেন। মেনশেভিক সদস্যরাও এই কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হলেন ও যথারীতি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে আরেকটি 'কংগ্রেস' অধিবেশনের আয়োজন করলেন।

১৯০৫ সালে লণ্ডনে 'রুশিয়ার স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র 'তৃতীয়-কংগ্রেস' বসলো। এই কংগ্রেসে ২০টি বলশেভিক কমিটির ২৪ জন 'প্রতিনিধি' যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়াও ছিলেন পার্টির অন্যান্য বৃহৎ সংস্থার প্রতিনিধিরা। এই কংগ্রেসে মেনশেভিকরা পার্টি-বিরোধী ভূমিকার জন্য ধিকৃত হলেন।

একই সময় 'জেনিভা'তে মেনশেভিকদের কংগ্রেস চলছিলো। দুই কংগ্রেসে যদিও একই কৌশলগত নীতি-নির্ধারণ নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিলো কিন্তু দুটি দলের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মূল কথাটি ছিলো, যদিও রুশিয়ার চলমান বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক' তথাপি ধনতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে যতটুকু করণীয় তার বেশি অগ্রসর হওয়া এই শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বহারা-শ্রেণীই এই 'বুর্জোয়া'-বিপ্লবকে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই জন্য অবশ্যই সর্বহারা-শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হতে হবে, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সর্বশেষে বুর্জোয়া-বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। সর্বহারা শ্রেণীর এই 'নেতৃত্বের' প্রশ্নটিকে কেবলমাত্র রুশিয়ার কৃষকশ্রেণী অভিনন্দিত করলো কেননা তারা জানতো যে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে তাদের পক্ষে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব নয়, জমির বিলি-ব্যবস্থা ও জমির মালিকানা লাভ করাও সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়।

কিন্তু উদারপন্থি বুর্জোয়ারা সর্বহারার বিপ্লবে উৎসাহী ছিলেন না। তারা অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন যে শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণীর শাসন তাদের পক্ষে সুখ-

কর হবে না। এবং এই দুই শ্রেণীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জারের চাবুকের যে প্রয়োজন একথাটা তারা বুঝতেন। তারা চেয়েছিলেন জারতন্ত্র বজায় রেখে জারের কাছ থেকে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়া এবং সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

তাই তারা বললেন ১৯০৫-এর বিপ্লব যেহেতু বুর্জোয়া-বিপ্লব সেহেতু একমাত্র বুর্জোয়া উদারপন্থিরাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। সর্বহারার কর্তব্য কৃষক-শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতা নয়, উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। রুশিয়ায় যদি জনগণের সর্বাত্মক উত্থান ঘটে তাহলে 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র উচিত সেখান থেকে সরে আসা—কেননা বিপ্লব-ভীত উদারপন্থি বুর্জোয়াদের আরো ভীত করা 'পার্টি'র কর্তব্য নয়। তারা জানতেন যে এই সর্বাত্মক উত্থানের ফলে রুশিয়ায় হয়তো 'প্রাদেশিক বিপ্লবী সরকার' গঠিত হতে পারে। তাদের অভিমত ছিলো—'সরকারে' যেন 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি' কখনোই অংশ গ্রহণ না করে। কারণ সেই 'সরকার' চরিত্রের দিক থেকে কখনোই 'সমাজবাদী' হতে পারবে না পরন্তু অংশগ্রহণের ফলে 'পার্টি', সরকারের বিপ্লবী ধ্যানধারণার অনুসারী হয়ে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠতে পারে। তারা ব্যাখ্যা করলেন যে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া, বিশেষ করে মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করাই 'সর্বহারাদের' লক্ষ্য হবে ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী 'বিপ্লব'-এর ফসল তুলতে ব্যর্থ হবে। সমাজ যেহেতু কেবলমাত্র সর্বহারাদের নিয়ে তৈরি নয় সেই হেতু এই 'বিপ্লবের' নেতৃত্ব কিছুতেই সর্বহারা-শ্রেণীর উপর বর্তাতে পারে না। সুতরাং বিপ্লবী প্রাদেশিক 'সরকার' নয়, বরং প্রাদেশিক 'ডুমা'র মধ্য দিয়েই বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে।

অন্যদিকে, 'বিপ্লব'-এর নেতৃত্ব দেবার প্রশ্নে 'সর্বহারা'-দের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে বলশেভিকদের বিশ্লেষণ ছিল বৈজ্ঞানিক ও যথার্থ। এক্ষেত্রে লেনিনের বক্তব্য ছিল এই যে, (১) নিজেদের লড়াই-এর জায়গায় দাঁড়িয়েই এই 'সর্বহারা শ্রেণী' প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারাই হচ্ছে রুশিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর এবং একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ বিপ্লবী-শ্রেণী এবং এইজন্যই এই শ্রেণীকে অবশ্যই রুশিয়ার 'গণতান্ত্রিক সাধারণ বিপ্লবী আন্দোলনে' নেতৃত্ব দিতে হবে। (Democratic Revolutionary Movement).

২। সর্বোপরি, রুশিয়ায় এই 'সর্বহারা শ্রেণীরই' আছে বুর্জোয়া প্রভাবহীন নিজস্ব রাজনৈতিক 'দল', যার সাহায্যে এই 'শ্রেণী' নিজেরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সহজেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

৩। তৃতীয়ত, সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনে এই 'শ্রেণী', বুর্জোয়া-শ্রেণী অপেক্ষা অনেক বেশি উৎসুক।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে শ্রমিকদের সর্বাত্মক

ধর্মঘট সর্বহারাদের সমবেত শক্তির প্রচণ্ডতার পরিচয় ছিলো। ভয়ত্রস্ত জার ১৭ই অক্টোবরের 'ম্যানিফেস্টো' জারি করতে বাধ্য হলেন। যদিও সেই 'ম্যানিফেস্টো'তে ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাগুলি ছিলো আসলে ধোঁকা। সেই সময়ে প্রচলিত একটি গান ঐ 'ম্যানিফেস্টো'র আসল চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলো এইভাবে—

"The Tsar caught fright, issued a Manifest ;
Liberty for the dead, for the living-arrest".

এরপরই বলশেভিক 'পার্টি' শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার আহ্বান জানালো, ডাক দিলো সশস্ত্র-বিপ্লবের। সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপরতা শুরু হলো। শ্রমিকদের মধ্যে 'লড়াকু বাহিনী' তৈরি হয়ে গেলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। তৈরি হলো, মানব-ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব সর্বহারা-শ্রেণীর এক আশ্চর্য শক্তিশালী হাতিয়ার 'The Soviets of Workers' Deputies'। এই শ্রমিক-সংঘে রুশিয়ার সমস্ত মিল ও কারখানার নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিরা ছিলেন। এ ধরণের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠন পৃথিবীতে পূর্বে ছিলো না। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর যে ধরণের 'সোভিয়েট' গঠিত হয়েছিলো ১৯০৫-এর সোভিয়েট ছিলো তারই প্রতীক।

কিন্তু লেনিন তখন নির্বাসনে থাকায় ক্রস্তালেভ, ট্রট্‌স্কি, পারভাস্ প্রমুখ মেনশেভিক নেতৃবৃন্দ সেন্ট পিটার্সবার্গের সবশেয়ে শক্তিশালী 'সোভিয়েট'টিকে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুললেন। 'সোভিয়েটের' সঙ্গে 'সৈন্যবাহিনী'কে যুক্ত করে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার বদলে তারা সৈন্যবাহিনীকে বললেন সেন্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করে যেতে।

কিন্তু 'মস্কো সোভিয়েটে' যেহেতু বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিলো সেহেতু তারা বৈপ্লবিক নীতিতে অনড় থাকলেন। উপরন্তু তারা Workers Deputies-দের Soviet-এর পাশাপাশি সৈন্যদের প্রতিনিধি নিয়ে 'Soldiers Soviet' গড়ে তুললেন। এই মস্কো 'সোভিয়েট'ই অতঃপর সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠলো। ১৯০৫ সালের রুশিয়ায় প্রায় সমস্ত শ্রমিক-কেন্দ্রে ঐ Soviet তৈরি হয়ে গেলো। চেষ্টা হলো সৈনিক ও নাবিকদের Soviet গুলিকে শ্রমিকদের Soviet-এর সঙ্গে যুক্ত করতে। কিছু কিছু জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের Soviet তৈরি করা হলো।

এই Soviet-গুলির প্রচণ্ড প্রভাব জনগণের উপর পড়লো। বলা বাহুল্য, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা এই সমস্ত Soviet গুলি সাংগঠনিক দিক থেকে দুর্বল হলেও তারা আসলে সরকারের (Government) মত কাজ করতে আরম্ভ করলো। কোনো আইনানুগ ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও এই সমস্ত Soviet গুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলো, এবং ৮ ঘণ্টার শ্রম দিবস

নির্ধারণ করে দিলো। তারা জনগণকে জারের প্রাপ্য খাজনা দিতে নিবৃত্ত করলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই Soviet গুলি সরকারী অর্থ বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থ 'বিপ্লবের' কাজে ব্যয় করলো।

অন্যদিকে সারা রুশিয়া জুড়ে শ্রমিক-কৃষকদের লড়াই ও ধর্মঘট চলতেই থাকলো। টিফ্‌লিস, ভ্লাডিভোস্টক, তাসখন্দ, সমরখন্দ, কুরস্ক, শাখুম, ওয়ার্শ, কিয়েভ, ও রিগা নগরীগুলিতে সৈন্যদের বিক্ষোভ বেড়ে উঠলো। ক্রনস্টাড্‌ ও সিবাস্তপোলে ব্ল্যাক-সি নৌবহরে বিদ্রোহ ঘোষিত হলো। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলি বিচ্ছিন্ন ছিলো বলে জারতন্ত্রের পক্ষে সেগুলিকে দমন করাও সম্ভব হয়েছিলো।

বলশেভিকরা এইবার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করলো। পার্টির 'মিলিটারী শাখা' সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তৈরি হয়ে গেলো। রুশিয়ার সর্বত্র লড়াকু-বাহিনী তৈরি হলো এবং অস্ত্র ব্যবহারের কায়দা কানুন শেখানো হলো। বাইরে থেকে বিপ্লবের জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হতে থাকলো। দলের বিশিষ্ট নেতারা এই অস্ত্রের বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

কমরেড স্টালিন ১৯০৫ সালে টিফ্‌লিসের এক শ্রমিক-সভায় জারের 'ম্যানিফেস্টো'র জবাব দিতে গিয়ে বলশেভিকদের মনের কথাকে ব্যক্ত করেছিলেন—

"What do we need in order to really win? We need three things: First—arms, Second—arms, Third—arms and arms again!"

স্বৈরাচারী জারতন্ত্রও তখন বসে ছিলো না, তারাও এক সর্বাত্মক লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হবার পর তারাও সমস্ত শক্তি নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবার কাজে নেমে পড়লো। জাপানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও একথা ভাববার কোনো কারণ ছিলো না যে জারতন্ত্র এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা দমনের শক্তিও ধারণ করতো না। তারা রুশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক শাসন জারি করলো—ঘোষণা করলো—"কোনো বন্দী চাই না কেবল কোনো গুলি যেন বৃথা খরচ না হয়।" ("Take no prisoners" and "Spare no bullets")—এই হুকুমনামা। সমস্ত বলশেভিক নেতাকে গ্রেপ্তার ও শ্রমিকদের 'Soviet' ভেঙে দেবার নির্দেশ দেওয়া হলো।

জারতন্ত্রের এই হুমকির মোকাবিলা করতে বলশেভিকরাও দ্রুত সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চালালেন। জারের সৈন্যদের সঙ্গে বলশেভিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো। রুশিয়ার চারিদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটলো। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের এই সংগ্রামকে পরিকল্পিতভাবে চালিত করবার জন্য তখন কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র না থাকায় ডিসেম্বরের এই উত্থান বিফল হলো। অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় জারতন্ত্র এই বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে আপাতত ধ্বংস করে দিলো।

জারতন্ত্রের হাতে বলশেভিকদের এই মার খাওয়ার দৃষ্টান্তগুলিকে এবার মেন-

শেভিকরা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে চাইলেন। তারা জানালেন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বলশেভিকরা ভালো কাজ করেননি। তারা বললেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোনো প্রয়োজন ছিলো না এবং এই অভ্যুত্থান বিপ্লবের পক্ষে ছিল অতীব ক্ষতিকর। তারা ফতোয়া দিলেন, সশস্ত্র-অভ্যুত্থান নয়, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হবে।

যদিও লেনিন ঘোষণা করলেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরে আসা নয় পরন্তু "We should have taken to arms more resolutely, energetically and aggressively···it was impossible to confine ourselves to a peaceful strike and that a fearless and relentless armed fight was indispensable". (Lenin, Selected Works, Eng. ed., Moscow, 1947, Vol. I, p. 446).

কিন্তু ১৯০৫-এর ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানকে জারতন্ত্র বর্বর পাশবিকতায় দমন করার ফলে স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লব একটু থিতিয়ে পড়লো ও অন্যদিকে মোড় নিলো। বিপ্লব-প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জারতন্ত্রও চাইল আঘাতে আঘাতে বিপ্লবকে নির্মূল করে দিতে। জারের ঘাতক ও কারারক্ষীরা এবার আরেক রক্তক্ষয়ী নোংরা ষড়যন্ত্রে নামলো। পোল্যাণ্ড, ল্যাটাভিয়া, এস্টোনিয়া, ট্রান্সককেশিয়া এবং সাইবেরিয়াতে পিটুনি-কর বসলো।

জারতন্ত্রের ষড়যন্ত্র এবার প্রসব করলো আরেক নতুন 'ডুমা'। যে 'ডুমার' আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে পর্যন্ত জারতন্ত্র স্বীকার করে নিলো। এটাও ছিলো তাদের আরেকটি নতুন ধোঁকা। জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই 'ডুমা' বাহ্যদৃষ্টিতে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক মনে হলেও আদৌ তা ছিলো না, রুশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের এই নির্বাচনে ভোটাধিকার ছিলো না। ভূস্বামী, নাগরিক মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক-কৃষকের এক ক্ষুদ্রাংশের ভোটে এই 'ডুমা' গঠিত হয়েছিলো। আসলে এই 'ডুমা' অধিকতর প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির হাতে সমগ্র রুশিয়ার জনগণের ভাগ্যকে তুলে দিলো।

এই 'ডুমা' সৃষ্টি করে জারতন্ত্র চেয়েছিলো শ্রমিক-শ্রেণী থেকে কৃষক শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। জারতন্ত্র একথা বুঝে ফেলেছিলো যে রুশিয়ার কৃষকদের এক বৃহৎ অংশ তখনও বিশ্বাস করত যে এই 'ডুমা'র সাহায্যেই তারা জমির মালিকানা লাভ করতে পারবে। তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের গোড়ায় ধোঁয়া দিয়েছিল মেনশেভিক, স্যোসালিস্টিক রিভলিউশনারী ও অন্যান্য কিছু প্রতিক্রিয়াশীল দল। এরা কৃষকশ্রেণীকে বুঝিয়েছিলেন যে তারা যা চায়, অভ্যুত্থান-বিপ্লবের পথে না গিয়েও তা লাভ করা যায়। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-এ পার্টির ঐক্য চাই—শ্রমিকদের এই দাবির ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে সুইডেনের স্টকহল্‌ম শহরে R.S.D.L.P.-র অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে ১১১ জন

প্রতিনিধি এলেন, সেই সঙ্গে আরো কিছু সহযোগী দলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সেই অধিবেশনে 'বলশেভিক' দল তাদের সমস্ত সংস্থার প্রতিনিধিকে পাঠাবার মতো অবস্থায় ছিল না। ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের ধাক্কা তখনও বলশেভিক দল পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। ফলে, সেই অধিবেশনে মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলো। সেই অধিবেশনে দলের 'ঐক্যের' প্রশ্নে একটি মামুলি সমঝোতা হলো। এই অধিবেশনে বিপ্লবোত্তর সরকার কর্তৃক চাষযোগ্য জমির জাতীয়করণের লেনিনের প্রস্তাবটি মেনশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অগ্রাহ্য হলো। পার্টির কেন্দ্রীয়-কমিটিতে ৩ জন বলশেভিক ও ৬ জন মেনশেভিক নির্বাচিত হলেন। পার্টির প্রচার-দপ্তর সম্পূর্ণভাবে মেনশেভিকদের দখলে গেলো। কিন্তু ১৯০৬ সালের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে দেখা গেলো জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে মেনশেভিক নেতারা শুধু ব্যর্থ হলেন তাই নয় তাদের সুবিধাবাদী চেহারাটাও জনগণের কাছে প্রকট হয়ে পড়লো। তারা পরবর্তীতে মেনশেভিক দলের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে থাকলো।

এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা পঞ্চম পার্টি 'কংগ্রেস' আহ্বানের প্রস্তাব করলো। ১৯০৭ সালে লণ্ডনে পার্টির 'অধিবেশন' বসলো। এই অধিবেশনে উপস্থিত ৩৩৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১০৫ জন বলশেভিক ও ৯৭ জন মেনশেভিক দলের প্রতিনিধি ছিলেন। তদুপরি বলশেভিকদের প্রতি পোল ও লেটিস প্রতিনিধিদের সমর্থন থাকায় এই অধিবেশনে বলশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রইলো।

এই অধিবেশনে রুশিয়ার সমস্ত প্রতি-বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাবার বলশেভিক-প্রস্তাব গৃহীত হলো। তাছাড়া নীতিগত সব প্রশ্নে মেনশেভিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে বলশেভিকদের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলো।

এই পঞ্চম পার্টি 'কংগ্রেসের' পর জারতন্ত্র আরো উন্মত্ত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় 'স্টেটডুমা' ভেঙে দেওয়া হলো। ৬৫ জন স্যোসাল ডেমোক্রাট ডেপুটিকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়াতে 'নির্বাসনে' পাঠান হলো। নতুন নির্বাচন-আইন পাশ হলো। শ্রমিক-কৃষকের অনেক অধিকার খর্ব করা হলো। শ্রমিক-কৃষকের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য অমানুষিক দমন পীড়ন চললো—বহু মানুষকে ফাঁসীতে চড়িয়ে দেওয়া হলো। শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নানারকম বর্বর নির্যাতন অব্যাহত থাকলো।

এইবার জারের গুপ্ত-ঘাতকেরা সবচেয়ে বড় শত্রু লেনিনের সন্ধানে ফিরতে লাগলো। লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। জারতন্ত্র, তাদের সাম্রাজ্যের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিটির ক্ষতিসাধন করে বিপ্লবের সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলো। তখন লেনিন অনেক ঝুঁকি নিয়ে রুশিয়া ছেড়ে গেলেন।

রুশিয়ার কৃষকশ্রেণী এই ঘটনাবলী থেকে ঐতিহাসিক শিক্ষালাভ করলো যে যতদিন জারতন্ত্র ও ডুমা থাকবে ততদিন তারা কিছুতেই জমির অধিকার লাভ করবে না। ফলে জারতন্ত্র ও কুলাক-শ্রেণীর প্রতি কৃষকদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছোটো-খাটো সংঘর্ষে ঘনীভূত হতে আরম্ভ করলো।

১৯০৫-এর বিপ্লব-চেষ্টার পর রুশিয়ার শিল্পক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এলো। রুশিয়ার ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ধনিক-শ্রেণীর হাতে রুশিয়ার শিল্প কারখানাগুলি সংহত ও সম্প্রসারিত হতে আরম্ভ করলো। ১৯০৫-এর আগে থেকেই রুশিয়ার এই শিল্প-মালিকরা সংঘবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছিলো যাতে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য-সমূহ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চমূলে বিক্রয় হতে পারে এবং এইভাবে তাদের উচ্চ মুনাফা যাতে করে বহির্বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা যায়। ওদের একটিই লক্ষ্য ছিলো বিদেশে স্বল্পমূল্যে মাল সরবরাহ করে বিদেশী বাজারকে হস্তগত করা। এইভাবে রুশিয়াতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংখ্যা বিপ্লব-চেষ্টার পরে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো। পুঁজিপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিলো বৃহৎ ব্যাঙ্ক-ব্যবসার। এইভাবে বৈদেশিক-মুদ্রার সরবরাহ রুশিয়াতে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

ফলে রুশিয়াতে ধনতন্ত্র দ্রুত একচেটিয়া-পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছিলো। অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য ধনতন্ত্রী-দেশগুলোর তুলনায় রুশিয়া অবশ্যই অনেক পিছিয়ে ছিলো।

১৯০৫ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর যখন সমস্ত রুশিয়া জুড়ে ভয়ংকর দমন পীড়ন চলছিলো তখন বলাই বাহুল্য রুশিয়ার 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র কাজকর্ম ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছিলো। পার্টি-সদস্যের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিলো। পার্টির অনেক পাতি-বুর্জোয়া সদস্য বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা জারের কোপে পড়ার ভয়ে পার্টি ছেড়ে গিয়েছিলেন।

পার্টির এই চরম দুঃসময়ে পার্টির সদস্যদের করণীয় কর্তব্যের পথনির্দেশ দিলেন কমরেড লেনিন। তিনি বললেন এই সমস্ত সঙ্কটকালেই 'পার্টি'কে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। যখন বিপ্লব চলেছিলো তখন 'পার্টি'র নীতি ছিলো এগিয়ে যাওয়া, এখন প্রতিক্রিয়ার সময় পার্টির নীতি হবে পরিকল্পিতভাবে পেছনো। পার্টিকে আত্মরক্ষার জন্য তখন অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে, নিষিদ্ধ পার্টির শক্তিকে সেই অবস্থাতেও অটুট রাখতে হবে, বাইরে বিধিসম্মত যত সুযোগ আছে তাকে কাজে লাগাতে হবে, বিধিনিষেধের কবলমুক্ত যে সমস্ত গণ-সংস্থা আছে তাদের পিছনে দাঁড়াতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে একটাই—জনগণের সঙ্গে সংযোগ দৃঢ় করা।

বলশেভিকদের কাছে, এই সঙ্কটকালেই, লেনিনের নির্দেশ যখন মাভৈঃ মন্ত্রের মতো কর্মীদের উদ্দীপ্ত করছিলো—'পার্টি' আরো প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য পাথেয় জোগাড় করেছিলো তখন মেনশেভিক শিবিরে চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। বিপ্লব-

চিন্তা তাদের মাথায় উঠেছিলো। তারা ধরেই নিয়েছিলো রুশিয়াতে আর বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তারস্বরে তারা সমস্ত বিপ্লবী দাবিদাওয়া ও কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করলো, উপরন্তু তারা চাইছিলো যে সর্বহারার এই বৈপ্লবিক পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হোক।

কিন্তু রুশিয়ায় 'বলশেভিক-পার্টি' সেই চরম দুর্দিনে, প্রবল হতাশার সময়গুলিতেও পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ও কার্যসূচি রচনা করতে পেরেছিলো। পরিস্থিতির ঐ সঠিক বিশ্লেষণ না করলে ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। সেই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কি ?

১) বলশেভিকরা বিশ্বাস করতেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিপ্লবের প্রচণ্ড ঢেউ উঠবেই, কেননা—
২) বিপ্লবের কারণগুলি তখনও রুশিয়াতে বিদ্যমান ছিলো, কেননা
৩) রুশিয়ার কৃষকরা তখনও ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমির মালিকানা ছিনিয়ে নিতে পারেনি
৪) শ্রমিকেরা তাদের ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার তখনো অর্জন করেনি, সর্বোপরি
৫) জনগণ কর্তৃক বিকৃত স্বৈরাচারী জারতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করার সংকল্প তখনো শোষিত-শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত ছিলো।

সুতরাং যে ঐতিহাসিক কারণগুলি ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের সময়ে বিদ্যমান ছিলো তা ১৯০৫ সালের অত্যাচার ও নিপীড়নের দিনগুলিতেও শূন্যে মিলিয়ে যায়নি। তাই বলশেভিকরা জানতেন, বর্তমানে যাই ঘটুক না কেন আগামী দিনে বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটবেই। সুতরাং তাদের কাজ হয়েছিলো সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ; শ্রমিক-শ্রেণীকে সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা।

১৯০৫ সালের পরও বলশেভিকদের রাজনৈতিক লক্ষ্য এতটুকু বদল হয়নি। সে লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব-সাধন। এই লক্ষ্যের কথা বলশেভিকরা এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। বিস্মৃত হননি কৃষকদের জমি ও শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার শ্রম-দিন চাই—এই দাবিকে।

কিন্তু ১৯০৫-এর পর বলশেভিকদের বিপ্লব-সাধনের পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিলো। ১৯০৫ সালের পর জনগণকে আবার সাধারণ ধর্মঘটে সামিল করা বা প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণের ডাক দেওয়া পার্টির পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হতো কেননা পার্টি জানতো, যে অবস্থার বিপর্যয়ে শ্রমিক-কৃষকদের বৈপ্লবিক তৎপরতা মন্থর হয়েছে এবং সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণী ভয়ংকরভাবে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে আছে এবং বেড়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি।

সুতরাং, পার্টি, আক্রমণের (offensive) নীতিপরিত্যাগ করে গ্রহণ করলো রক্ষাত্মক (defensive) নীতি। ফলে, তারা তাদের সক্রিয় সদস্যদের অজ্ঞাতবাসে টেনে আনলো এবং সেখান থেকেই পার্টির কাজ চালাতে সুরু করলো। ফলে সরকারের অজ্ঞাতে 'পার্টি'র বেআইনী কাজ চলতেই থাকলো এবং প্রকাশ্যে, নিষেধের আওতার বাইরে, সমস্ত শ্রমিক-সংস্থাকে মদৎ দেওয়ার কাজও চালিয়ে যাওয়া হলো। এর একটিই উদ্দেশ্য ছিলো বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা। ফলে শ্রমিক-সংগঠন, তুর্বল সমবায়-সমিতি, শ্রমিক-সমবায়, ক্লাব, এমনকি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও 'বলশেভিকদের' কর্মতৎপরতা সুরু হলো। বলশেভিকরা 'স্টেটডুমার' মঞ্চকেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো তাদের মুখোশ জনগণের কাছে খুলে দেবার জন্যে। বলশেভিকরা 'স্টেটডুমার' মঞ্চকে ব্যবহার করে কৃষক-শ্রেণীকে আবার সর্বহারা-শ্রেণীর স্বপক্ষে টেনে আনার রাজনৈতিক চেষ্টায় সফল হতে আরম্ভ করলো। এইভাবে সঠিক কৌশল অবলম্বন করার ফলে 'পার্টি' আবার বিপ্লবের উর্বর-ক্ষেত্রে ফিরে এলো।

এইবার 'পার্টি' দ্বিমুখী লড়াই-এ অবতীর্ণ হলো, (১) পার্টির অভ্যন্তরে বিরাজমান সুবিধাবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে ; (২) অন্যটি দলের মধ্যে আত্মগোপনকারী শত্রু Otzovists[২]-দের বিরুদ্ধে।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে R.S.D.L.P.-র ৫ম (অখিল রুশ) কন্‌ফারেন্স বসলো প্যারিসে। এই কন্‌ফারেন্সে সুবিধাবাদ ধিকৃত ও পরিত্যক্ত হলো এবং পার্টির শত্রু এই সুবিধাবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের জন্য পার্টির সমস্ত শাখাগুলিকে আহ্বান জানানো হলো।

কিন্তু R.S.D.L.P.-এর সিদ্ধান্ত মানা মেনশেভিকদের কাছে বাধ্যতামূলক না হওয়াও তারা প্রকাশ্যেই পার্টি-নিন্দিত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। তারা প্রকাশ্যেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ৮ ঘণ্টা শ্রমদিন ও জমি বাজেয়াপ্ত করার নীতির বিরোধীতা করতে থাকলো। এইভাবে R.S.D.L.P.-র ঘোষিত নীতির বিরোধীতা করে তারা জারতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আইনসিদ্ধ 'লেবার-পার্টি' গঠনের তোড়জোড় শুরু করলো। এই জন্য এই 'লেবার-পার্টি'কে লোকে ব্যঙ্গ করে 'Stolypin Labour Party' বলতো।

আমাদের মনে রাখতে হবে মেনশেভিকদের এই গোষ্ঠীতে মারটভ, ট্রট্‌স্কির মতো প্রভাবশালী, শিক্ষিত ও অসাধারণ বাগ্মীরাও ছিলেন যাঁদের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব জনগণকে অনায়াসে বিপথগামী করতে সমর্থ ছিলো।

Otzovists-গোষ্ঠীর পক্ষেও সে যুগের রুশিয়ার বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন। যেমন বোগদানভ, লুনাচারিস্কি ও বুবনভ্‌। এই গোষ্ঠী ব্যক্তিগতভাবে লেনিন-নির্দেশিত পথের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য বৈধ সংগঠনগুলির পক্ষে কাজ করতে অস্বীকার

করে শ্রমিক-স্বার্থকে ভয়ংকরভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিলো। তাদের এই সমস্ত কাজের ফলে পার্টি ও 'পার্টি' বহির্ভূত সাধারণ জনগণের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা ভয়ংকরভাবে ব্যাহত হয়েছিলো। 'স্টেটডুমা'-র মধ্যে থেকেও যে-পার্টি কৃষকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং জারতন্ত্রের মুখোশ ও কন্সটিটিউসন্যাল ডেমোক্রাটদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারে এই ঐতিহাসিক সত্যকেও এই দল স্বীকার করেনি। স্বীকার করেনি যে জারতন্ত্র জমির মালিকানার লোভ দেখিয়ে কৃষক-সমাজকে ঠকাচ্ছে।

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে বলশেভিকদের সংবাদপত্র 'প্রলেতারি'র সম্পাদক-মণ্ডলীর বর্ধিত অধিবেশন ডাকা হোল ১৯০৯ সালে। অধিবেশনের আলোচ্য ছিল Otzovists-দের আচরণ। এই অধিবেশনে Otzovists-এর ভূমিকাকে নিন্দাবাদ করা হলো। ফলে Otzovists-রা বলশেভিক সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হলো।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পথে রুশ দেশকে নিয়ে যেতে বলশেভিক-দের নিরন্তর সহস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। Liquidators ও Otzovists প্রভৃতি গোষ্ঠীকে কোনঠাসা ও মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তারা কখনোই রণক্ষেত্র ছেড়ে যায়নি। সুতরাং ১৯১২ সালে ট্রট্স্কি 'August Block' নামে আরেক গোষ্ঠী গড়ে তুললেন—যাদের কাজই ছিল সমস্ত বলশেভিক-বিরোধী গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং লেনিন ও বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। বলা বাহুল্য Liquidators ও Otzovists-রা ট্রট্স্কির এই August Block-এর অন্যতম শরিক হয়ে উঠলো। ট্রট্স্কি অবশ্য একটি মুখোশের আড়াল নিয়ে জানালেন যে তিনি মেনশেভিক বা বলশেভিক কোনো পক্ষেরই নন তিনি উভয়ের মধ্যে সমঝোতার পক্ষপাতী। লেনিন, ট্রট্স্কির এই ভূমিকাকে সাংঘাতিক বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন কেননা 'আমি সমস্ত বিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বে' বলে তিনি শ্রমিক-সমাজকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে-ছিলেন। যদিও ট্রট্স্কি সর্বান্তকরণে মেনশেভিক Liquidators-দের সমর্থক ছিলেন।

ফলে লেনিনকেও একটি পাল্টা 'পার্টি ব্লক' তৈরি করতে হয় যাদের উদ্দেশ্য ছিল বে-আইনী ঘোষিত 'সর্বহারা-পার্টি'কে রক্ষা ও শক্তিশালী করা। এই 'ব্লক' -এর নেতা ছিলেন স্বয়ং লেনিন এবং কিছু পার্টির (R.S.D L.P.) প্রতি অনুগত মেনশেভিক, যাদের নেতা ছিলেন প্লেখানভ। পার্টি-বিরোধী ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্লেখানভ-প্রস্তাবে লেনিন একটি অস্থায়ী 'ব্লক' গঠনে রাজি হয়েছিলেন কারণ, তিনি ও প্লেখানভ উপলব্ধি করেছিলেন যে, পার্টির কল্যাণ ও Liquidators-দের বিনষ্টির জন্য এই ধরণের পাল্টা 'ব্লক' গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

এইভাবে প্লেখানভের সঙ্গে অভিনব কৌশল অবলম্বন করে চলার ফলে কিছু-দিনের মধ্যেই Liquidators-দের দখলে থাকা নানা বৈধ সংগঠন থেকে তাদেরই সরিয়ে দেওয়া হলো। লেনিন-প্লেখানভ মোর্চা এইভাবে মেনশেভিক পরিচালিত বহু সংগঠনকে বলশেভিকদের আওতায় এনে ফেললো। দীর্ঘকাল ধরে Liquidators, Otzovists এবং ট্রট্‌স্কি-পন্থি গোষ্ঠীর সঙ্গে পার্টির ভিতরে বাইরে অবিরাম সংঘর্ষ যে বিপ্লবের কাজকেই বিলম্বিত করেছে এটা বলশেভিক-পন্থিরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই উপলব্ধি করলেন। বিরোধের এই দুর-পনেয় ব্যাধি ছিল আরোগ্য-সম্ভাবনাহীন। তাই বলশেভিক-পন্থিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'বলশেভিক পার্টি' গঠনের প্রয়োজনীয়তা বলশেভিকরা অনুভব করলেন।

তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলশেভিকরা বুঝলেন 'রুশিয়ান স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র (R S.D.L P.) পতাকাতলে মেনশেভিকদের সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কেননা Stolypin-সন্ত্রাসের দিন-গুলিতে মেনশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকতা, পার্টিকে ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র এবং তার বদলে সংশোধনবাদী পার্টি-গঠনের চেষ্টা মেনশেভিকদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলো। তাছাড়া, মেনশেভিকরা R.S.D.L.P.-র অংশ ছিলো বলে তাদের দুষ্কৃতির কিছু কিছু নৈতিক দায় বলশেভিকদেরও বহন করতে হতো। কিন্তু মেনশেভিকদের প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার নৈতিক দায় বহন করা বলশেভিকদের পক্ষে অচিন্তনীয় ছিলো। কেননা ঐ দায় মানলে, বলশেভিকরা, পার্টি ও জনগণের শত্রু একথাও স্বীকার করে নিতে হয়।

R.S.D.L.P.-র ৬ষ্ঠ সাধারণ-অধিবেশনের প্রাক্কালে স্বতন্ত্র বলশেভিক পার্টি গঠনের জন্য বলশেভিক-পন্থিরা প্রস্তুতি চালাতে আরম্ভ করলেন। রাজ-নৈতিক দিক থেকে এই নতুন পার্টি-গঠনের সঙ্কল্প ছিলো ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেনশেভিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই স্বতন্ত্র 'বলশেভিক পার্টি' তাদের লালিত স্বপ্ন ও ষড়যন্ত্রকে তছনছ করে দেবে। রুশি-য়াতে R.S.D.L.P.-র ছত্রচ্ছায়ায় তারা চেয়েছিলেন পশ্চিম ইউরোপের 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টি তৈরি করা (ফ্রান্স ও জার্মানীতে যে ধরণের পার্টি ছিলো)। ঐ 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টিগুলি ছিলো মার্কসবাদী ও সুবিধাবাদীদের এক জগাখিচুড়ি সংস্থা, বিপ্লবের শত্রু ও মিত্রদের সমবায়ে তৈরি ও সময় বিশেষে পার্টি-নীতিরও বিরোধী। সুতরাং একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে ঐ ধরণের স্যোসাল ডেমোক্রাটদের দিয়ে আর যাই হোক, বিপ্লব হয় না।

বলশেভিকরা 'স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টি নয়, একটি যথার্থ 'মার্কসবাদী পার্টি' চাইছিলেন যারা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী। যে পার্টি হবে 'সামাজিক-বিপ্লব' (Social Revolution)-এর বাহক এবং সর্ব-হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত।

'ঐতিহাসিক প্রয়োজনই যে সমস্ত সৃষ্টির মূল' এই সত্য আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলো রুশিয়াতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন ধরণের মার্কসবাদী-পার্টি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। এ ধরণের একটি পার্টি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বহুদিন ধরেই বলশেভিকরা দেখছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, গ্রহণ বর্জন ও লাগাতার সংগ্রামের বহু অবশ্যম্ভাবী স্তর অতিক্রম করে তবেই তারা 'সময়ে'র মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। এ 'সময়'কে গায়ের জোরে এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ঠিক সময় যখন আসে তখন তাকে কাজে লাগাতে পারাটাই ইতিহাস-সচেতন মানুষ বা দলের কৃতিত্ব।

তাই বলশেভিকদের ক্রমান্বয় লড়াই-এ পিছু হটেছে 'ইকনমিস্টস্', 'মেনশেভিক্স্', 'ট্রট্স্কাইটস্', 'অটজোভিস্টস্' ও আরো নানা শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বীরা। বলশেভিকদের 'মার্কসবাদী-পার্টি' গঠনের সবশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো 'এমপিরিও ক্রিটিকস্'রা।[৩] ঐতিহাসিক কারণেই এই অবৈজ্ঞানিক প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিলো এক নতুন 'মার্কসবাদী পার্টি'।

১৯১২ সালে 'প্রাগ' শহরে পার্টির ষষ্ঠ-অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনেই মেনশেভিকদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হলো ও আনুষ্ঠানিকভাবে 'বলশেভিক' পার্টি-গঠনের ঘোষণা করা হলো। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি পার্টি-গঠনের এমন ধারাবাহিক প্রস্তুতির ইতিহাস, ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব।

প্রাগে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন থেকে বলশেভিক-পার্টির একটি 'কেন্দ্রীয় কমিটি' তৈরি হলো। এই 'কমিটি'তে নির্বাচিত হলেন লেনিন, স্টালিন, স্ভারড্‌লভ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রুশিয়াতে বিপ্লবী কার্য সম্পাদনের জন্য একটি Practical Centre স্থাপিত হলো এবং তার প্রধান হলেন স্টালিন।

এই অধিবেশনে বলশেভিকদের স্বতন্ত্র পার্টি তৈরি হলেও বলশেভিকরা কিন্তু R.S.D.L.P.-র পতাকাকে পরিত্যাগ করলেন না। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বলশেভিকরা পার্টির এই নামই ধারণা করে ছিলেন—"Russian Social Democratic Labour Party (Bolshevicks)."

পার্টি গঠনের পর অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ঘটলো। পার্টির নেতৃত্ব ও সভ্যদের নানা স্তরে যে সমস্ত সুবিধাবাদী অংশ ছিলো তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলো। ফলে, বলশেভিক-পার্টি যথার্থ অর্থে 'সর্বহারাদের পার্টি', ও শক্তিশালী পার্টি হিসাবে গড়ে উঠলো। ইতিহাস এই পার্টিকেই 'লেনিনিস্ট পার্টি' বলে জানে—যে পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশিয়াতে 'সর্বহারাদের একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো।

এই অধিবেশনের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো সেই ন্যূনতম দাবির ঘোষণা—যা ১৯০৫ সাল থেকেই বলশেভিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে এসেছিলো

—একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ৮ ঘণ্টার শ্রম-দিবস এবং সমস্ত রকম ভূ-সম্পত্তির অধিগ্রহণ।

১৯১২-১৯১৪ সালের মধ্যে এই নতুন 'পার্টির' নেতৃত্বে সমগ্র রুশিয়া জুড়ে আবার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হলো। ১৯০৫-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর Stolypin-এর সন্ত্রাসের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। নির্যাতন ও নির্বিচার হত্যায় জনগণ এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে তারা সন্ত্রাসকেও অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করেছিলো, ফলে অনিবার্যভাবেই আবার শ্রমিকেরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলো। ফলে ১৯১১ সালেই ১ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হলো। ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল বৃটিশ মালিকানাধীন 'লেনা' স্বর্ণখনিতে ধর্মঘট চলাকালীন জারের সৈন্যদের গুলিতে ৫০০ শ্রমিক নিহত হলো। লেনার নিরস্ত্র ধর্মঘটিদের উপর এই গুলিবর্ষণ ও নির্বিচার হত্যায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। রুশিয়ার শ্রমিক-সমাজ ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়লো। রুশিয়ার কলকারখানার চাকা চকিৎ-শ্রমিক ধর্মঘটে অচল হয়ে গেলো। Stolypin-প্রবর্তিত তথাকথিত শান্তির পরিবেশ তছনছ হয়ে গেলো। ১৯১২ সালের 'মে-দিবসে'র ধর্মঘটে ৪ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিলো। বলা বাহুল্য এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল নতুন মার্কসবাদী 'বলশেভিক পার্টি'। যে লিকুইডেটরস ও প্রতিক্রিয়াশীলরা বিশ্বাস করতেন যে রাশিয়াতে বিপ্লবের দিন ফুরিয়েছে তারা জাগ্রত জনতার এই ভয়ংকর বিস্ফোরণের সামনে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারা এই জাগরণকে বললেন 'a strike fever'। ট্রট্স্কি, বিপ্লবীশ্রেণীর কাছে এক বিকল্প আন্দোলনের আহ্বান পাঠালেন (Petition campaign) শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত গণ-দরখাস্ত 'স্টেটডুমার' কাছে প্রেরণের আহ্বান। মোটে ১৩০০ জন শ্রমিক এই দরখাস্তে স্বাক্ষর করেছিলো আর বলশেভিকদের আহ্বানে তখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রাস্তায় নেমে পড়েছিলো। ১৯১৪ সালে ধর্মঘটি শ্রমিকের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ১৫ লক্ষেরও বেশিতে।

এই পর্যায়ে বলশেভিকদের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী, সংহত ও জনগণের মধ্যে আরো বেশি প্রভাব বিস্তারে পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'প্রাভদা' (Truth) একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলো। ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল (মে ৫) 'প্রাভদা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। সেন্সার-বিধিকে লঙ্ঘন করে অবিরাম জারতন্ত্রের নানা কীর্তিকে ফাঁস করে দেবার জন্য বারবার 'প্রাভদা'র উপর পুলিসি হামলা, জরিমানা ও কপি বাজেয়াপ্ত করার চাপ এসে পড়েছিলো, তবুও 'প্রাভদা' বন্ধ হয়নি, কেননা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা এই পত্রিকার পিছনে ছিলো। জরিমানার বিপুল অর্থও পাওয়া যেত 'প্রাভদা' পাঠকদের থেকে সংগৃহীত দানে। আড়াই বছরে অন্তত ৮ বার সরকার 'প্রাভদা' নামে ঐ পত্রিকা-প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো। যতবার বন্ধ হয়েছে

'প্রাভদা', ততবারই নতুন নাম নিয়ে 'প্রাভদা' প্রকাশিত হয়েছে। কখনো Za Pravda (For truth), কখনো Put Pravdy (Path of Truth), Trudovaya Pravda (Labour truth) নামে। এই 'প্রাভদা'র দৈনিক প্রচার সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার।

'প্রাভদা'র প্রতি সংখ্যায় অসংখ্য চিঠি ছাপা হতো। সে চিঠিগুলি দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে বহন করে আনতো নানা অন্যায় অত্যাচার শোষণ ও লুণ্ঠনের ইতিহাস। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে ক্যাপিটালিস্ট-সমাজের আসল স্বরূপের সঙ্গে জনগণের পরিচয় ঘটতো। 'প্রাভদা' শ্রমিকদের নানা প্রয়োজন ও দাবির কথা প্রকাশ করতো, প্রকাশ করতো রুশিয়ার কোথায় কোথায় শ্রমিকেরা কোন্ কোন্ সংগ্রামে নেমেছে।

রুশিয়ার নানা প্রান্তে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সাহায্যার্থে 'প্রাভদা' বিশেষ তহবিলে অর্থদানের আহ্বান জানাতো পাঠকবর্গের কাছে। এই তহবিলে লক্ষ লক্ষ রুবল চাঁদা উঠত। মনে রাখা দরকার রুশিয়ার হত-দরিদ্র শ্রমিকদের রক্তজল করা তুচ্ছ মজুরীর সামান্য দানেই এই বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার তৈরি হতো। এইভাবেই 'প্রাভদা' সমস্ত রুশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে 'সর্বহারাদের সংহতি' গড়ে তোলার ঐতিহাসিক মানসিকতা গড়ে তুলেছিলো, রুশিয়ার যে কোনো প্রান্তের শ্রমিকের স্বার্থ ও লড়াই যে রুশিয়ার মেহনতি মানুষের লড়াই একথা বুঝতে 'প্রাভদা' ভীষণভাবে সাহায্য করেছিলো।

শুধু তাই নয় 'প্রাভদা'তে রুশিয়ার কৃষক-শ্রেণীর জীবন ও ভূস্বামীদের হাতে তাদের নির্যাতন ও শোষণের প্রামাণ্য বিবরণ ছাপা হতো। প্রাভদাই রুশিয়ার কৃষক-শ্রেণীর ক্রম-বাড়ন্ত অসন্তোষের দিকে রাজনীতি-সচেতন শ্রমিক-শ্রেণীকে আকর্ষণ করেছিলো। সোজাসুজি বিপ্লব বা সংগ্রামে আহ্বানের কথা আইনী-পত্রিকা, 'প্রাভদা'র পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব ছিলো না। তাই আকারে ইঙ্গিতে এই পত্রিকা রুশিয়ার জনমানসকে বুঝিয়ে দিতো তাদের করণীয় কি?

জনগণের প্রেরিত নানা অভিযোগ ও অত্যাচারের বিবরণ-সম্বলিত পত্রকে 'প্রাভদা' কত গুরুত্ব দিতো তা বোঝা যাবে এক বছরে প্রকাশিত ১১ হাজার পত্রাবলী থেকে। 'বলশেভিক পার্টি' ও এই 'প্রাভদা' পত্রিকার কল্যাণে ১৯১৪ সালে রুশিয়ার রাজনীতি-সচেতন শ্রমিকদের পাঁচ-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলো 'পার্টি'। পার্টির নিজস্ব পত্রিকা যে পার্টি ও বিপ্লবকে কতখানি সাহায্য করতে পারে 'প্রাভদা'র ঐতিহাসিক ভূমিকা তার প্রমাণ। একটি সময়ে বলশেভিকদেরও বলা হতো 'প্রাভদিস্ট'। পার্টি নীতিকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য ও বৈপ্লবিক জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে 'প্রাভদা' সংগ্রামের মধ্যস্থলে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়েছিলো।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব সংঘটনের জন্য তিনটি শানিত অস্ত্র তৈরি হয়েছিলো :

১। বলশেভিক পার্টি
২। পার্টি পত্রিকা—'প্রাভদা' ও
৩। চতুর্থ 'স্টেট ডুমায়' বলশেভিক গোষ্ঠী।

৪র্থ 'ডুমার' জন্য নির্বাচন ঘোষিত হলে বলশেভিক পার্টি, প্রাভদা ও চতুর্থ ডুমায় অংশ গ্রহণকারী বলশেভিক গোষ্ঠী বিপুল উদ্যমে কাজে নেমে পড়লো। এই ত্রিবিধ আক্রমণের সম্মুখে পড়ে 'ডুমা' নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সরকারী দলসমূহ, এবং তথাকথিত উদারপন্থি বুর্জোয়া দলের মুখোশ খুলে পড়লো। আতঙ্কিত শাসকদল তখন নানা অজুহাত তুলে কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলো। বলশেভিক পার্টির নির্দেশে ১ দিনের ধর্মঘটে ঐ সমস্ত ফ্যাক্টরি অচল হয়ে গেলো। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলো শাসকদলের। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিকদের প্রস্তাবিত Mandate (নির্দেশাবলীর)-এর স্বপক্ষে ভোট দিলো। এই Mandate শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলো। এই নির্বাচনে বলশেভিকদের উল্লেখযোগ্য জয় হলো। 'ডুমায়' নির্বাচিত ১৩ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ জনে।

এই প্রতিনিধিরা 'ডুমার' মঞ্চ থেকে বৈপ্লবিক বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁরা সরকারের স্বৈরতন্ত্রী চরিত্রকে প্রকাশ করে দিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপরে দমন-নীতি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারী কৈফিয়ৎ দাবি করলেন, কৈফিয়ৎ দাবি করলেন পুঁজিপতিদের অমানুষিক শোষণ চালাতে দেবার অধিকার প্রদানের জন্যও। ডুমার মঞ্চ থেকে ভূমি-সম্বন্ধীয় প্রশ্নও তোলা হলো। কৃষক শ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানো হলো সামন্ত প্রভু ও 'কনস্টিটুশ্যনাল ডেমোক্রাটিক পার্টির' বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য (যারা জমির অধিগ্রহণ ও কৃষকশ্রেণীর কাছে সেই জমি বণ্টনের ব্যাপারে বিরোধীতা করেছিলেন)। 'ডুমার' বলশেভিক 'ডেপুটিরা' তাদের কাজকর্ম শুধু ডুমার বক্তৃতা মঞ্চেই সীমাবদ্ধ রাখেননি—'ডুমা'র বাইরেও তাদের ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতা বজায় রেখেছিলেন। তারা দেশের নানা কলকারখানায় ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হতেন, তাদের সামনে বক্তৃতা দিতেন, সমর্থকদের গোপন মিটিংএ মিলিত হয়ে তারা 'বলশেভিক পার্টি'র সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে বলতেন এবং সেই সঙ্গে গড়ে তুলতেন পার্টি 'সংগঠন'। এই ডেপুটিরা এইভাবে পার্টির নির্দেশে আইনী-তৎপরতার সঙ্গে বে-আইনী কার্যক্রমকে সার্থকভাবে চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 'বলশেভিক পার্টি' সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামকে সর্বস্তরে ব্যাপ্ত করে দেবার কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োগ করলো। পার্টির নির্দেশে অনেক অবৈধ সংগঠন গড়ে উঠলো। প্রচার করলো অজস্র নিষিদ্ধ পুস্তিকা।

জনগণের মধ্যে পার্টি গোপনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম আরম্ভ করে দিলো। একই সময়ে 'পার্টি' ধীরে ধীরে দেশের অধিকাংশ বৈধ সংগঠনকেও নিজের সংগঠনের মধ্যে টেনে আনতে সমর্থ হলো। এতকাল পর্যন্ত এই সংগঠনগুলি মেনশেভিকদের দখলে ছিলো।

সংগ্রামের সর্বস্তরে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে মেনশেভিকরা 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর কাছে মধ্যস্থতা করার আহ্বান এবং পার্টির ভিতরে শান্তির পরিবেশ রক্ষার দাবি করলো। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' বলশেভিকদের নির্দেশ দিলো মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করতে। এই সুবিধাবাদী আন্তর্জাতিকের নির্দেশ মেনে চলতে বলশেভিকরা অস্বীকৃত হলো এবং শত্রুদের কোনো সুবিধা দিতে রাজি হলো না।

সমস্ত রুশিয়া জুড়ে বলশেভিক পার্টির আধিপত্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এই পার্টিরই ছিলো একটি সঠিক মার্কসবাদী তত্ত্ব, পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং একটি বৈপ্লবিক সর্বহারার সংগঠন, যারা দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছে বারবার।

১৯১৪ সালে রুশিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম বৃদ্ধি পেলো। সেই সংগ্রাম ছড়িয়ে গেলো শহর থেকে শহরে, অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। প্রথমে বাকু, তারপরে মস্কো এবং অতঃপর অন্যান্য জেলায় 'মে'-দিবসের ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো। পুলিসের গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন শ্রমিকদের অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দিলো। শ্রমিকেরা বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। জারতন্ত্র, অবস্থার মোকাবিলার জন্য জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করলো। 'প্রাভদা' নিষিদ্ধ হলো।

ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী 'যুদ্ধ' ঘোষণা করে বসলো। এই যুদ্ধের সুযোগে জারতন্ত্র চাইলো বলশেভিকদের শ্রেণী-সংগ্রাম চূর্ণ করে দিতে। এইভাবে 'মহা-যুদ্ধ' এসে বিপ্লবের অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দিলো।

লেনিন অনেক আগেই এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের আভাস পেয়েছিলেন। তাই তিনি 'আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে' যুদ্ধের সময়ে পার্টির বৈপ্লবিক কর্মনীতি কি হবে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুঁজিবাদ, সমৃদ্ধির সর্বোচ্চস্তরে—সাম্রাজ্যবাদে উত্তীর্ণ হয়েছিলো, সম্পদ ঘনীভূত হয়েছিলো একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যাঙ্কের হাতে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যাঙ্কের মালিকরা তাদের সম্পদকে নতুন নতুন বাজার ও অধিকৃত উপনিবেশের নিয়োগ করে আরো সম্পদ অর্জনের আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। ফলে পৃথিবীর দখল নিয়ে অনেককাল আগে থেকে কালনেমির লঙ্কাভাগ চলছিলো। প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বহুকাল থেকেই এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। একদিকে

জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুর্কী; অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া ও ইটালী এই দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। ফলে আমেরিকা ও জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে উপায় থাকল না এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকা।

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিতালী করে 'রুশিয়ার' যুদ্ধে ভিড়ে যাওয়ার ভয়ংকর প্রয়োজন ছিলো। কেননা আমরা জানি, ১৯১৪ সালের পূর্বেকার রুশিয়ায় অর্থনীতি মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিলো। রুশিয়ার অধিকাংশ বৃহৎ-শিল্প ছিলো বিদেশী পুঁজিপতিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে। বিশেষ করে রুশিয়ার ৭২ শতাংশ ধাতু-শিল্পের কারখানা বিদেশী লগ্নীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলো। তাছাড়া রুশিয়ায় কয়লা ও তেল শিল্পের অর্ধাংশও ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। ফলে রুশিয়ার বিভিন্ন শিল্প থেকে প্রাপ্ত মুনাফার সিংহভাগ ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্কে জমা হতো। উপরন্তু এই সমস্ত বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে জারের কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের ফলে জারতন্ত্র পুঁজিবাদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিলো। ফলত, এই সমস্ত কারণে রুশিয়া, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের তোষক ও প্রায় উপনিবেশে পরিণত হয়েছিলো।

সুতরাং এই যুদ্ধের মাধ্যমে রুশিয়ার জারতন্ত্র নানা মতলব হাসিল করতে চেয়েছিলো। নতুন বাজার অধিকার করা, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ চুক্তির মাধ্যমে বিপুল মুনাফা অর্জন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী-আন্দোলনকে দমন করা জারতন্ত্রের অন্যতম অভিপ্রায় ছিলো।

এই যুদ্ধে রুশিয়ার জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিলো রুশিয়ার স্যোসালিষ্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকেরা। 'প্রুসিয়ান বর্বরদের' হাত থেকে 'পিতৃভূমি'কে রক্ষা করার আহ্বান জানানোর ছলে সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধকে সমর্থন করে ঐ সমস্ত মেকি 'সমাজবাদীরা' দেশের মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো।

একমাত্র বলশেভিক পার্টি-ই স্বৈরতন্ত্র, জারতন্ত্র, ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলো। বলশেভিকরা জানতেন রুশিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখা নয়, যুদ্ধের দ্বারা জারতন্ত্র, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা, বিদেশী ভূখণ্ড দখল ও লুণ্ঠনের জন্যই রুশিয়া এই যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়েছে। রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিকদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলো।

এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সবচেয়ে নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করেছিলো 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর সুবিধাবাদী নীতি ও তার নেতাদের দ্বিচারিতা। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক-এ স্যোসালিস্টরা পার্লামেণ্টে যুদ্ধখাতে

যুদ্ধ-বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভোট দেবে এমন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-এর অন্তর্গত দেশগুলি ঘোষণা করেছিলো যে এই সমস্ত দেশে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের মুনাফা-অর্জনের প্রচেষ্টায় অস্ত্রের প্রতি একটি গুলি ছোঁড়াকেও অপরাধ বলে গণ্য করবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বদলে গেলো মতটা। যখন তাদের যুদ্ধ-বিরোধী সিদ্ধান্তগুলিকে প্রয়োগ করার সময় এলো তখন সর্বহারা জনগণের স্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তারা এই 'যুদ্ধ'কে সমর্থন করে বসলো। এই কাজের ফলে সর্ব-হারাদের কাছে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অস্তিত্ব বা উপযোগিতা কিছুই রইলো না। জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য দেশের স্তোসাল ডেমো-ক্রাটরা স্ব স্ব পার্লামেণ্টে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে তাদের সরব সমর্থন জ্ঞাপন করলো।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে লেনিন 'তৃতীয় আন্ত-র্জাতিক' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিন্তু 'আন্তর্জাতিক' গঠনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা Zimmerwald ও Kienthal-এর অধিবেশন বলশেভিকদের মৌল নীতিগুলিকে গ্রহণ করলো না। বলশেভিকদের নীতি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে প্রতিটি যুযুধান দেশে 'গৃহযুদ্ধে' রূপান্তরিত করা। উদ্দেশ্য, সেই সব দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে 'গৃহযুদ্ধের' মাধ্যমে পরাজিত করা। Kienthal-এর অধিবেশনে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত না হলেও 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গঠনের মৌল উপাদানগুলিকে সংহত করতে পেরেছিলো যার ফলে তখন না হলেও অদূর ভবিষ্যতে 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিলো।

রুশিয়ার বুর্জোয়া-সম্প্রদায় ও মেনশেভিকরা যুদ্ধের সুযোগে বেশ কিছু শ্রমিককে একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলো যে এই যুদ্ধ আসলে জন-যুদ্ধ। এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রুশিয়ার বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো এবং দেশজুড়ে 'Unions of Zemstovs and Towns' গড়ে তুলেছিলো। এই উদ্দেশ্যে তারা সমরাস্ত্র-উৎপাদক শিল্প-কমিটির মধ্যে ও 'Workers' Groups' তৈরি করেছিলো। এই সমস্ত Group-এর প্রতিনিধিরা শ্রমিকশ্রেণীকে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি তৈরিতে আরো বেশি শ্রমদানের জন্য উৎসাহিত করছিলো। তাদের স্লোগান ছিলো, যুদ্ধের রসদ সরব-রাহ করে ধনী হয়ে ওঠো। তারা শ্রমিকশ্রেণীকে আরো প্রবলভাবে 'Workers' Groups'-এর নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য প্রচারে নেমে পড়েছিলো।

কিন্তু বলশেভিকরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তারা সমরাস্ত্র-উৎপাদক 'শিল্প-কমিটি'গুলিকে 'বয়কট' করলেন। ১৯১৫ সালের 'Workers' Gro-ups'-এর প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অধিকাংশ প্রতিনিধি 'Workers'

Groups'-এ অংশ নেবার বিরুদ্ধে তাদের অনীহা জ্ঞাপন করলেন। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ এক তীক্ষ্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন—'সমরাস্ত্র-উৎপাদক কমিটি'র বিরোধিতা শুধু নয়; শ্রমিক-শ্রেণী চায় শান্তির জন্য লড়াই ও জারতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ।

এরপর বলশেভিকরা স্থল ও নৌবাহিনীর ভিতরে প্রচণ্ড কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। তারা সৈনিকদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যুদ্ধের এই দানবীয় উন্মত্ততা ও মানুষের অপরিসীম লাঞ্ছনার জন্য দায়ি কে? তারা তাদের বোঝালেন যে 'মানুষকে' সাম্রাজ্যবাদীদের কসাইখানা থেকে মুক্ত করে আনার একটিই মাত্র পথ—বিপ্লব। তাদের চেষ্টায় স্থল ও নৌবাহিনীতে বলশেভিকদের বিপ্লবী কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেলো, যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সৈন্যবাহিনীর কাছে আহ্বান জানিয়ে প্রচুর পুস্তিকা ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

অচিরেই এর ফল ফলতে শুরু করলো। আক্রমণে অংশ নিতে অনিচ্ছুক সৈনিকদের প্রতিরোধ ক্রমশই বাড়তে লাগলো। বাল্‌টিক প্রদেশের উত্তরখণ্ডে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী-তৎপরতা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেলো। ফলে, ১৯১৭ সালের শুরুতেই ঐ ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল Ruzsky—সদর-কেন্দ্রকে এই বিপ্লবী তৎপরতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ তিন বছরে গড়ালো। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত, আহত কিম্বা নানা মহামারিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীরা এই যুদ্ধের ফলে ধনবান-হয়ে উঠলো। শ্রমিক কৃষকদের দুর্দশার সীমা পরিসীমা রইলো না। যুদ্ধ রুশিয়ার অর্থনৈতিক-জীবন ধ্বংস করে দিলো। ১ কোটি ৪০ লক্ষ সুস্থ দেহী মানুষকে কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদেই সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাতে হলো। একটির পর একটি কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করলো, কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন কৃষি-শ্রমিকের অভাবে দারুণভাবে হ্রাস পেলো। যুদ্ধক্ষেত্রে নগ্নপদ, ছিন্ন-বস্ত্র সৈন্যবাহিনী তীব্র অনাহারের সম্মুখীন হলো।

ফলে জারের সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধে উপর্যুপরি পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগলো। জার্মানীর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সামনে রুশীয় সৈন্যবাহিনীর লড়াই ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের লড়াই-এর মতো হাস্যকর হয়ে উঠলো। এই যুদ্ধে এই সত্যই প্রকাশিত হলো যে, জারের যুদ্ধ-মন্ত্রী Sukhomlinov—একজন বিশ্বাসঘাতক ও জার্মান গুপ্তচর বাহিনীর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। এবং জার্মান গুপ্ত-চর বাহিনীর নির্দেশেই তিনি অগ্রবর্তী রুশ সৈন্যবাহিনীর কাছে রসদ সরবরাহের মাধ্যমটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার নেপথ্য নায়ক। শুধু যুদ্ধ-মন্ত্রীই নন, জারের অনেক মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষরাও জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিজয়-অভিযানে সক্রিয় সহ-যোগী ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং 'জারিনা'।

ফলে ১৯১৬ সালে সমগ্র পোল্যাণ্ড ও বাল্‌টিক প্রদেশের বেশ কিছু অংশ জার্মানীর হস্তগত হয়।

এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়ে যাবার ফলে 'জারতন্ত্রের' বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যবাহিনীর সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও ক্রোধ দাবাগ্নির মতো জ্বলে উঠলো। এই ক্রোধ ঘৃণা ও বিরক্তি এবার ছড়ালো রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থক বুর্জোয়াদের মধ্যেও। তারা দেখলেন জারের দরবারে জার্মানীর সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তি-সম্পাদনের প্রবক্তা কুখ্যাত রাসপুটিনের দুরন্ত প্রতিপত্তি। এরাও বুঝলেন যে জারতন্ত্রের পক্ষে যথার্থ যুদ্ধ-পরিচালনা অসম্ভব। পরন্তু যে-কোনো মুহূর্তে রুশ-জার্মান চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। তাই তারা এক প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটিয়ে দ্বিতীয় জার নিকোলাসকে অপসারণ করে তার ভাই মাইকেল রোমানভকে তার স্থলাভিষিক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই ষড়যন্ত্রে মদত দিতে রাজি হলো ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার। তারা সন্ত্রস্ত হয়েছিলো এইকথা ভেবে যে, রুশ-জার্মান চুক্তি হলে যে বিপুল রুশ-সৈন্য তাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধে লিপ্ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

রুশ-বাহিনীর এই পরাজয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক-ভিত্তি ধসে পড়তে আরম্ভ করেছিলো। ১৯১৭ সালে সমগ্র রুশিয়াতে খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো। একটার পর একটা কল-কারখানা বন্ধ হলো; বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। এই শ্বাসরুদ্ধকারী অবস্থায় পড়ে মানুষ উপলব্ধি করলো যে জারতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ ভিন্ন তাদের বাঁচার আর কোনো আশা অবশিষ্ট নেই। বুর্জোয়ারা প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলো। কিন্তু জনগণ অন্য সমাধানের পথে এগিয়ে গেলো।

১৯১৭ সালের উদ্বোধন ঘটলো ৯ই জানুয়ারির ব্যাপক 'ধর্মঘটের' মধ্য দিয়ে। মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীদের সমস্ত চেষ্টাকে কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে পুটিলভ এবং ২২শে ফেব্রুয়ারিতে দেশের প্রায় সমস্ত শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে নেমে পড়লো। বলা বাহুল্য, এই ধর্মঘটের আহ্বায়ক ছিলো পেট্রোগ্রাডের 'বলশেভিক পার্টি'। এইবার রাস্তার মিছিলে নামলেন নারী-শ্রমিকরা। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক ধর্মঘট রূপান্তরিত হলো রাজনৈতিক সাধারণ বিক্ষোভ সমাবেশে। পুলিসের সঙ্গে সর্বত্র সংঘর্ষ বেধে গেলো। ২৬শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ও গণবিক্ষোভ উত্থানের চেহারা পেলো। শ্রমিকরা পুলিস ও রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করে সে অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করলো।

২৬শে ফেব্রুয়ারি সংরক্ষিত-বাহিনীর '৪র্থ কোম্পানি' শ্রমিকদের উপর গুলি না চালিয়ে বন্দুক ঘুরিয়ে দিলো অশ্বারোহী পুলিশ-বাহিনীর দিকে। এই সময় সৈন্যবাহিনীকে ঘৃণিত জারতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করার সংগ্রামে জনগণের

পক্ষে এসে দাঁড়াবার আকুল আহ্বান রুশিয়ার নারী-শ্রমিকদের কণ্ঠ থেকে বার-বার ধ্বনিত হওয়ায় যথেষ্ট সুফল লাভ হয়েছিলো।

একই সময়ে পেট্রোগ্রাডে অবস্থিত কমরেড মলোটভ-এর কর্তৃত্বাধীন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর-দপ্তর থেকে সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছিলো। ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই সদর-দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক ঘোষণায় জনগণকে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও অস্থায়ী বিপ্লবী-সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নামার আহ্বান জানানো হয়েছিলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারি পেট্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনী শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করতে অস্বীকার করলো ও বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে হাত মেলালো। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যাতেই বিপ্লবী-আন্দোলনে যোগদানকারী সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬০ হাজারে। এইবার সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকেরা জারের মন্ত্রীদের বন্দী করতে আরম্ভ করলো, বন্দী হলেন সৈন্যাধ্যক্ষেরা। জেলের দরজা খুলে সমস্ত বন্দী-বিপ্লবীকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। যেখানে জারের পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী সামান্য বাধা সৃষ্টি করছিলো তাও সৈন্যবাহিনীর তৎপরতায় স্তব্ধ হয়ে গেলো।

পেট্রোগ্রাডের এই সার্থক অভ্যুত্থানের খবর ঝড়ের বেগে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো। তখন অন্যান্য শহরে ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকরা জারের অফিসারদের নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করলো।

এইভাবে ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক বিপ্লব জয়ী হলো।

'বিপ্লব' জয়ী হবার প্রথম দিন থেকেই 'সোভিয়েট' তৈরি হয়ে গেলো। শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বারা গঠিত 'সোভিয়েট'গুলির উপর বিপ্লব ও বিপ্লবী তৎপরতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। ১৯০৫-এর বিপ্লবের পরই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমই হচ্ছে 'সোভিয়েট'।

লেনিন ও স্টালিন সহ বলশেভিক পার্টির বহু প্রথম সারির নেতা যখন জেলে কিম্বা নির্বাসনে এবং বলশেভিক কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত তখন সুযোগসন্ধানী 'মেনশেভিকরা' 'সোভিয়েট'গুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ফলে 'সোভিয়েট'গুলিতে মেনশেভিকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বেড়ে উঠলো। এমনকি পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েটও মেনশেভিক-দের দখলে গেলো। কেবল, Ivanovo-Voznesensk, Krasnoyarsk এবং আরো কিছু স্থানে বলশেভিকদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকলো।

মেনশেভিক ও স্তোসাল রিভলিউশনারীরা সত্য অর্থে শান্তি কিম্বা প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসান কোনটাই মনে প্রাণে চাননি তাই এই 'বিপ্লব'-এর সুযোগ নিয়ে যুদ্ধকেই চালিয়ে যেতে চাইলেন। তারা 'সোভিয়েটে' নির্বাচিত শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনী-প্রেরিত প্রতিনিধিদের বোঝালেন যে, যেহেতু 'বিপ্লব' সার্থক হয়েছে

সেই হেতু এখন দেশে 'স্বাভাবিক' অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ও নিয়মতান্ত্রিক-শাসন-প্রবর্তনের জন্য সোভিয়েট ও বুর্জোয়াদের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। বিপ্লবের সার্থকতায় উৎফুল্ল পাতি-বুর্জোয়া, সৈনিক এমন কি শ্রমিকরাও মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশনারীদের—'এর পর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক চলবে'—এই আশ্বাসবাণীকে বিশ্বাস করে অস্থায়ী-সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে-বসলো।

১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি চতুর্থ 'স্টেট ডুমার' উদারপন্থি সদস্যরা পূর্ব-চুক্তি অনুযায়ী স্যোসাল রিভলিউশনারী ও মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় 'স্টেট ডুমা'র জন্য একটি 'অস্থায়ী-কমিটি' গঠন করলেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তার 'প্রেসিডেন্ট' হলেন Rodzyanko নামক একজন স্বৈরাচারী ভূস্বামী। কিছুদিন পরে এই 'অস্থায়ী কমিটি' বলশেভিকদের অগোচরে রুশিয়াতে একটি নতুন সরকার-স্থাপনের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ঠিক হলো সেই সরকারের মাথায় থাকবেন Prince Lvov, যাকে 'ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের' আগে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য দ্বিতীয় জার নিকোলাস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বিপ্লবের শত্রু Constitutional-Democrats, ও Octoborists-দের প্রতিনিধি যথাক্রমে Milyukov, Guehkov ও তৎসহ পুঁজিবাদী-শ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধি ও 'ডেমোক্রাসির' প্রবক্তা (!) স্যোসাল রিভলিউশনারী Kcreusky-র মতো মানুষেরা সেই 'সরকার'কে অলংকৃত করবেন—এমন সিদ্ধান্ত হলো।

এইভাবে স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকদের দ্বারা গঠিত 'সোভি-য়েট'গুলির কার্য-নির্বাহক-কমিটি বিপ্লবের ফসলকে তুলে দিলেন বুর্জোয়াদের হাতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বলশেভিকদের প্রতিবাদ সত্বেও শ্রমিক ও সৈনিকদের 'সোভিয়েট'গুলির অধিকাংশ 'ডেপুটি'রাই এই 'সরকার'কে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু রুশিয়ায় এই বুর্জোয়া-সরকার গঠিত হলেও সমস্ত রুশদেশ জুড়ে শ্রমিক ও সৈনিকদের 'সোভিয়েট'গুলির দুরন্ত প্রভাব অক্ষুন্নই রইলো। ফলত, রুশি-য়াতে দুই ধরণের 'একনায়কতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা হলো। (১) বুর্জোয়া-শ্রেণীর এক-নায়কতন্ত্র ও (২) সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।

রুশিয়ার এই নতুন 'অস্থায়ী-সরকার'এর কাজকর্ম ও ব্যবহার বলশেভিকদের ভবিষ্যৎবাণীকেই সত্য করে তুললো। কিছুদিনের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হতে থাকলো যে এই 'সরকার' জনগণের মিত্র নয় পরন্তু জনগণের শত্রু, এরা শান্তির পক্ষে নয় পরন্তু যুদ্ধের সমর্থক এবং এই সরকার জনগণকে জমি, খাদ্য ও শান্তি প্রদান করতে অসমর্থ। রুশিয়ার শ্রমিক ও সৈনিকশ্রেণী যখন রুশিয়াকে জার-তন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসে একনিষ্ঠ তখন এই 'সরকার' গোপনে 'জারের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিতীয় জার নিকোলাসের

জায়গায় Romanov-এর ভ্রাতা Michael-কে বসানোর শলাপরামর্শে ব্যস্ত। এই সরকারের মুখোশ খুলে পড়ে, যেদিন এক শ্রমিক-সমাবেশে Guchkov বলে বসেন—'সম্রাট Michael দীর্ঘজীবী হউন'। উত্তেজিত শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ গুচ্‌কভের গ্রেপ্তারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন।

রুশিয়ার এই 'অস্থায়ী-সরকার' ও 'সোভিয়েট'গুলির দ্বৈত লড়াই-এ একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, রুশিয়ার ভাগ্য এই দুই শক্তির যে কোনো একটির উপর নির্ভর করে আছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্তোসাল রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকদের পিছনে শ্রমিকদের একাংশ ও সৈনিক-কৃষকদের একটা ব্যাপক অংশের সমর্থন তখনও ছিলো। তারা তখনও বিশ্বাস করতো যে এই অস্থায়ী-সরকার তাদের মৌল সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম এবং যুদ্ধ যে পররাজ্য গ্রাসের জন্য নয় পিতৃভূমির সর্বভৌমিকত্ব রক্ষার জন্য চলছে—এটাও সত্য।

ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের পর নিষিদ্ধ 'বলশেভিক পার্টি' অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এলো। স্টালিন, মলোটভ প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নেতারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্যে 'পার্টি'র কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁরা অস্থায়ী-সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলেন, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ এই নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। 'বলশেভিক পার্টি'র কিছু সদস্য তখনো রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য ও দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকার ফলে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই মুহূর্তে কমরেড লেনিনের অনুপস্থিতি পার্টি ভীষণভাবে অনুভব করছিলো।

১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল দীর্ঘ নির্বাসনের পালা কাটিয়ে লেনিন স্বদেশে ফিরলেন। লেনিনের এই প্রত্যাবর্তন পার্টি ও বিপ্লবী-উদ্যমে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার নিয়ে এলো। লেনিন যেদিন পেট্রোগ্রাডের পথে ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে পৌছলেন সেদিন হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা দেশের মাটিতে লেনিনের উপস্থিতির উপযোগিতাকে 'ইতিহাসে' রূপান্তরিত করে ফেলেছিলো। লেনিন সেদিন সৈনিকদের কাঁধে ভেসে যেতে যেতে দেখেছিলেন তাঁর চার পাশে উদ্যত শত সহস্র রাইফেলের ঝক্‌ঝকে নল বিপ্লবের জন্য উর্ধ্বমুখ, আর তারকাচিহ্নিত সহস্র সহস্র লাল পতাকার আস্ফালন। সেদিনই বোঝা গিয়েছিলো বিপ্লবের আর দেরি নেই। লেনিন সেদিনই এক সাঁজোয়া গাড়ি থেকে শ্রমিক-সৈনিকের এক বিশাল সমাবেশে 'সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব'-এর জন্য আহ্বান জানালেন। লেনিনের এই আহ্বান ঐতিহাসিকভাবে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক রিভলিউশনের' কালকে অতিক্রম করে গেলো।

এরপর 'সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব' সাধনের বিপ্লবী-তৎপরতায় লেনিন ও পার্টির দিনগুলি ঝড়ের গতিতে আরো অগ্নিগর্ভ দিনের দিকে এগিয়ে গেলো। লেনিন

পেশ করলেন তাঁর ঐতিহাসিক 'এপ্রিল-থিসিস'। জনগণ এই প্রথম সুনিশ্চিত-ভাবে জানলো, কিভাবে, কোনপথে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-বিপ্লব থেকে 'সমাজ-তান্ত্রিক-বিপ্লব'-এ পৌছে যাওয়া যায়।

সেই পথ ছিল দুটি। (১) এই মুহূর্তে সমস্ত জমির জাতীয়করণ ও ভূ-সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করণ। সমস্ত ব্যাঙ্ককে সংহত করে একটি 'জাতীয়-ব্যাঙ্কের' প্রতিষ্ঠা এবং তার নিয়ন্ত্রণের ভার সোভিয়েট ওয়ার্কার ডেপুটিদের অর্পণ। দেশে উৎপন্ন সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন। এগুলি ছিলো অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। (২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, প্রথমেই সংসদীয় রাষ্ট্রকাঠামোর বদলে সোভিয়েট রাষ্ট্র-কাঠামোর প্রতিষ্ঠা। মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার কার্যকারীতার মাধ্যমই হচ্ছে এই ধরণের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিষ্ঠা।

এই ঐতিহাসিক 'এপ্রিল-থিসিস'-এ লেনিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে এই যুদ্ধ, একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই ক্ষেত্রে 'পার্টি'র দায়িত্বই হচ্ছে জন-গণকে বোঝানো যে, দেশের বুর্জোয়া-প্রাধান্যকে নির্মূল না করলে এই যুদ্ধের অবসান অসম্ভব, সত্যকার 'শান্তি' প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। সুতরাং বলশেভিকদের একমাত্র শ্লোগান হবে—'অস্থায়ী সরকারকে কোনো রকম সমর্থন নয়'।

লেনিন আরো জানালেন যে 'সোভিয়েট'গুলিতে এখনও মেনশেভিক ও স্তোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের প্রাধান্য বর্তমান। তিনি এই 'সোভিয়েট'গুলির সমর্থনে গঠিত 'অস্থায়ী-সরকারের' বিরুদ্ধে কিন্তু বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন না। তিনি এই সরকারকে উৎখাতের কথাও বললেন না। পরন্তু তিনি নির্দেশ দিলেন যে 'সোভিয়েট'গুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য জনগণের মধ্যে তাদের পথ ও মতের ব্যাপক প্রচার ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির অনলস প্রচেষ্টা 'পার্টি'কে চালাতে হবে। এইভাবে 'সোভিয়েট'গুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সরকারকে সরকারী নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করানো যাবে।

এই 'এপ্রিল-থিসিস'-এ লেনিন 'পার্টি'র শরীর থেকে স্তোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অখ্যাতি-অর্জনকারী নামটি মুছে ফেলার প্রস্তাব দিলেন। ২য় আন্তর্জাতি-কের অন্তর্গত দলগুলি নিজেদের 'স্তোসাল ডেমোক্রাট' বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এই নাম তার পরে পরিচিত হয়েছিল জঘন্য সুবিধাবাদ ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বোঝাতে।

লেনিন প্রস্তাব করলেন, এর পর থেকে 'বলশেভিক পার্টি'র নাম হোক "কমি-উনিস্ট পার্টি", যে নাম মার্কস-এঙ্গেলসের দেওয়া। কেননা 'কমিউনিস্ট পার্টি'র লক্ষ্য 'কমিউনিজমে' পৌছনো এবং সেই লক্ষ্য 'বলশেভিক-পার্টি'রও।

শেষে লেনিন বললেন, এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবিলম্বে একটি নতুন আন্তর্জাতিক আহ্বান করা প্রয়োজন—যে 'আন্তর্জাতিক' অভিহিত হবে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' বলে।

লেনিনের এই প্রস্তাবাবলী, দুই চারজন ব্যতিরেকে, সমগ্র পার্টি গভীর সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করলো।

বলশেভিকরা যখন পরিপূর্ণ 'বিপ্লব'এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছিলেন তখন রুশিয়ার 'অস্থায়ী-সরকার' জনস্বার্থ-বিরোধী গর্হিত কর্মে নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন। জনগণের আরো রক্ত ঝরিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যাতে সাম্রাজ্যবাদী-দের তথাকথিত বিজয়কে সম্পূর্ণ করতে পারে—এই উদ্দেশ্যে 'অস্থায়ী-সরকার' 'জারতন্ত্রের' সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিলেন। ১৯শে এপ্রিল অস্থায়ী-সরকারের এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লে ২০শে এপ্রিল 'বলশেভিক-পার্টির' কেন্দ্রীয়-কমিটি এই বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহ্বান জানালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিকের বিক্ষোভ ফেটে পড়লো। তারা মিছিল করে যেখানে 'অস্থায়ী-সরকার' কাজ করছিলেন সেখানে হাজির হলো। জেনারেল করনিলভ সেই বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি বর্ষণের দাবি করলেন এবং গুলি চালাবার হুকুমও দেওয়া হলো। কিন্তু সৈন্যবাহিনী সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করলো।

উত্তেজনার তুঙ্গে অবস্থান করেও 'বলশেভিক-পার্টি' কোনো হটকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি—এটাই সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনের লক্ষ্যে 'পার্টি'র সবচেয়ে বড় সার্থকতা। ২০-২১শে এপ্রিলের গণবিক্ষোভের দিনগুলিতে পেট্রোগ্রাডের কিছু 'পার্টি'-সদস্য হঠাৎ অস্থায়ী-সরকারকে অবিলম্বে উৎখাত করার শ্লোগান জানিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'পার্টি' এই অতি 'বাম' সিদ্ধান্তকে নিন্দা করলো। কারণ 'পার্টি' বিশ্বাস করতো এখনও এ 'শ্লোগান' দেবার সময় আসেনি—পরন্তু এই শ্লোগান 'সোভিয়েট'গুলির উপর বলশেভিকদের আধিপত্য স্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। ১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিলের 'বলশেভিক পার্টির' অধিবেশনে লেনিনের 'এপ্রিল-থিসিস'-এর উপর জোর বিতর্ক চলে। Kamenev, Zinoviov, Bukharin প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্বেও লেনিনের প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

এই অধিবেশনের পর বলশেভিক পার্টি জনগণের ব্যাপক আস্থা অর্জনের জন্য ভয়ংকরভাবে চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে। 'সোভিয়েট'গুলিতে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির সক্রিয় চেষ্টা ছাড়াও, 'পার্টি', শ্রমিক-সংগঠন, ফ্যাক্টরি-কমিটিগুলিতে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা শুরু হয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। সৈন্যবাহিনীর সর্বত্র 'সামরিক-সংগঠন' গড়ে উঠতে আরম্ভ করে।

এই তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে 'পেট্রোগ্রাড' সোভিয়েতের নির্বাচনে বলশেভিকরা প্রায় সমস্ত আসনই দখল করে নেয়। ১৯১৭ সালের ৩রা জুন, অখিল-রুশ-সোভিয়েট-এর প্রথম অধিবেশন বসে। এই সমাবেশেও বলশেভিকরা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হয়েই রইলো। ৮০০ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে বলশেভিক-প্রতিনিধিদের

সংখ্যা ছিল মোটে ১০০ জন। এই 'সোভিয়েট'গুলির উপর বিপ্লব-এর কিছু পূর্ব পর্যন্ত মেনশেভিক ও স্থোসাল রিভলিউশানীদের প্রাধান্যই বলশেভিকদের স্বপ্ন-সিদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, অথচ 'সোভিয়েট'গুলি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতীক বলেই বলশেভিকদের নিরন্তর চেষ্টা ছিলো 'সোভিয়েট'গুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। কেননা 'সোভিয়েট'গুলি দখল না করলে 'সোভিয়েট'-এর উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণের ("All power to the Soviets") বলশেভিকদের দাবির ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে যায়। অথচ সুবিধাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক, শান্তি ও গণতন্ত্রের ঘোরতর শত্রু এই সমস্ত 'মেনশেভিক' ও 'স্থোসাল-রিভলিউশানারীদের' মুখোশ বলশেভিকরা খুলে দিলেও 'সোভিয়েট'গুলিতে তখনও ওদেরই প্রাধান্য ছিলো। ওদের সোভিয়েট-এর সমর্থক শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকেরা হয়তো মেনশেভিক ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে তখনও আস্থাশীল ছিলেন অথবা যে ঐতিহাসিক শিক্ষা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত না হলে মানুষ ভ্রম করে সেই ভ্রমের জালে বন্দী হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্য যাদের মন্দ, জনগণের মঙ্গল চিন্তা যাদের ধর্ম নয়, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাদের মাথা ব্যথা নেই, তাদের মুখোশ একদিন খুলে পড়বেই। বলশেভিকদের নিরন্তর চেষ্টা ও অস্থায়ী সরকারের নানা অপকর্ম যদিও মেনশেভিক স্থোসাল রিভলিউশনারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মুখোশ অনেকটাই খুলে দিয়ে ছিলো, তবু ওদের জনগণকে ধাপ্পা দেবার শেষ চেষ্টা ও শেষ প্রতিরোধকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো।

১৯১৭ সালের ৩রা জুন 'প্রথম সোভিয়েটগুলির অধিবেশন'-এ 'অস্থায়ী সরকার' সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে ও ব্রিটিশ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'অগ্রবর্তী অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে' আক্রমণে (offensive) প্ররোচিত করে। রুশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের ফলে যুদ্ধ-জয়ের যে সুবিধা পাওয়া যাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে, 'সোভিয়েট'গুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং সেই সঙ্গে বলশেভিক ও বিপ্লবীদেরও কবর রচনা করবে। যুদ্ধে যদি পরাজয়ও আসে তাহলেও সৈন্যবাহিনীর ভিতরে বিভেদসৃষ্টিকারী বলশেভিকরাই এই পরাজয়ের জন্য দায়ি একথা বলে নিজেরা নিরাপদে থাকবে।

কিন্তু ইতিহাস গড়িয়ে গেলো অন্য পরিণামের দিকে। যুদ্ধের অগ্রবর্তী অঞ্চলের ক্লান্ত, রসদহীন সৈনিকেরা হঠাৎ 'আক্রমণের' এই নীতির কোনো মানে খুঁজে পেলো না। ফলে পরাজয় অবধারিতভাবে নেমে এলো তাদের উপর। এই খবর ছড়িয়ে পরার পর রুশিয়ার রাজধানীতে প্রবল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলো।

শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর বিক্ষোভের আর সীমা থাকলো না। একথা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে 'শান্তি'র মুখোশের আড়াল নিয়ে এই 'সরকার' আসলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকেই চালিয়ে নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে 'সোভিয়েট'গুলির 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী-সমিতি' এই ক্ষেত্রে হয় অনিচ্ছুক, না হয় এই অস্থায়ী সরকার-এর জঘন্য অপকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম অথবা তাদের সহচর।

অস্থায়ী-সরকার ও 'সোভিয়েট'গুলির নিয়ন্ত্রকদের উপর অনাস্থাবোধ পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষোভে টেনে আনলো। ৩রা জুলাই সমগ্র পেট্রোগ্রাড জুড়ে সশস্ত্র-বিক্ষোভ দেখা দিলো। তাদের দাবি ছিলো অবিলম্বে 'সোভিয়েট'গুলির উপর সমস্ত ক্ষমতা-অর্পণের। বলশেভিকরা তখনও দেশের অবস্থা সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পক্ষে উপযোগী নয় বলে যে কোনো রকম সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন। তারা জানতেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও নানা দিকে ছড়িয়ে থাকা সৈন্যবাহিনী 'রাজধানী'র অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত নয়। এই অবস্থায় 'রাজধানী'র এই অভ্যুত্থানকে দমন করা প্রতি-বিপ্লবীদের পক্ষে খুব সহজ হবে। কিন্তু পেট্রোগ্রাডের উত্তাপ সেদিন এত তীব্র ছিলো যে বলশেভিকরাও সে বিক্ষোভে অংশ না নিয়ে পারেননি। তারা এই বিক্ষোভ যাতে শান্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যে অবিচল থাকে সে বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সেই মিছিল পেট্রোগ্রাড 'সোভিয়েট' ও সোভিয়েটগুলির 'কার্যকরী-সমিতি'র সদর দপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে দাবি করেছিলেন যে অবিলম্বে সোভিয়েট-গুলিকে দেশ শাসনের সমস্ত অধিকার প্রদান করতে হবে, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, কার্যকরী 'শান্তি-নীতি' অবলম্বন করতে হবে।

এই বিক্ষোভ ও সমাবেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে না পারার দরুণ—সৈন্যবাহিনীর কিছু প্রতিক্রিয়াশীল অফিসার ও ক্যাডেটকে এই সমাবেশ চূর্ণ করতে বলা হলো। পেট্রোগ্রাডের রাজপথ আবার শ্রমিক ও সৈনিকের রক্তে ভাসলো।

এই বিক্ষোভ চূর্ণ করার পর বুর্জোয়া ও হোয়াইট-গার্ড জেনারেলদের সমর্থন পুষ্ট মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশনারীরা হিংস্র নেকড়ের মতো বলশেভিক পার্টির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'প্রাভদা' দপ্তর তছনছ করা হলো। বলশেভিক পার্টির সমস্ত মুখপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হলো। 'রেডগার্ড'দের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো। ফলে, পেট্রোগ্রাড গ্যারিসনের বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে রাজধানী থেকে সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন 'ট্রেন্‌চে' আশ্রয় দেওয়ার বন্দোবস্ত হলো। সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলো। ৭ই জুলাই লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। এইভাবে 'অস্থায়ী-সরকার' সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতি-বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন। এত-

দিন রুশিয়াতে যে দ্বৈত-শাসন চলছিলো এখন তার অবসান হলো। সমস্ত ক্ষমতা অতঃপর বুর্জোয়া 'অস্থায়ী-সরকার' এর হাতে চলে এলো। মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশানারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'সোভিয়েট'গুলি সরকারের 'উপাঙ্গ'-রূপে শোভা পেতে লাগলো।

এই অবস্থায় পড়ে 'বলশেভিক পার্টি' তার কৌশল পরিবর্তন করে পুনরায় আত্মগোপন করলো—লেনিন অজ্ঞাতবাসে গেলেন। 'বেয়নেট'-এর মাধ্যমে অস্থায়ী-সরকারকে উৎখাতের বিপ্লবী উদ্যোগ শুরু হয়ে গেলো।

এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে অত্যন্ত গোপনে 'বলশেভিক পার্টি'র ৬ষ্ঠ অধিবেশন বসলো। ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা অগাস্ট পর্যন্ত ঐ অধিবেশন চলেছিলো। সরকারী গুপ্তচরবাহিনীর হন্যে হয়ে অধিবেশন-স্থান খুঁজে বের করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। এ থেকেই বোঝা যায় 'বলশেভিক পার্টি' কী কঠিন শৃংখলাবোধ ও গোপনীয়তা রক্ষার নিচ্ছিদ্র আবরণ তৈরি করেছিলো। নিরাপত্তার অভাবহেতু এই অধিবেশনে লেনিন উপস্থিত হননি। কিন্তু তিনিই ছিলেন এই অধিবেশনের নেপথ্য নায়ক।

এই অধিবেশনে মোট ২৮৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪০,০০০ (দু লক্ষ চল্লিশ হাজার)। এই অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের মুখ থেকে জানা গেলো যে রুশিয়ার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক ও সৈনিকরা দলবদ্ধভাবে, মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশনারী নিয়ন্ত্রিত 'সোভিয়েট' থেকে বেরিয়ে আসছে ; ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শ্রমিক ও সৈনিকরা তাদের সদস্য পত্র ছিঁড়ে ফেলে 'বলশেভিক পার্টি'তে নাম লেখাবার জন্য আবেদনপত্র পেশ করছে।

এই অধিবেশনে 'সেণ্ট্রাল কমিটি'র 'রাজনৈতিক রিপোর্ট'-এর উপর আলোচনায় একথা স্বীকৃত হলো যে বুর্জোয়াদের বাধাদান সত্ত্বেও দেশের পরিস্থিতি সশস্ত্র বিপ্লবের অনুকূল কেননা দেশে দ্বৈত-শক্তির শাসনের অবসান ঘটেছে। মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী-নিয়ন্ত্রিত 'সোভিয়েট'গুলি নিজেদের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণের বদলে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে 'অস্থায়ী-সরকারের' হাতে এবং ফলে নিজেরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। অপরদিকে বুর্জোয়া-সরকার, দমন পীড়ন ও বলশেভিক পার্টিকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব সংঘটিত করার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে। সুতরাং অস্ত্রের সাহায্যে 'অস্থায়ী-সরকার'কে সমূলে উৎখাত করা ছাড়া সর্বহারার কাছে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকদের 'All power to Soviets'—এই আহ্বান জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে কেননা রুশিয়ার অধিকাংশ 'সোভিয়েট' তখনও মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের দখলে। তাই কমরেড স্টালিনের প্রস্তাবে ঐ 'শ্লোগান' সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে

নেওয়া হলো। বলাবাহুল্য পার্টির লক্ষ্য অবশ্যই রইলো সোভিয়েটগুলিকে দখল করে সেই সোভিয়েটগুলির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণের।

এই অধিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল যুগান্তকারী। ট্রট্স্কি-পন্থি সদস্য Preobrazhensky মার্কসীয় তত্ত্বের কূটপ্রশ্ন তুলে বলেছিলেন যে "The country could be directed towards Socialism only in the event of a proletarian revolution in the West".

তার উত্তরে স্টালিনের ঐতিহাসিক জবাব ছিল—"The possibility is not excluded that Russia will be the country that will lay the road to Socialism··· We must discard the antiquated idea that only Europe can show us the way. There is dogmatic Marxism and creative Marxism. I stand by the later".[৪]

এই অধিবেশনের আরেকটি ঘটনাও খুব তাৎপর্যমণ্ডিত। বিচারের জন্য লেনিনের অস্থায়ী-সরকারের আদালতের কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত কি উচিত নয় এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিলো। Kamenov, Rykov, Trotsky-রা চেয়েছিলেন লেনিনের আদালতের মুখোমুখি হওয়া উচিত। স্টালিন এই প্রস্তাবকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস জানতো যে বিচারের নামে লেনিনের অস্তিত্ব বিলোপ করাই হচ্ছে 'অস্থায়ী-সরকারের' অভিপ্রায়।

এই অধিবেশনে Mezhrayontsi-দল তাদের নেতা ট্রট্স্কিকে 'পার্টি'তে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেছিলো। এই দলটিতে কিছু ট্রট্স্কি-পন্থি মেনশেভিক ও কিছু দলছুট বলশেভিক ছিলেন। বলশেভিকদের বিরোধীতা করলেও মেনশেভিকদের সঙ্গেও তারা নানা প্রশ্নে একমত ছিলেন না। ষষ্ঠ-অধিবেশনে এই 'দল' ঘোষণা করেছিলো যে, অতঃপর তারা সর্বক্ষেত্রে 'বলশেভিক'দের সমর্থন করবে। সুতরাং তাদের 'বলশেভিক পার্টি'তে গ্রহণ করা হয়েছিলো। এঁদের অনেকেই অবশ্য পরে মনে প্রাণে বলশেভিক হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'বলশেভিক পার্টি'র ইতিহাস রচনাকালে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে ট্রট্স্কি ও তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ কেউ পার্টিতে ঢুকেছিলেন ভিতর থেকে 'পার্টি'কে ধ্বংস করার জন্য।[৫]

এই ষষ্ঠ-অধিবেশন থেকেই প্রথম সরাসরি সশস্ত্র-বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়েছিলো শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের উদ্দেশ্যে। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিলো "Prepare, then, for new battles, comrades-in-arms! Staunchly, manfully and calmly, without yielding to

provocation, muster your forces and form your fighting columns…"৬

একদিকে সশস্ত্র-বিপ্লবের আহ্বান ও অন্যদিকে বিপ্লবের চেষ্টা ও 'সোভিয়েট'-গুলিকে ধ্বংস করে রুশিয়ায় একটি প্রতি-বিপ্লবী স্বৈরতন্ত্রী-শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা যুগপৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কোর্ট মার্শালের নামে সৈনিক হত্যা চলছিল। ১২ই অগাস্টে অস্থায়ী-সরকারের উদ্যোগে Council of State'-এর এক অধিবেশনে অস্থায়ী-সরকারের প্রধান স্যোসাল রিভলিউশনারী কেরেনেস্কি সদম্ভে ঘোষণা করলেন, দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের সমস্ত চেষ্টাকে 'by iron and blood' দমন করা হবে।

অবশ্য এই 'অধিবেশনের' বিরুদ্ধে বলশেভিকদের প্রতিবাদ মস্কো ও অন্যান্য শহরে সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হলো।

এবার এই নতুন লড়াই-এর নায়ক হয়ে উঠলেন রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল করনিলভ। তাকে মদৎ দিতে তার পিছনে সমবেত হলেন কোটিপতি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী এবং নানা ধরণের উৎপাদকরা—তাদের সঙ্গে হাত মেলালো ব্রিটেন ও ফ্রান্স। করনিলভের কাছে তাদের একটিই দাবি ছিলো—অবিলম্বে বিপ্লবকে খতম করো।

করনিলভ প্রকাশ্যেই বিপ্লবকে চূর্ণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তারা দেশে গুজব ছড়ালেন যে বলশেভিকরা ২৭শে অগাস্ট পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছে। ফলে কেরেনেস্কির পরিচালনাধীন 'অস্থায়ী-সরকার', বিপ্লব দমনের নামে বলশেভিক ও সর্বহারার পার্টির উপর সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একই সময়ে জেনারেল করনিলভ পেট্রোগ্রাডের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটো (১) সোভিয়েটগুলির ধ্বংস-সাধন ও (২) সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

প্রথমদিকে কেরেনেস্কি ও করনিলভ প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে দোসর হয়েছিলেন। কিন্তু করনিলভের দ্রুত ক্ষমতা-বৃদ্ধি ও ক্ষমতা লাভের উদগ্র বাসনা দেখে শঙ্কিত কেরেনেস্কি পত্রপাঠ করনিলভের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। কেরেনেস্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণই করনিলভের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ও তাকে চূর্ণ করবে এবং তাদের সাধের 'বুর্জোয়া-সরকার' সেই জোয়ারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

২৫শে আগস্ট ১৯১৭, জেনারেল করনিলভ, জেনারেল ক্রিসভ-এর নেতৃত্বে তৃতীয় অশ্বারোহী-বাহিনীকে পেট্রোগ্রাডের বিপ্লব-দমনের জন্য প্রেরণ করলেন।

করনিলভের এই বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে বলশেভিক পার্টির 'কেন্দ্রীয় কমিটি' সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন। শ্রমিক-শ্রেণী ও লাল-ফৌজ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে নিজেদের প্রস্তুত

করে তুললো। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্রুত তাদের সদস্যদের সংঘবদ্ধ করলো। পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবী সামরিক ইউনিটগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। পেট্রোগ্রাডকে ঘিরে পরিখা কাটা হলো, কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হলো সর্বত্র এবং পেট্রোগ্রাড অভিমুখী সমস্ত রেললাইন তুলে ফেলা হলো। Kronstadt থেকে কয়েক হাজার সশস্ত্র নাবিক পেট্রোগ্রাড রক্ষার জন্য হাজির হলো। করনিলভের 'Savage Division'-এ প্রেরিত হলো বলশেভিক প্রতিনিধিদের। এই সমস্ত প্রতিনিধিরা Savage Division-এর ককেশীয় অশ্বারোহীদের কাছে করনিলভের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিলেন। ফলে তারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করলো। বিক্ষুব্ধ সৈনিকেরা করনিলভের অন্যান্য ইউনিট-এ ছড়িয়ে পড়লো।

করনিলভের মতো জেনারেলের ষড়যন্ত্রকে এইভাবে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখে স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকরা ভয়ংকরভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারা আত্মরক্ষার জন্য এই প্রথম বলশেভিকদের শরণাপন্ন হলেন। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে করনিলভকে সমূলে ধ্বংস করার ক্ষমতা একমাত্র বলশেভিকদেরই আছে।

কিন্তু বলশেভিকরা একই সঙ্গে করনিলভ ও কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার কাজ থেকে বিরত হলেন না। তারা কেরেনেস্কি পরিচালিত 'সরকার' ও সেই সঙ্গে স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী, মেনশেভিকদের স্বরূপ জনগণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। বললেন, এরাই করনিলভের প্রতিবিপ্লবী-চক্রান্তের অন্যতম সহযোগী।

এই সমস্ত প্রতিরোধের সম্মুখে পড়ে করনিলভের 'চক্রান্ত' চূর্ণ হয়ে গেলো। জেনারেল ক্রিমভ আত্মঘাতী হলেন। করনিলভ, ডেনিকিন ও লুকমস্কি প্রমুখ চক্রান্তকারীরা গ্রেপ্তার হলেন (অবশ্য কেরেনেস্কি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন)।

করনিলভের ষড়যন্ত্রকে এইভাবে নির্মূল করাতে প্রমাণ হয়ে গেলো যে বলশেভিক পার্টি এখন যে কোনো প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে চূর্ণ করে দিতে সক্ষম। যদিও 'বলশেভিক পার্টি' তখনও শাসক-পার্টি ছিলো না তথাপি করনিলভের অভিযানের দিনগুলিতে ঐ পার্টিই শাসক-দলের ভূমিকা পালন করেছিলো। তখন বলশেভিক পার্টির নির্দেশকেই শ্রমিক ও সৈনিকেরা শিরোধার্য করেছিলো। করনিলভের পরাজয় প্রমাণ করেছিলো, দৃশ্যত মৃত 'সোভিয়েট'গুলি বিপ্লবী প্রতিরোধের চূড়ান্ত দক্ষতায় পৌঁছেছে। এই সোভিয়েট ও বিপ্লবী কমিটিগুলি করনিলভের সৈন্যদের কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে তাদের নিবৃত্ত ও শক্তিহীন করে ফেলেছিলো। করনিলভের পরাজয়ে নির্জীব হয়ে আসা শ্রমিক ও সৈনিকদের 'কর্মী সোভিয়েট' (Workers' Soviet) গুলি পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সমঝোতা-নীতির খোলস ছেড়ে এবার তারা সোজাসুজি বৈপ্লবিক

সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য 'বলশেভিক পার্টির' পতাকাতলে সমবেত হলো। ফলে 'সোভিয়েট'গুলিতে বলশেভিকদের ক্ষমতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেলো।

করনিলভের বিদ্রোহ কৃষক-সম্প্রদায়ের শেষ আশাটুকুকেও নির্মূল করেছিলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, যদি ভূস্বামী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের বলশেভিক ও সোভিয়েটগুলিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র সফল হয় তাহলে পরবর্তীকালে রুশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়ও ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। ফলে, দরিদ্র কৃষকসমাজও সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে 'বলশেভিকদের' সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলো। কৃষক সমাজের এক বৃহৎ অংশ এবার উপলব্ধি করতে পারছিলো যে একমাত্র এই 'বলশেভিক পার্টি'ই তাদের যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এরাই ভূস্বামীদের হাত থেকে জমির অধিকার কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য প্রস্তুত।

এইভাবে সমগ্র রুশিয়া জুড়ে বিপ্লবের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠলো। চারদিকে 'সোভিয়েট'গুলির পুনর্জাগরণ ও বলশেভিকরণ আরম্ভ হলো। কারখানা, মিল ও মিলিটারী ইউনিটগুলি নতুন 'নির্বাচনের' মাধ্যমে মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের বদলে বলশেভিক পার্টির সদস্যদের নির্বাচিত করে 'সোভিয়েট'গুলিতে পাঠাতে আরম্ভ করলো। ৩১শে অগাস্ট 'পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট' বলশেভিক-নীতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করলো। 'Chkheidze-এর নেতৃত্বাধীন মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলী (Presidium) পদত্যাগ করলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর 'মস্কো সোভিয়েট' ও বলশেভিকদের দিকে চলে এলো। এদের সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলীও পদত্যাগ করলেন। দুটো পরম শক্তিশালী 'সোভিয়েট' এইভাবে নিষ্কণ্টক হলো।

সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পরম লগ্ন যে আসন্ন তার নানা লক্ষণ প্রকট হতে থাকলো। 'All power to the Soviets' শ্লোগান আবার দিগ্‌বিদিক বিদীর্ণ করতে আরম্ভ করলো। বলা বাহুল্য, এই শ্লোগানের মানে মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ নয়, পরন্তু, 'অস্থায়ী সরকার'-এর বিরুদ্ধে 'সোভিয়েট'গুলির উত্থানের এবং বলশেভিক নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েটের উপর সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণের।

এই প্রচণ্ড উন্মাদনার দিনগুলিতে আপোষকামী দলগুলির মধ্যে ভাঙন প্রকট হলো। সমস্ত আপোষকামী দলের মধ্যে বিক্ষুব্ধ 'বাম'গোষ্ঠী গড়ে উঠলো। এবং বলা বাহুল্য তারা বলশেভিক নীতির দিকে ঝুঁকে পড়লো।

মেনশেভিক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে অখিল-রুশ ডেমোক্রাটিক দলগুলির এক অধিবেশন ডেকে 'Pre-Parliament' গঠন করে বিপ্লবের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হলো। বলা বাহুলা, বলশেভিক পার্টি এই Pre-Parliament-কে বয়কট

করলো, এবং নিজেরা 'সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেস' আহ্বানের কাজে প্রচণ্ড তৎপর হয়ে উঠলো। কেননা বলশেভিকরা সোভিয়েটগুলিতে নিজেদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছিলো।

এই সময়ে লেনিন ঘোষণা করলেন যে, মস্কো ও পেট্রোগ্রাড এই দুই রাজধানীর 'সোভিয়েট' দুইটি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে বলশেভিক পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন সেই হেতু বলশেভিক পার্টির উচিত State Power নিজেদের হাতে নিয়ে আসা। লেনিন পরিপূর্ণ উত্থানের পরিকল্পনা 'কেন্দ্রীয় কমিটি'র কাছে পেশ করলেন। সেই পরিকল্পনায় স্পষ্ট করে বলা হল কোন্ সৈন্য ইউনিট, নৌবাহিনী এবং লাল-ফৌজকে কোথায় কখন ব্যবহার করতে হবে, পেট্রোগ্রাডের কোন্ কোন্ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানগুলি পূর্বেই দখল করে নিতে হবে।

৭ই অক্টোবর লেনিন গোপনে ফিন্ল্যাণ্ড থেকে পেট্রোগ্রাডে এসে পৌছ-লেন। ১০ই অক্টোবর পার্টির 'কেন্দ্রীয় কমিটির' ঐতিহাসিক-অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশন থেকেই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ঘোষণা করা হল 'রুশ-বিপ্লবের' আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি (পেট্রোগ্রাডকে জার্মানদের হাতে তুলে দেবার কেরেনেস্কি এ্যাণ্ড কোম্পানির ষড়যন্ত্র) বিবেচনা করে এবং তৎসহ সোভিয়েটগুলিতে সর্ব-হারাদের শক্তি বৃদ্ধি ও কৃষক-বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি প্রতিক্রিয়াশীলদের পেট্রোগ্রাড থেকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেখানে কসাক-বাহিনীকে বসাবার দুরভিসন্ধির কারণ অনুমান করে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে 'বিপ্লব'কে সার্থক করতে হবে। অভ্যুত্থান ছাড়া উপায় নাই।

Kamenuv ও Zinoviev-এর মত মানুষের অবশ্য তখনও লেনিনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলেন। এই অধিবেশনে অবশ্য ট্রট্স্কি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন নি। তিনি একটি 'সংশোধনী' আনলেন যে 'দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের' অধিবেশনের পর 'বিপ্লব' শুরু করা হোক। বলা বাহুল্য ট্রট্স্কির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবকে সংগঠিত করার জন্য কমরেড Voroshilov, Molotov, Kaganovich, Yaroslavsky-র মতো দক্ষ কর্মীদের পাঠালেন। উদ্দেশ্য একটিই, পেট্রোগ্রাডে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করতে দেশ জুড়ে অভ্যুত্থানের অগ্নি-বন্যা সৃষ্টি করা।

'কেন্দ্রীয়-কমিটির' নির্দেশানুসারে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের জন্য একটি 'বিপ্লবী মিলিটারি কমিটি' গঠিত হলো। এই কমিটির কর্মস্থলই হলো অভ্যুত্থান পরিচালনার সদর-দপ্তর।

অন্যদিকে শেষ-লড়াই এর জন্য প্রতি-বিপ্লবীরাও প্রস্তুত হচ্ছিলো। সৈন্য-

বাহিনীতে প্রতি-বিপ্লবী 'অফিসার্স লীগ' গড়ে উঠলো, চতুর্দিকে Shock Battalions তৈরি হলো। অক্টোবরের শেষ নাগাদ রুশিয়া জুড়ে এই রকম প্রায় ৪৩টি Shock Battalion গঠিত হয়েছিলো।

কেরেনেস্কি-সরকার পেট্রোগ্রাড থেকে মস্কোতে সরকারের 'সদর-দপ্তর' স্থানান্তরিত করার কথা বিবেচনা করেছিলো। এ থেকেই বোঝা যায় বিপ্লবের সদর-দপ্তর ও বলশেভিক পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাটি পেট্রোগ্রাডকে জার্মানদের হাতে তুলে দিয়ে কেরেনেস্কি 'বিপ্লব'কে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পেট্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে 'অস্থায়ী সরকার'কে পেট্রোগ্রাডেই অবস্থান করতে হয়।

১৬ই অক্টোবর বলশেভিক পার্টির সম্প্রসারিত (enlarged) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন থেকে বিপ্লবী-অভ্যুত্থানকে পরিচালনা করার জন্য কমরেড স্টালিনকে স্তম্ভ করে একটি 'পার্টিসেণ্টার' গঠিত হয়। এই 'পার্টি সেণ্টার'ই সেদিন ছিলো পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট-এর অধীন বিপ্লবী মিলিটারি কমিটি ও সমগ্রভাবে অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণের স্নায়ুকেন্দ্র।

এই অধিবেশনে Zinoviev ও Kamenev পুনরায় অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করলেন। সেখানে বিপর্যস্ত হয়ে তারা বাইরে এসে যে কাজটি করলেন লেনিন তাকে বলেছিলেন 'পার্টির সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা'। তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'অভ্যুত্থান' ও পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন। তাদের এই বিবৃতি থেকে শত্রুপক্ষ জেনে গেলো যে বলশেভিকরা কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই দুইজন বিশ্বাসঘাতককে পার্টি থেকে বহিষ্কারের লেনিন-প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং ঐ দুজন পার্টি থেকে বিতাড়িত হলেন।

বিশ্বাসঘাতকদের এই কাজের ফলে বিপ্লবের শত্রুরা সতর্ক হলো। অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থানের হোতা বলশেভিক-পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠলো। অস্থায়ী-সরকারের এক গোপন মিটিং-এ বলশেভিকদের দমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো।

১৯শে অক্টোবর 'অস্থায়ী-সরকার' যুদ্ধের অগ্রবর্তী 'ফ্রণ্ট' থেকে সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে পেট্রোগ্রাডে সমবেত করলো, রাস্তায়-রাস্তায় সামরিক বাহিনীর টহল জোরদার হলো। মস্কোতে অতি দ্রুত প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করতে ও প্রতিক্রিয়াশীলরা সার্থক হয়েছিলো। 'অস্থায়ী-সরকার' পরিকল্পনা করলো যে Smolny-তে বলশেভিকদের দ্বিতীয়-কংগ্রেস বসবার প্রাক্কালে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ সদর-দপ্তর আক্রমণ ও ধ্বংস করতে হবে।

২১শে অক্টোবর বলশেভিক-পার্টি সমস্ত বিপ্লবী সৈন্য-ইউনিটগুলির কাছে প্রতিনিধিদের পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এর পরের কয়েকটি দিন চরম সংগ্রামের জন্য সৈন্য ইউনিট, মিল ও কারখানাগুলিতে ব্যাপক তৎপরতা সুরু হয়ে গেলো।

যুদ্ধ জাহাজ 'Aurora' ও 'Zarya Svobody'কে বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হলো।

ইতিমধ্যে ট্রট্স্কি পেট্রোগ্রাড 'সোভিয়েট'-এর এক সভায় দর্প করতে গিয়ে বিপ্লবের তারিখটিকে জানিয়ে দিলেন। পাছে কেরেনেস্কি সরকার কোনভাবে বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেজন্য 'কেন্দ্রীয়-কমিটি' নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অভ্যুত্থানের জন্য দিনস্থির করলেন—সেই দিনটি ছিলো সোভিয়েটের 'দ্বিতীয় কংগ্রেস' বসবার পূর্বদিন।

২৪শে অক্টোবর খুব ভোরে কেরেনেস্কি বলশেভিকদের প্রধান মুখপত্র 'Robochy Put' (Workers' Path) পত্রিকা-দপ্তর অবরোধ ও দখলের জন্য সাঁজোয়া বাহিনী প্রেরণ করলেন। সৈন্যবাহিনী সাঁজোয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই পত্রিকাভবন ও ছাপাখানার নিরাপত্তা রক্ষার ভার গ্রহণ করলো। বেলা ১১টার সময় অস্থায়ী-সরকারকে 'উৎখাতের' আহ্বান জানিয়ে 'Robochy Put' পত্রিকা ছাপিয়ে বের হয়ে এলো। একই সঙ্গে 'পার্টি-সেণ্টারের' নির্দেশে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও লাল ফৌজ 'Smolny'-কে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলো।

অভ্যুত্থান শুরু হলো।

২৪শে অক্টোবরেই লেনিন 'Smolny'-তে এসে পৌছলেন এবং অভ্যুত্থান-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সেইদিনই সমস্ত রাত্রি জুড়ে সৈন্যবাহিনীর 'বিপ্লবী-ইউনিট'গুলি ও লাল ফৌজ Smolny-তে এসে পৌছতে লাগলো। বলশেভিক নেতৃবৃন্দ তাদের 'শীত-প্রাসাদ' (Winter Palace) অবরোধের নির্দেশ দিলেন—কেননা ঐ 'প্রাসাদেই' অস্থায়ী-সরকার শেষ আশ্রয় নিয়েছিলো।

২৫শে অক্টোবর, লাল ফৌজ এবং বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী পেট্রোগ্রাডের সমস্ত রেলস্টেশন, পোস্ট অফিস, বেতার, স্টেট-ব্যাঙ্ক ও মন্ত্রীদের দপ্তরগুলি নিজেদের দখলে নিয়ে এলো। 'প্রি-পার্লামেণ্ট' ভেঙে দেওয়া হলো। 'ক্রুজার' থেকে 'শীত-প্রাসাদের' উপর অভ্রান্ত লক্ষ্যে গোলা এসে পড়তে লাগলো। ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-সেনাদের ঝটিকা আক্রমণ Shock battalion-গুলিকে গুড়িয়ে দিয়ে শীত-প্রাসাদের শীর্ষে বিপ্লবের লাল পতাকা উড়িয়ে দিলো। 'অস্থায়ী-সরকারের' সবাইকে গ্রেপ্তার করা হলো।

পেট্রোগ্রাডের অভ্যুত্থান এইভাবে বিজয় অর্জন করলো।

যদিও পেট্রোগ্রাডে অস্থায়ী-সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে শাসন-ক্ষমতা বলশেভিক নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েটের হাতেই চলে এলো—কেননা ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় অখিল-রুশ সোভিয়েটের' অধিবেশনে বলশেভিক পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো এবং ঘোষণা করলো সমস্ত ক্ষমতা 'সোভিয়েটের' করতলগত হয়েছে—তথাপি রুশিয়ার সর্বত্র ক্ষমতা কিন্তু এতো

দ্রুত 'সোভিয়েট'গুলির হস্তগত হয়নি। মস্কোতে প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তির সঙ্গে বেশ কয়েকদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে তবে বলশেভিকদের জয় অর্জন করতে হয়েছে।

২

বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রুশ-বিপ্লবই হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাসে মহত্তম বিপ্লব যা সুনিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত হয়েছিলো এবং সার্থক করে তোলা হয়েছিলো।

১৬৮৮ সালের 'ইংলিশ-রিভলিউশন' যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো সেই সমস্ত রাজনীতিবিদরা কিন্তু তাদের সংগ্রামকে 'রিভলিউশন' বলে জানেননি। পরবর্তীকালে, বুদ্ধিজীবীরা ঐ সংগ্রামকে 'রিভলিউশন' বলে চিহ্নিত করেছেন (Ex-post-facto)।

'ফরাসী-বিপ্লব'-এর উদ্যোক্তরাও ঠিক 'রিভলিউশন' ঘটাতে চাননি, তাদের জাগরণকে ঠিক বৈপ্লবিক জাগরণ বলা যায় না। বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার পর স্বঘোষিত-বিপ্লবীরা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এরা সবাই ছিলেন বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী।

রুশ-বিপ্লবও ছিলো বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব, কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। রুশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা পুরাতন পন্থাকেই শুধু অনুসরণ করেননি, পরন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাঁরা শুধু একটি 'বিপ্লব' সংঘটন করেছেন এমন না বলে, বলা উচিত, তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছিলেন। এমন সচেতন ও সুপরিকল্পিত 'বিপ্লব' পূর্বে কখনও হয়নি। তাই আধুনিক-সভ্যতার ইতিহাসে রুশ-বিপ্লব একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

রুশ-বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-কর্মীরা একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর (পশ্চিমী) অগ্রগতি রুশিয়াতে একেবারেই হয়নি। ফলে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো এমন একটি কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা যায়

ফলে পশ্চিমের অগ্রগতির ফলকে শুধু আত্মস্থ করা নয় তাকে উৎরেও যাওয়া যায়। এ ব্যাপারে খুব সহায়ক হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর রুশ-সাহিত্য।[১] এই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শুধু 'জারতন্ত্রের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নয়, পরন্তু পশ্চিমী বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি ও বুর্জোয়া ধনবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিলো। রুশ-বিপ্লব, ফরাসি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের শিক্ষার দ্বারা শক্তি অর্জন করেছিলো এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশগুলি যে বস্তুগত (Material) উন্নতিতে পৌঁছেছিল তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো।

তাই, ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া-রিভলিউশনের পরিসমাপ্তি ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটেছিলো। ১৯২০ সাল নাগাদ দ্রুত 'শিল্পায়ন'-এর মধ্য দিয়ে রুশিয়া (U.S.S.R.) শিল্পোন্নত-দেশে পরিণত হবার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলো। শুধু শিল্পোন্নত নয়, সামরিক শক্তির দিক থেকেও উন্নত হওয়া তার লক্ষ্য ছিলো। ফলে, বিস্ময়কর হলেও, শিল্প ও সামরিক দিক থেকে অসীম শক্তিমান আমেরিকা থেকে ঢালাও সাহায্য ও পরামর্শ নিতে রুশিয়া কুণ্ঠিত বোধ করেনি। এই সার্থক পরিকল্পনার ফলে ৩০ বছরের মধ্যে অর্ধ-শিক্ষিত, সেকেলে কৃষক-অধ্যুষিত-রুশিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে রুশিয়া অগ্রণী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এটাই বোধ হয় রুশ-বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব।

৫০ বছরের সময় সীমার মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক-রূপান্তর সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছিলো। এর মধ্যে রুশিয়ার জনসংখ্যার ৮০% ভাগ চাষী-প্রধান-সমাজ সংখ্যালঘু হয়ে ৪০% ভাগে পরিণত হয়েছিলো। নাগরিক জনসংখ্যা ২০% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৬০% ভাগে। ব্যাপক ও উন্নত সাধারণ শিক্ষা ৫০ বছরের মধ্যে রুশিয়া থেকে নিরক্ষরতাকে প্রায় হটিয়ে দিয়েছিলো। নানা ধরণের সমাজ-সেবা-মূলক সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো। কাঠের লাঙলের বদলে ট্রাক্টর নিয়োগ করে কৃষি-উৎপাদনে বিস্ময়কর ফল লাভ হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এই দ্রুত সামাজিক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে রুশিয়ার জনগণের এক বৃহৎ অংশকে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিলো। এর জন্য রুশ-বিপ্লবকে দোষ দেওয়া এক প্রচণ্ড ভ্রান্তি। এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক 'ট্রাজেডি' (Historical Tragedy)।

পরিকল্পিত রুশ-বিপ্লব ও তার অবিশ্রান্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর যদিও রুশ জনগণের অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো তথাপি এর শুভ প্রভাব জগৎকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে যে শিল্পে-অনুন্নত দেশগুলিও বিপ্লব-সাধন করতে পারে। ফলে রুশ-বিপ্লবের সার্থকতা শিল্পে-অনুন্নত দেশগুলিতে প্রচণ্ড উদ্দীপনা-সৃষ্টির চিরকালের কারণ হয়ে থাকলো।

রুশ-বিপ্লবের পরে রুশিয়ার দ্রুত শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি-বিস্তারে অগ্রগতি শুধু বিশ্বকে বিস্মিত করেনি, ইতিহাসের আরেকটি জটিলতর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিপ্লব করার চেয়ে বিপ্লবের ফলকে রক্ষা করা আরো কঠিন এবং সেই লড়াইয়ে জয়ী হবার জন্যই বিপ্লবের পরে পরেই রুশিয়ার নবগঠিত 'সরকার' দ্রুত নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলো অসামরিক ও সামরিক এই উভয়দিক থেকেই। লেনিন ও তাঁর অনুগামীরা বুঝতে কোন ভুল করেননি যে বিশ্বের প্রথম এই নবজাত সমাজতান্ত্রিক-সরকারকে নির্মূল করতে দুনিয়ার সমস্ত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি একদিন হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপ্লবের দিন থেকেই গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এই লড়াই শুরু হয়েছিলো এবং শেষ হয়েছিলো দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির চরম পরাজয়ে।

এই ঘটনাবলী আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে রুশ-বিপ্লব শুধু ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অনিবার্য ছিলো না, একে সুপরিকল্পিতভাবে রূপদান করা হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, এই বিপ্লবী 'নবজাতক'কে সম্ভাব্য সমস্ত রকম আক্রমণের হাত থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করার জন্য রুশিয়ার বিপ্লবী-সরকারকে নানা 'রক্ষা-কবচ' তৈরি করতে হয়েছিলো।

তাই 'অক্টোবর-মহাবিপ্লব' বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ ও বহু অনুন্নত স্বাধীন ও পরাধীন দেশের কাছে দারুণ উদ্দীপক ও প্রভাব-বিস্তারী হলেও তার দায় সম্বন্ধে সতর্ক হতেও নির্দেশ করে।

বিশ্বের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব-নির্ণয়ের আগে রুশ-বিপ্লব যে কতকগুলি মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলো তার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হওয়া দরকার না হলে তার প্রভাব-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে পরবর্তী কালে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে।

১) রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যদি আমাদের বিচার্য হয় তাহলে বলা উচিত উৎপাদন, শিল্পায়ন ও নানা পরিকল্পনা রচনার মধ্যেই সেই বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল।

২) ১৯১৭ সালের মহা-বিপ্লব পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলো 'সামাজিক ন্যায়ের' (Social Justice) এবং এই 'ন্যায়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো রাজনৈতিক তৎপরতার দ্বারা সংগঠিত, অর্থনৈতিক-নিয়ন্ত্রণের নানা বিধিব্যবস্থার ফলে।

৩) 'কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো'তে শ্রমিক-শ্রেণীর উপরে 'Naked, shameless, direct, brutal' শোষণের জন্য বুর্জোয়া-শ্রেণীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। মনে রাখতে হবে, 'মার্কসবাদ' শোষণের জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দায়ি করেনি, দায়ি করেছে ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থাকে। বলা হয়েছে, সেই কাঠামোকে বদলে না দিলে এই শোষণেরও অবসান ঘটানো অসম্ভব।

৪) লেনিনের মতে ১৯১৭-র অক্টোবর-বিপ্লব ছিলো শুধু 'রাজনৈতিক-

বিপ্লব', কেননা ১৯১৭ সালে রুশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটেই বিপ্লবের অনুকূল ছিলো না। লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন 'সমাজতন্ত্রের' দুইটি অংশ আছে—একটি তার রাজনৈতিক অর্ধভাগ ও অপরার্ধ হচ্ছে—পরিকল্পিত অর্থনীতি। রুশ-বিপ্লবের দ্বারা রুশিয়াতে 'সমাজতন্ত্রের' অর্ধভাগ লাভ হয়েছিলো। সমাজতন্ত্রের অপরার্ধটি লাভ করেছিলো জার্মানী। 'সমাজতান্ত্রিক-অর্থনীতি' গড়ে তুলতে অবশ্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ও সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার। পূর্বে ধারণা ছিলো, 'বিপ্লব'জয়ী হলেই কোনো দেশের অর্থনীতি নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নেয়। রুশ-বিপ্লবের পর এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিলো। তাই রুশিয়ায় নবজাত 'বিপ্লবী-সরকারকে' ১৯২১ সালে 'নতুন অর্থনৈতিক নীতি' [New Economic Policy সংক্ষেপে N.E.P.] গ্রহণ করতে হয়েছিলো।

৫) ১৯১৭ সালের 'অক্টোবর-বিপ্লব' যে নতুন 'সরকারের' জন্ম দিলো সেই সরকার ছিলো মার্কসবাদী এবং 'ধনবাদ' বা 'ক্যাপিটালিজম'কে সমূলে উৎপাটন করতে অঙ্গীকার-বদ্ধ। এই নতুন চরিত্রের 'সরকারের' প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে প্রথম ও অভিনব এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

৬) মনে রাখতে হবে, রুশিয়ার বিপ্লব-সংগঠন ও সেই বিপ্লবকে রক্ষা করার কাজ কোনো 'শ্রেণীর' দ্বারা হয়নি, হয়েছিলো একটি 'পার্টির' দ্বারা যারা নিজেদের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি ও অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেছিলো। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বলা হয়েছে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিকে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 'সমাজতন্ত্র' ধনতন্ত্র থেকে অনেক বেশি অভ্রান্ত—কেননা 'সমাজতন্ত্র' সামাজিক 'সচেতনতার' (Consciousness) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কস বিশ্বাস করতেন, বিপ্লব-সংঘটনের দ্বারাই মানুষ ও মানব-গোষ্ঠীকে 'কমিউনিস্ট সচেতনতায়, উত্তরিত করে দেওয়া যায়। মার্কস বিশ্বাস করতেন, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা থেকে 'নতুন-মানুষ' স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জন্ম নেবে। কিন্তু লেনিন মনে করতেন সর্বোচ্চ সচেতনতায়-উদ্বুদ্ধ একটি সেরা (Elite) পার্টিই পারে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক সচেতনতাকে সঞ্চার করে দিতে। লেনিনের বিশ্বাস ছিলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, নতুন সমাজের জন্য নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টি করে নিতে হবে।

৭) রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর দিকে দিকে পিছিয়ে পড়া জনগণের মুক্তি-সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। মজার বিষয় এই যে, যদিও মার্কসবাদ বিশ্বের যে কোনো দেশের 'মুক্তির' (liberation) ব্যাপারটিকে মানুষেরই 'মুক্তি' বলে গ্রাহ্য করেছিলো তথাপি মার্কস ও তাঁর কিছু অনুগামী সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে অনগ্রসর এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের 'জাতিত্ব' এবং 'মুক্তি'র (liberation) অধিকারের ব্যাপারটিকে প্রায় ভাবেন নি বললেই

চলে। ব্যতিক্রম কেবল ভারত ও চীন। এই দুইটি 'দেশ' সম্বন্ধে তাঁদের কিছু ভাবনা চিন্তা অবশ্য ছিলো। Nationalism (স্বাদেশিকতা) ব্যাপারটিকে ইউরোপেরই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু (Phenomenon) বলে ধরে নিয়ে, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা ইউরোপই উপর্যুপরি বুর্জোয়া ও সর্বহারা বিপ্লব-সাধনের উপযুক্ত ভূমি বলে ধরে নিয়েছিলেন। লেনিনও বলেছিলেন যে, সর্বহারারাই সেই শ্রেণী যাদের কোনো অর্জিত অধিকার নেই, তারাই মানুষের মুক্তির সংগ্রামে যথার্থ অগ্রদূত।

৮) মার্কসীয়-তাত্ত্বিকদের এই ধারণা অবশ্য ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলো। ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিভিন্ন মহাদেশে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে তাদের প্রতিপত্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে খুব বেড়ে উঠেছিলো। এই তৎপরতার বর্গনাম (Generic) হলো 'সাম্রাজ্য-বাদ' (Imperialism)। এই শতাব্দীতে ধনবাদী-অর্থনীতির দৌলতে পশ্চিম-ইউরোপ প্রাচুর্যের আস্বাদ লাভ করেছিলো। অল্পসময়ের মধ্যে 'সাম্রাজ্যবাদ' ধনতন্ত্রের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো। লেনিন ও রোজা লুক্সেমবার্গ এই ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রের শেষ ঝলকানিই হচ্ছে তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদ'। সুতরাং এই 'সাম্রাজ্যবাদ'কে কোনো-ভাবে দুবল ও ধ্বংস করতে পারলে ধনতন্ত্রের পতনও দ্রুত ঘনিয়ে আসবে। সমস্ত সোসালিস্টদের আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা ছিলো এই যে, সাম্রাজ্যবাদী-নীতি অনতিবিলম্বেই বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে তুলবে এবং সেই যুদ্ধ ধনতন্ত্রের কবর রচনা করবে। এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে ধনতন্ত্রের পতনের কাজে ব্যবহার করার জন্য লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ ও অন্যান্য বলশেভিকরা প্রস্তুত হতে শুরু করেছিলেন।

আবার এই ঘটনার একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হচ্ছিলো। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে 'ধনতন্ত্র'র সমৃদ্ধি এমন বৃদ্ধি পেয়েছিলো যা আরেকটি প্রবণতার (by-product) জন্ম দিয়েছিলো। তার নাম 'শোধনবাদ' (Revisionism)। জার্মানীর স্যোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টিসহ পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য স্যোসালিস্ট ও লেবার পার্টিগুলিও এই 'শোধনবাদের' প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে-ছিলো। সেখানে নানা সুযোগসুবিধা লাভ করে শ্রমজীবী মানুষদের ক্ষোভও স্তিমিত হয়ে পড়ছিলো। বিপ্লব ছাড়াই নিজেদের মান ও মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছিলো যে 'সরকারের' উপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে কিম্বা সমঝোতার মাধ্যমে সুযোগসুবিধা লাভ করা যখন সম্ভব তখন 'বিপ্লব' করা অর্থহীন। পরন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে সরকারের উপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করে 'সরকারে' অধিষ্ঠিত হওয়া যে অসম্ভব নয় এমন বিশ্বাসও দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। ১৯০০ সালে ফরাসী বুর্জোয়া 'সরকারে' কিছু স্যোসালিস্টের অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে স্যোসালিস্ট-নিয়ন্ত্রিত

ফরাসী-সরকারের প্রতিষ্ঠার পথকেই সুগম করেছিলো। প্রায় একই সময়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে শ্রমিক-দলের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের ফলে ধনবাদী রাষ্ট্রে কোনো রকমের সংস্কার-চেষ্টা যে অলীক স্বপ্ন মাত্র এ ধারণার অবসান হয়ে এ বিশ্বাস চাড়া দিয়ে উঠলো যে শান্তিপূর্ণ উপায়েও 'বিপ্লব' করা সম্ভব। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে উৎখাত করার মার্কসীয় পরিকল্পনা এই নতুন শোধনবাদী বিশ্বাসের ফলে অতলে তলিয়ে গেলো।

কিন্তু পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই প্রবণতা অনুপস্থিত থাকায় লেনিন তাঁর পুরনো বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন যে ইউরোপে 'শোধনবাদ' সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। ১৯১৪ সালে ইউরোপের বিভিন্ন সরকার-সমূহকে শ্রমিক দলগুলির সহযোগিতা আশাহত লেনিনকে এক নতুন আন্তর্জাতিক-আন্দোলন আরম্ভ করতে প্ররোচিত করেছিলো। ১৯১৫ সালে Zimmerwald-সম্মেলনে এর সূচনা হয়। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের অসামান্য সাফল্য এই আন্দোলনের জন্য একটি শক্ত জাতীয়-ভিত্তি লাভ করেছিলো। তৃতীয় অথবা প্রথম 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গঠনের দ্বারা ধনতন্ত্রকে উৎখাত করার এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিলো।

যদি রুশ-বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিম-ইউরোপে অনেকগুলি বিপ্লব ঘটে যেত তাহলে বলশেভিকদের প্রথম 'কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিকের' মনোগত অভিপ্রায় চরিতার্থ হতো। কিন্তু দেখা গেলো যে বিপ্লব-এর বীজ ইউরোপের মাটিতে অঙ্কুরিত হল না, পরন্তু এশিয়ার উর্বর-ক্ষেত্রে তা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠলো।

৯) ১৯০৫ সালের রুশিয়ার বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার ধাক্কা তুর্কী, পারস্য ও চীনদেশের বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিলো। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব-এর জন্য মধ্য-এশিয়া, পারস্য, তুর্কী ও মিশর সহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট-ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রুশিয়ার একান্ত সহচর হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের জাতীয়তাবাদী-আন্দোলন স্বভাবতই রুশিয়ার মুখাপেক্ষী হলো। বিপ্লবোত্তর-রুশিয়া চীনের উপর অতিরাষ্ট্রিক (extra-territorial) অধিকারসমূহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করায় চীনের কাছে 'রুশিয়া', মর্যাদা ও সহানুভূতি লাভ করলো।

১০) যে কারণে ১৭৮৯ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব ফ্রান্সে সংঘটিত হলেও তার প্রভাব ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যায়নি তেমনি ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবও 'পশ্চিমে' বিস্তৃত না হয়ে অনগ্রসর পূর্বমুখী এশিয়া মহাদেশের দিকে দিকে নিজের প্রভাবকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলো। লেনিন তাঁর জীবনের শেষতম এক প্রবন্ধে[২] নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই বলে যে ইউরোপে 'বিপ্লব' ঘটাতে রুশ-বিপ্লব ব্যর্থ হলেও প্রাচ্য দেশগুলি বৈপ্লবিক-আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়েছে। তিনি জানতেন

রুশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষেই বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস।

১১) এই বিপ্লবের প্রভাবে পশ্চিম-ইউরোপে বিপ্লব সংগঠিত না হলেও তখনকার পরাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তি-সংগ্রামে ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব সঞ্চার করেছিলো। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব পৃথিবীর ভার-সাম্যকে বদলে দিয়েছিলো। ১৯১৭ সালের পরে পৃথিবী স্পষ্টতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য অগ্রসর ইংরেজি-ভাষীদের, অপরদিকে পৃথিবীর বাকী সংঘবদ্ধ দেশগুলি। এ ভারতীয় পুরা-ণের সেই সমুদ্রমন্থন-জাত লক্ষ্মীর আবির্ভাবের মত ঘটনা। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলি রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার ও শোষণ দিয়ে তৈরি মিনারগুলি একের পর এক গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো,—যারা নীচুতলার মানুষ তারা উঠে এসেছিলো উপরে, আর যারা উঁচু তলার শোষক শ্রেণীর মানুষ তারা নির্মূল হয়ে গিয়েছিলো বিপ্লব-এর রথচক্রের নীচে। পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এমন এক 'সরকার', যার কথা পৃথিবী পূর্বে কখনো শোনে-নি—'সর্বহারাদের সরকার'। বিপ্লব-লক্ষ্মী জগৎকে উপহার দিয়েছিল শোষণমুক্ত এক মানব সমাজের।[৩] পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত, শোষিত, পরাধীন জাতি ও মানুষের কাছে তাই 'অক্টোবর বিপ্লব'-এর গুরুত্ব ছিলো অসামান্য।

১২) অক্টোবর মহাবিপ্লব আরেকটি কারণে ছিলো পৃথিবীর শোষিত নিপীড়িত ও মুক্তি সংগ্রামীদের কাছে বরণীয়। ১৯১৭ সালে যে 'বিপ্লব'-শিশু রুশিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় যে দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা ও ঐক্যের মহান্ নিদর্শন রুশীয় কমিউনিস্ট-পার্টি, তার নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী জনগণ রেখে-ছিলেন তা আজ 'ইতিহাসে' পরিণত হয়েছে। দেখতে দেখতে তাঁরা সমগ্র দিক থেকে অনগ্রসর তাঁদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক-দেশকে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শুধু স্বনির্ভর করা নয় এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে দিয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, রুশিয়ায় বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ-সম্পদ-থাকার দরুণ ও পরিকল্পিত-ভাবে তাকে ব্যবহারের নিপুণতা এতো দ্রুত সোভিয়েট রুশিয়াকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। সমাজতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'সোভিয়েট সরকার' বিপ্লবোত্তর দিনগুলিতে উন্নত পশ্চিম-দুনিয়া ও বিশেষ করে আমেরিকার কাছ থেকে ব্যাপক 'অর্থনৈতিক সাহায্য' নিতে কুণ্ঠা করে নি। ফলে, অল্পসময়ের মধ্যে সোভিয়েট-রুশিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অমিত শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে।

১৩) তাই বিপ্লব-এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতার হস্তান্তর শুধু নয়, সমস্ত আঘাত ও অপঘাত থেকে বিপ্লবকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় সে শিক্ষাও পৃথিবী লাভ করছে আজও। রুশ-বিপ্লবই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

এশিয়া ও আফ্রিকার বৈপ্লবিক সংগ্রামকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লব যে মহা-বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটিয়ে জগৎকে সচকিত করেছিলো তার তাৎপর্য বুঝতে আজ কারো অসুবিধা হয় না; কিন্তু ১৯১৭ সালের আগে-পিছের বেশ কয়েক বছর ঐ বিপ্লবকে নিয়ে মানুষের মনে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিলো। এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিলো। হঠাৎ-আলোর ঝলকানি অনভ্যস্ত চোখে এসে পড়লে সে হতচকিত হয়ে পড়ে, অনেক স্পষ্ট জিনিষও তার কাছে অস্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব যদিও ২৫শে অক্টোবর অস্থায়ী-সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো তথাপি রুশিয়ার প্রায় সর্বত্র সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ একদিনেই বিস্তৃত হয়নি। রুশিয়ার মতো অতবড় দেশে তা সম্ভবও ছিলো না। তদুপরি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবের পরেও নানা জায়গায় আক্রমণ, ছোটখাটো সংগ্রাম ও নানা অপপ্রচারে 'বিপ্লবের' ফলকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিলো।

সবোপরি ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সফলতার কথা জানলে বিশ্বের শোষিত মানুষদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সাম্রাজ্যবাদীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে একথা বুঝতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বুদ্ধির অভাব হয়নি—তাই তারা যতদিন পেরেছে, নানা কৌশলে, রুশ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা গোপন করার চেষ্টা করেছে। ফলে, বিশ্বের বহু দেশের মানুষ রুশ-বিপ্লবের সঠিক চিত্রটি বেশ কয়েক বছর ঠিকঠাকভাবে পায়নি।

খোদ রুশ-দেশের অনেক বলশেভিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এমন কি লেনিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনেরাও বিপ্লব-এর পরেও দীর্ঘকাল এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। সেই না বোঝাটা তাঁরা মনে পুষে রাখেননি, পরন্তু তাঁদের নানা অহংকৃত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করে লোককে আরো বিভ্রান্ত করেছেন। আমরা কিছু কিছু উদাহরণ দেবো—

(১) অক্টোবর-বিপ্লবের দু সপ্তাহ পরেও লেনিনের সুহৃদ ম্যাক্সিম গর্কী তাঁর পত্রিকা "Novaya Zhin"-এ লিখেছেন "Blind fanatics and unscrupulous adventures are rushing head-long forward! 'Social Revolution'—as a matter of fact it is the road to anarchy, the ruin of the proletariat and the Revolution. The working class cannot fail to realise that Lenin is experimenting with its blood, and trying to strain the revolutionary mood of the proletariat to the limit, to see what the out come will be. The working class must not allow adventurers and mad men to thrust upon the proletariat the

responsibility for the disgraceful, senseless, and bloody crimes for which not Lenin, but the proletariat will have to account."[৪]

বলশেভিক-পার্টির আরেক প্রবীণ ও প্রধান সদস্য Leonid Krassin সুইডেন-প্রবাসী তাঁর পত্নিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"The Bolsheviks, after smashing Kerenesky and occupying Moscow, have failed to reach an agreement with other parties, and they go on issuing new decrees on their own responsibility daily. All work is coming to an end. It means the ruin of production and transport ; meanwhile the armies at the front are dying of hunger. All the leading Bolsheviks, Kamenev, Zinoviev, Rykov, etcetera, have come around, excepting Lenin and Trotsky, who remain as uncompromising as ever and cannot be persuaded to alter their attitude. I am afraid the outlook is black indeed ; paralysis of the whole life of Petrograd, anarchy, and probably pogroms."[৫]

Vorovsky ছিলেন এমনি একজন বিশ্বস্ত বলশেভিক যিনি পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয় কূটনীতিবিদ্ হয়েছিলেন, কিন্তু, বিপ্লবোত্তর দিনগুলিতে তিনিও পার্টির কাজকর্মে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। লেনিনের আরেকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধব Solomon, Vorovsky-র সেই সময়কার 'প্রতিক্রিয়ার' কথা বিবৃত করতে গিয়ে লিখছেন "· Vorovsky, according to his own statement, did not believe in the permanence of the Bolsheviks Government, nor in the ability of the Bolsheviks to do anything sensible, and regarded the whole matter as an absurd adventure, a "hard nut" on which the Bolsheviks would break their teeth !"[৬]

স্বয়ং Solomon-ও এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ছিলেন না। লেনিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় তিনি লেনিনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন—"Tell me Vladimir Ilich, as an old comrade of yours, what is going on here ? What is this ? Is this really a gamble on Socialism on the island of Utopia, only on a more extensive scale ? I can not understand it···"[৭]

লেনিন তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে হাসিমুখে আর যে

কথাটি বলেছিলেন তা শুনে নিশ্চয়ই দ্বিধাগ্রস্ত Solomon আরো দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন এমন অনুমান করে নেওয়া যায়। লেনিন তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন "…I see you are shrugging your shoulders. Well, you have another surprise coming… It is not a question of Russia at all, gentlemen. I spit on Russia…this is merely one phase through which we must pass on the way to a world revolution…"[৮]

যা ছিলো লেনিন, স্টালিন বা ট্রট্স্কির কাছে পরিষ্কার তা অনেক প্রথম সারির বলশেভিক নেতার কাছে ছিলো হেঁয়ালি ও দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষের কথা আর নাই বা তুললাম; তারা শুধু বলশেভিক-পার্টির নেতৃত্বে অচল বিশ্বাসী ছিলেন। লেনিন, স্টালিন, ট্রট্স্কি তাদের শোষণমুক্ত করেছেন এবং তাঁরা এমন কিছু করবেন না যাতে রুশিয়ার শতাব্দী-ব্যাপী অন্ধকার দিনগুলি আবার ফিরে আসে।

বিপ্লব আর তার পরবর্তী বেশ কিছুকাল রুশিয়ার ঘটনাবহুল, টালমাটাল দিনগুলিতে কিছু কিছু বলশেভিক নেতা ও মিত্রদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলো সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ। বিশ্বজোড়া নানা প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে তারা জগৎকে বেশ কিছুদিন বিভ্রান্ত করতে পেরেছিলো। অবিশ্রাম মিথ্যা ও কল্পিত খবর ছেপে তারা রুশ-বিপ্লবের ঠিক চিত্রটিকে বারবার আড়াল করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলো।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তি রুশ-বিপ্লবের সার্থকতায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯১৭ সালের ভারতবর্ষ ছিলো রাজনৈতিক দিক থেকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। বঙ্গভঙ্গরদ-আন্দোলনের সার্থকতায় তখন অবিভক্ত বাঙলাদেশ উত্তাল, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে বিক্ষোভ তখন তুঙ্গে, কংগ্রেস দল নেমে পড়েছে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে। সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বাঙলায়, পাঞ্জাবে ও অন্যত্র। ভারতীয় বিপ্লবীরা পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন দানা বেঁধেছে চারদিকে। সুতরাং শাসক ইংরেজের শঙ্কিত হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিলো। রুশদেশে সর্বহারা-বিপ্লব সার্থক হয়েছে, লেনিন 'বিশ্ববিপ্লবের' ডাক দিয়েছেন—এ সংবাদের সাংঘাতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ রাজশক্তি সর্বশক্তি নিয়ে প্রচারে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এই প্রচার ছিলো মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করবার অপচেষ্টা। অবিভক্ত বাঙলা দেশে সমস্ত ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র মিথ্যা অপপ্রচারে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এই অপপ্রচারের জাল ভেদ করে সত্য অনুসন্ধান তখন বড় কঠিন ছিলো। ১৯৩০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'রুশিয়ার চিঠি'র তৃতীয়পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মস্কো' থেকে যখন নিমন্ত্রণ-এলো তখনো বলশেভিকদের

সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো-উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিলো।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ১৯৩০ সালে যখন একথা বলতে শুনি তখন বুঝতে অসুবিধা থাকে না, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা কত অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত ছিলো। এটা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির সত্য-সংবাদ গোপন করার অসাধারণ প্রশাসনিক-দক্ষতার প্রমাণ। সেই অপপ্রচারের কিছু কিছু নমুনা আমরা দেবো।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর (পুরনো রুশ-ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২৫শে অক্টোবর) তারিখে বলশেভিকরা যখন 'পেট্রো'গ্রাড' দখল করে নিয়েছে, মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্য (কেরেনেস্কি বাদে) গ্রেপ্তার হয়েছেন—৮ই নভেম্বর তারিখে নতুন 'সোভিয়েট সরকার' শান্তি ও জমির ব্যাপারে 'ডিক্রি' জারি করে দিয়েছেন—তারপরেও ৯ই নভেম্বরের কলকাতাস্থ 'The Statesman' পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে এ খবর ছাপা হচ্ছে—

"Russian Chaos
New Revolt in Petrograd
Workmen Armed
Dramatic speech by Kerenesky

At the Preliminary Parliament M. Kerenesky said that Maximalist attempt to seize power wou'd be suppressed immediately."

একই পত্রিকা আবার ১০ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডন থেকে প্রেরিত 'রয়টার-এর প্রেরিত ৮ই নভেম্বরের সংবাদ ছাপিয়ে লিখছে—

"Reuter has received telegrams from the official Petrograd Agency, which is now in the hands of the Maximalists, stating that the Maximalists hold the city and have arrested the ministers…"

১৪ই নভেম্বর একই পত্রিকা Bold Type-এ সংবাদ পরিবেশন করছে

"KERENESKY FORCES
BIG ARMY NEARING PETROGRAD
TSARKOE SELO OCCUPIED
FUSILLADES IN THE CAPITAL
EXPECTED FALL OF MAXIMALIST

The latest telegram from Russia indicates that **the** Maximalists Peace Government is by no means **securely**

established. Kerenesky is reported to be nearing Petrograd with an army of 200,000 men and it is stated that the Cossacks have sided with the Provisional Government against the Maximalists. Troops loyal to Kerenesky have seized Tsarakoe Selo and the chief radio station.

Fighting has taken place in Petrograd itself and the late telegram seem to indicate that the Government of Lenin the German Agent, may fall at any moment."

এই সমস্ত খবর যে সর্বাংশে অসত্য ছিলো এমন নয় ; কিন্তু পরিবেশনার চাতুর্যে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইতো তা হচ্ছে রুশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে যা হচ্ছে তা রুশদেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। অত্যন্ত সুকৌশলে লেনিনকে 'German Agent' ও তাঁর বলশেভিক দলকে 'Maximalist' বলে বিশ্বের কাছে তাঁর ও তাঁর দলের ভাবমূর্তিকে হেয় করবার চেষ্টা চলেছিলো।

১৫ই নভেম্বর 'The Statesman' কাগজ ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম দুই কলম জুড়ে Heac Linc-দিয়ে সংবাদ দিচ্ছে—

KERENESKY VICTORY
BLOODY FIGHT FOR PETROGRAD
COMPLETE DEFEAT OF MAXIMALISTS REPORTED
LENIN SAID TO BE CAPTIVE
TERRIBLE SCENES IN CAPITAL

লাল ফৌজ (Red Army) সম্বন্ধে অকথ্য-কেচ্ছা সংবাদ হয়ে বেরিয়েছে— ১৫ই নভেম্বর তারিখে The Statesman কাগজে 'রয়টার'-প্রেরিত সংবাদ বলছে—"A correspondent inspected the 'Winter Palace', which have been sacked. The Bolshevicks arrested hundreds of women soldiers preparing to defend the Palace and handed them over to licentious and drunken soldiers. They then pillaged the Palace and created indescribable confusion, slashed pictures, shattered valuable china and ripped up upholstery".

'Winter Palace' দখলের পর কিছু উত্তেজিত 'রেডগার্ড' ও 'সৈন্য' লুটপাটের দিকে অবশ্যই গিয়েছিলো এবং সেই অবস্থায় সাধারণ সৈনিক ও রেড-গার্ডদের সেই আচরণ অস্বাভাবিক বলেও বিবেচনা করা চলে না। যুগ-যুগান্তের ক্রোধ ও ঘৃণা তাদের ধ্বংস ও লুটের কাজে উদ্দীপ্ত করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। এ প্রসঙ্গে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকান সাংবাদিক John Read-তাঁর জগৎ বিখ্যাত 'Ten Days that Shook the World' গ্রন্থে বলছেন "The looting was just beginning when somebody cried, 'Comrades ! Don't take anything. This is the property of the People'. Immediately twenty voices were crying, 'stop ! Put everything back ! Don't take anything ! Property of the People !' Many hands dragged the spoilers down. Damask and tapestry were snatched from the arms of those who had them. ·· Roughly and hastily the things were crammed back in their cases, and self-appointed sentinels stood guard. ·· 'Come, comrades, Let's show that we're not thieves and bandits'·· The paintings, statues, tapestries and rugs of the great state appartments were unharmed·· " (page 108, 109, 110)

প্রাসাদের Women soldiers-দের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তাঁর বর্ণনাও John Read দিয়েছেন। একজন মিলিটারী রিভলিউশনারী 'কমিশনার'কে ঐ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সহাস্যে জানান—

"Oh-the women !···they were all huddled up in a back room. We had a terrible time deciding what to do with them·· So finally we marched them up to the Finland Station and put them on a train to Levashovo, where they have a camp···" (Page 112)

The Statesman পত্রিকা ৮ঠা ডিসেম্বর, ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ঘোষণা পত্রিকায় ছাপিয়ে লিখছে— "Traitor Government Not recognised". এই ব্যাপক অপপ্রচারে সুর মিলিয়েছিলো কলকাতার আরেকটি ইংরেজি দৈনিক 'The Englighman'। ১২ই নভেম্বর তারিখে ঐ পত্রিকা—"The Lenin Coup D' Etat" নামক সম্পাদকীয়তে লিখছে—

"···It is surely an irony without parallel that whilst the troubles have thrust aside the two strongest and most patriotic figures of Revolution, they should also forced into prominence, if not also into power, the sinister and treacherous figure of Lenin, the leader of the Maximalists. No man deserves more to rank with Rasputin in infany then Lenin···Let us hope···that Russia will at least be spa-

red the ghastly humiliation of a Lenin regime—a regime a thousand fold worse and more treacherous than the Romanoffs.···We shall hear better news from the ancient Capital···There are still a number of strong men and burning patriots in the Russian army. They are not likely to leave things where they are and tolerate a traitorous Lenin Government···It may mean another revolution, but it is impossible to believe that the reign of Lenin administration will be more than a passing phase in the Russian tragedy".

কলকাতার জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব-সংক্রান্ত খবরাখবর যা 'রয়টার' মারফৎ পেত বিনা মন্তব্যে তাই ছাপিয়ে দিতো। ১৯১৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ঐ পত্রিকায় 'রয়টার' প্রেরিত একটি খবর মুদ্রিত হয়। মিথ্যা অপপ্রচার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এই খবরটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

MAXIMALIST LEADERS

London, Nov. 29

"It has been previously stated that the real names of Lenin and Trotsky respectively are Coderblum and Braunstein. Reuter's Petrograd correspondent now states that according to Maximalists press the real name of Krylenko is Aaron Abram···all these name are Non-Russian."

এই সমস্ত অপপ্রচারে যে কেবল ভারতবর্ষ বা অবিভক্ত বাঙলাদেশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এমন নয়, আমেরিকার মত সুদূর মহাদেশেও নতুন সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী তৈরি হয়েছিলো। আমেরিকার বিখ্যাত নিগ্রো-কবি Langston Hughes, যাঁকে 'Poet laureate of the Negro race' বলা হয়, যাঁকে ১৯৩২ সালে 'ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট' নামে একটি ফিল্ম তৈরিতে সাহায্য করার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তিনি রুশিয়ায় গিয়েছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে 'Moscow and Me' নামে 'International Literature' নামক পত্রিকার জুলাই-সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি রুশিয়া-যাত্রার পূর্বে বন্ধুদের কাছ থেকে যে সতর্কবাণী শুনেছিলেন, উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, তার উল্লেখ তিনি করেছিলেন। সেই সতর্কবাণীটি ছিল এইরকম

"If you can't carry from New York, then buy in Berlin. Everything: canned goods, sugar, soap, toilet paper, pencils,

ink, winter clothes, can openers, tooth brushes, shoe strings, and so on, and so on. Otherwise you will go hungry, dirty and ragged in Moscow.

"You will be guided, guarded and watched all the time in Moscow-the G.P.U"…"The peasants and poor folks have control and they're the stupidest people on earth. You will be sadly disappointed in Moscow.

"They only want to make communists out of you-all, you and the rest of the Negroes going in that group—and get you slaughtered when you come back home—if the American Government lets you come back".[১০]

Langston Hughes-এর এই বিবরণ থেকে বোঝা কঠিন নয় যে রুশিয়ায় নবজাতক সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক-সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতকে বিকৃত ও অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে কিভাবে তাদের মনকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিলো। ১৯৩৩ সালেও রুশিয়াতে যেতে হলে একজন বিদেশীকে জুতোর ফিতে, টুথব্রাস, কালি, পেন্সিল এমনকি টয়লেট পেপারও সঙ্গে নিতে হবে, তার মানে, বিপ্লবোত্তর-রাশিয়া দেশকে কতখানি নিঃস্ব, রিক্ত করেছে তা প্রমাণ করা। তাছাড়া সেখানে গেলে একজন বিদেশীকে অবিরাম গুপ্তচরদের নজরে থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় বিপদ সেখানে মানুষকে ধরে ধরে 'কমিউনিস্ট' বানানোর পদ্ধতি। এই ধরণের অপপ্রচারে 'সোভিয়েট রুশিয়া' সম্বন্ধে শুধু আমেরিকা মহাদেশে নয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র মানুষের মনে একটি প্রবল ভীতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিলো।

যাই হোক তবু অক্টোবর-মহাবিপ্লবের ঢেউ ইয়োরোপে বিশেষ করে জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে ভেঙ্গে পড়লো। বিপ্লবের পরিবেশও দুইটি দেশে তৈরিই ছিলো। এই দুইটি দেশের মানুষ সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের কবলে পড়ে ক্ষুধা ও হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী-সরকারের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছিলো। তারা দেখেছিলো কিভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণ তাদের স্বৈরাচারী সরকারকে সমূলে উৎখাত করে, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছে। Brest-Litovsk-চুক্তির পর জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধরত জার্মান সৈন্যবাহিনীকে পশ্চিম সীমান্তে পাঠানো হয়েছিলো। চুক্তির ফলে সোভিয়েট ও অগ্রবর্তী জার্মান সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে একটি সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিলো। জার্মান সৈন্যবাহিনীর মনোবল তারপর যথারীতি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। ফলে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষ বাড়ছিলো। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতেও ঐ একই কারণে ক্ষোভ বেড়ে উঠছিলো। ফলে, আর যুদ্ধ নয়, শান্তির

জন্য জার্মান সৈন্যদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠে। যুদ্ধের প্রতি অনাগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামরিক দক্ষতারও মান নেমে গিয়েছিলো।—ফলে জোট বদ্ধ (Entente) সৈন্যবাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এই ক্ষুব্ধ, পিছিয়ে আসা সৈন্যবাহিনীই ১৯১৮ সালে এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে Wilhelm-এর 'সরকারকে' উৎখাত করে।

একথা অবশ্য ঠিক, ১৯১৮ সালের জার্মান-বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব বলা যায় না। জার্মান-বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-বিপ্লব। জার্মানীর 'সোভিয়েট'গুলি ছিলো বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের একান্ত বশংবদ কেননা এই সোভিয়েটগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সেই স্যোসাল ডেমোক্রাটরা যারা ছিলেন রুশীয় মেনশেভিকদের মতো। এটাই প্রমাণ করে জার্মানীর বিপ্লবের ভিত্তি ছিল দুর্বল। নইলে Rosa Luxemburg ও Karl Lieleknect-এর মতো কমিউনিস্ট নেতাদের নিষ্ঠুর হত্যার ষড়যন্ত্রে এরা সম্মতি প্রদান করতেন না। এই হত্যা সত্ত্বেও এটাকে 'বিপ্লব' বলতেই হবে কেননা এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জার্মানীর শ্রমজীবী মানুষ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছিলো।

জার্মানীর এই বিপ্লব-এর ঢেউ এবার ইয়োরোপের নানা দেশের উপর ভেঙে করলো। অস্ট্রিয়াতে বিপ্লবী-আন্দোলন দানা বাঁধলো। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। লালফৌজের হাতে পোলাণ্ড, আজারবাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার শোষক-শ্রেণী বিধ্বস্ত হলো।

কোনো মহৎ ঘটনা বা বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন অবধারিত ভাবে বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষকে প্রভাবিত করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ইতিহাস ও প্রবহমান সময় সেই 'প্রভাব'কে কালান্তরে নিয়ে যায়। অতীতে এই রকমই হয়ে এসেছে।

রুশ-বিপ্লব এই ঐতিহাসিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দিয়েছে। রুশ নেতৃবৃন্দ 'বিপ্লব'-সাধিত হবার পর আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে বসে থাকেন নি। ইতিহাসের অনিবার্য পরিণামের জন্য বসে থাকা নয়, সক্রিয়ভাবে 'ইতিহাস' সৃষ্টির চেষ্টাই রুশ-বিপ্লবের সবচেয়ে আকর্ষক দিক। ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাই বলশেভিক নেতৃবৃন্দ ১৯২০ সালে 'কমিনটার্নে'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল "·· Capable of Playing a conspicuous part on the international stage and forming an effective focus for revolutionary propaganda in many countries"....

"proved to be the high water-mark of the prestige of comintern and of its hopes of promoting revolution throughout the world".[১১]

সারা বিশ্বে 'বিপ্লব'কে ত্বরান্বিত করার জন্য তৈরি হয়েছিলো 'লাল ফৌজ' (Red Army)। একথা ভাবা ভ্রান্তিমূলক যে, 'লালফৌজ' কেবলমাত্র রুশিয়

ছিল—"The Red Army was not a Russian, but an international army, serving not the national interests of a country but the international interests of a class, had been accepted doctrine from the first ; the founding of comintern seemed to provide the Red Army with a political counterpart."[১২]

শুধু তাই নয় 'কমিনটার্ণের' দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইতালীর প্রতিনিধি Serrati ঘোষণা করেছিলেন যে সেইদিন প্রায় আগত যখন "The proletarian Red Army will consist not only of Russian proletarians, but of proletarians of the whole world."[১৩]

এবং সেই 'বাহিনী'ই হবে "One of the chief forces of world history"[১৪]

বিশ্ব-বিপ্লব-এর শপথ নিয়ে কমিনটার্ণ-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের পরই 'লালফৌজ' পোলাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে। 'লালফৌজ' প্রথমেই পোলাণ্ডে অভিযান চালিয়েছিলো এই কারণে যে, পোলাণ্ডের অদূরেই 'ভার্সাই-চুক্তির' শর্তাধীন বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাটিগুলি বিদ্যমান ছিলো। পোলাণ্ডই ছিলো বলশেভিকদের কাছে শেষ শক্ত প্রতিরোধ। কিন্তু পোলাণ্ডে লাল ফৌজকে পিছু হঠতে হয়েছিলো। লালফৌজ পোলাণ্ডে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গোপন পোলিশ কমিউনিস্ট-পার্টির উদ্যোগে দেশজোড়া হরতালের আহ্বানে সাড়া না মেলায় ও পোলিশ শ্রমিকশ্রেণী অভ্যুত্থানে অসফল ও জাতীয়-বাহিনীতে যোগদানে দ্বিধাগ্রস্থ হওয়ায় লালফৌজের পোলাণ্ড বিজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ১৯২০ সালে 'ওয়ারশ'র কাছে লালফৌজের পশ্চাদ্‌পসারণে 'লালফৌজের' পরাজয় ঘটল না, পরাজয় ঘটল বিশ্ববিপ্লবের উদ্দেশ্যের। এই অভিযানে লালফৌজের পশ্চাদ্‌পসারণ আরেকটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো যে, 'আত্মরক্ষায়' লালফৌজ যত কুশলী আক্রমণে ততটা নয়। যাই হোক ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত ইউরোপে নানা রকম বৈপ্লবিক তৎপরতা চালান হলো।

ইউরোপে বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও (বিশেষ করে জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চরিত্র) 'বিশ্ব-বিপ্লবের' বলশেভিক প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারলো না। এর কারণ অবশ্য অনেক ছিলো।

১। ১৯১৭ সালে রুশিয়ার যে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব ঘটিয়েছিলো তাদের প্রধানত কোনো কিছু হারাবার ভয় ছিলো না। ক্ষুধা ও অবিরাম যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবন্মৃত এ-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত সমাজ-কাঠামোটাকে সমূলে উৎখাত করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি, পরন্তু বলশেভিক পার্টির মতো একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কিছু দৃঢ়চেতা, কুশলী, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের উপর সমস্ত আস্থা অর্পণ করে

তারা বিপ্লবের আহ্বানে ভয়ংকরভাবে সাড়া দিয়েছিলো। ১৯১৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তাদের অধিকতর কোনো ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না।

২। ইউরোপের শ্রমিক-শ্রেণী সম্বন্ধে বলশেভিকদের ধারণা সম্ভবত সঠিক ছিলো না। তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, ইউরোপের শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই রুশ-শ্রমিক-শ্রেণীর মতোই বিধ্বস্ত, শোষিত ও জীবনযাত্রার মান পশু-স্তরের সমতুল্য। কেবল একটি সংখ্যালঘু শ্রমিক-শ্রেণী কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেয়ে কিছুটা উন্নত। কিন্তু এ ধারণা ঠিক ছিলো না। ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী নির্যাতিত ও দরিদ্র হলেও সে দারিদ্র্যের চেহারা রুশ-শ্রমিকদের মতো ছিলো না। সুতরাং 'বিপ্লব'-এর উজ্জ্বল প্রলোভনে এরা এদের প্রাপ্ত ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাকে বাজি ধরতে উৎসাহ বোধ করেনি।

৩। পশ্চিম ইউরোপে 'বলশেভিক-বিপ্লব' কোনো 'প্রপাগাণ্ডা'র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, পরন্তু রুশীয় জনগণের জীবন-যাত্রার অত্যন্ত নিম্নমান, যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে সব কিছু হারানোর ভয়াবহ চিত্র তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিলো। তাই ইউরোপের ঈষৎ সুবিধাভোগী শ্রমিক-শ্রেণী ও তাদের নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র এই দুইটির মধ্যে কোনটি গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই দ্বিধাগ্রস্ততাই ইউরোপে শ্রমিক-সংগঠনগুলিকে দুই ভিন্ন মতাবলম্বী মতবাদে বিভক্ত করেছিলো। বিশ্ব-বিপ্লব-এর আহ্বানে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো তা ইউরোপ সফর শেষে দেশে ফিরে এসে LOZOVSKY বিবৃত করেছিলেন ১৯২০ সালে। আমরা সেই বিবৃতি উদ্ধৃত করছি—"when a few months ago I talked to German workers in Germany, supporters of Scheidemann often appeared at meetings and said, 'yes, you Russians talk of revolution in Germany. Well, we will make a revolution in Germany, but what if there is no revolution in France?' And at the same time a French colleague gets up and beating his breast, also says: 'And what if we make a revolution, and our comrades over there do not?' Then the Italian, opportunists, just as anxious as other opportunists and just as peerish, they too say: 'It's easy for you to talk about revolution. Italy will make a revolution, but she gets coal from England. How can we exist without coal?' So they will wait for one another till the second coming."[১৫]

এই উদ্ধৃতিটির টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এবার এশিয়া মহাদেশের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত

পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়। পারস্য, তুর্কীস্থান, ভারত এবং চীনে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে কমরেড লেনিন সেই সুদূর ১৯০৮ সালে 'Explosive Material in World Politics'-নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, —"The conscious European worker now has Asiatic comrades, and the number of these comrades will grow from hour to hour."[১৬]

এর কয়েক বছর পরে চীনের বিপ্লব সার্থক হলে লেনিন এশিয়ার নবজাগরণের গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন, "This means that the East has finally taken the road of the West, that fresh hundreds and hundreds of millions of human beings will henceforth take part in the struggle for the ideals to which the West has attained by its labours."[১৭]

তবে লেনিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমাদেশগুলিতে বুর্জোয়ারা হীনবল হয়ে পড়লেও এশিয়াতে বুর্জোয়ারা এখনও যথেষ্ট সংহত ও বহুলাংশে 'গণতন্ত্রে' বিশ্বাসী। কিন্তু এই পর্যায়ে লেনিন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর যথেষ্ট জোর দেননি। জোর দিলে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারতেন যে এশিয়ার পশ্চাদপদ দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক-বিপ্লবের দিকে পা বাড়িয়েছে সেই আন্দোলনকে শিল্প-সমৃদ্ধ ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর পন্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে দেওয়াটা কত যুক্তিযুক্ত হতো।

যাই হোক, অন্যান্য বলশেভিক নেতৃবৃন্দ যদিও বিশ্বাস করতেন যে আপাতত এশিয়ার শোষিত ও নিপীড়িত জনগণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করুক, সাম্রাজ্যবাদকে অগ্রাহ্য করতে শিক্ষালাভ করুক ও সবরকম গোপন চুক্তির বিরোধীতা করুক। একমাত্র স্টালিন ছিলেন ব্যতিক্রম। ১৯১৮ সালে নভেম্বরে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি 'অক্টোবর-বিপ্লবের' আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—"The October revolution is the first revolution in the history of the world to break the age-long sleep of the toiling masses of the oppressed peoples of the East and to draw them into the fight against world imperialism···

The great world significance of the October revolution is, primarily, that it has ··by this very fact built a bridge between the socialist West and the enslaved east, creating a new revolutionary front, which runs from the proletarians of the West through the Russian revolution to the

oppressed peoples of the east, against world imperialism."[১৮]

১৯৪৮ সালে অক্টোবর-বিপ্লবের ৩১তম বার্ষিকী উৎযাপন করতে গিয়ে চৈনিক-বিপ্লবের মহানায়ক মাও-ৎ-সে তুঙ ১৯১৮ সালে স্টালিনের এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করে লিখেছিলেন—"History has developed in the direction pointed out by Stalin. The October Revolution has opened up wide possibilities for the emancipation of the peoples of the world and opened up realistic paths towards it, it has created a new front of revolutions against world imperialism, extending from the proletarians of the West, through the Russian revolution, to the oppressed peoples of the East."[১৯]

রুশ-বিপ্লব যে যে কারণে সফল হয়েছিলো তার প্রত্যেকটি যে অভ্রান্ত ছিলো মাও-ৎ-সে তুঙ তা স্বীকার করে লিখছেন—

"If there is to be revolution, there must be a revolutionary party. Without a revolutionary party, without a party built on the Marxist-Leninist revolutionary theory and in the Marxist-Leninist revolutionary style, it is impossible to lead the working class and the broad masses of the people to defeat imperialism and its running dogs · with the birth or revolutionary parties of this type, the face of the world revolution has changed. The Communist Party of China is a party built and developed on the model of the Communist Party of the Soviet Union. With the birth of the Communist Party of China, the face of the Chinese revolution took on an altogether new aspect. Is this fact not clear enough ?[২০]

চীনা কমিউনিস্ট-পার্টির উপর অক্টোবর-বিপ্লবের যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তারের কথা স্বয়ং মাও-সে-তুঙ স্বীকার করে ক্ষান্ত হননি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ-বিপ্লবের দুরন্ত প্রভাবের কথাও বলেছেন। তিনি লিখছেন,—

"The world revolutionary united front, with the Soviet Union as its head, defeated fascist Germany, Italy and Japan. This was a result of the October Revolution. If there had been no October Revolution, if there had been no Communist Party of the Soviet Union, no Soviet Union

and no anti-imperialist revolutionary united front in the West and in the East led by the Soviet Union, could one concieve of victory over fascist Germany, Italy, Japan and their running dogs ?[২১]

এইভাবে এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে, যেখানে, শ্রেণী-বৈষম্য চরমে উঠেছিলো এবং শোষণ নিয়মে পরিণত হয়েছিলো সেখানেই 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো। তাই চীনের যুদ্ধবাজ প্রভু, কিউবার কুখ্যাত 'বাতিস্তা', ভিয়েতনামের ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন এবং আফ্রিকাতে পর্তুগীজ প্রভুদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের লড়াই, ঘরে বাইরে, প্রভূত সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়েছিলো।



বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব

১৯১৭ সাল বা তারও আগে থেকে যে সমস্ত ভারতীয় ও বিশেষভাবে বাঙালীরা নানা কারণে বিদেশে বাস করছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের উপর এই বিপ্লবের সুদূর বিস্তারী প্রভাব পড়েছিলো। সুদূর মেক্সিকো থেকে শুরু করে আমেরিকা ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যে ছড়িয়ে থাকা মুষ্টিমেয় বাঙালী মনীষা ও রাজনৈতিক কর্মীরা, ভারতবর্ষের মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি করে ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের উষ্ণ উত্তাপের আঁচ পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁদের অনেকে মস্কো-মহানগরীতে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন লেনিন, ট্রট্স্কি, স্টালিন ও অন্যান্য প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের। অশ্রুতপূর্ব এই বিপ্লবের পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁরা স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের। তাঁদের শক্তি সীমিত থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মোচন করে ভারতভূমিকে মুক্ত করার নানা পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। রুশিয়ার নেতৃবৃন্দের বিশ্ব-বিপ্লব সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের কেউ কেউ যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতেও পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের রুশিয়ায় বিপ্লব-সংঘটনের কিছুকাল পরেই (১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর, তাসখন্দে) বিদেশের মাটিতে এই সমস্ত প্রবাসী-ভারতীয়দের উদ্যোগে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়ে গিয়েছিলো।

শুধু তাই নয়, ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে একটি অস্থায়ী 'ভারতসরকার'ও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যথাক্রমে বরকতুল্লাহ ও মহেন্দ্রপ্রতাপ। অধ্যাপক বরকতুল্লাহ ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েট দেশে পৌঁছন। তিনি কমিউনিস্ট বা সোসালিস্ট কিছুই ছিলেন না। ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও ইংরেজ, রুশিয়ারও শত্রু ছিলো বলে

তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দ্বিধা করেননি। 'পেট্রোগ্রাড প্রাভদা'য় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বরকতুল্লাহ বলেছিলেন "বলশেভিকদের ভাবনা আজ ছড়িয়ে পড়ছে ভারতীয় জনগণের ভিতরে।...ইতিমধ্যেই বছর খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাঙলাদেশই হল সবথেকে বিপ্লবী অর্থাৎ বলতে গেলে বাংলা হল বিপ্লবের মনন-কেন্দ্র, আর সব কর্মচঞ্চল ভারতীয় প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের সীমানায়।"[১]

এ সমস্ত তথ্য প্রয়োজনে অন্যত্র দেবো—এবার আবার মূল কথায় ফিরি। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের ছোঁয়ায় বিদেশে প্রবাসী-ভারতীয় ও বিশেষ করে কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় বাঙালীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলো এবং তাঁদের তৎপরতা ভারতবর্ষের জনমানসে নতুন কোনো চিন্তাভাবনার ঢেউ তুলতে সমর্থ হয়েছিলো কিনা তার একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করার চেষ্টাটি, বোধ করি, ইতিহাস-সম্মত হবে। এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে বা পরবর্তী বছরগুলিতে প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্লবীদের নানা কাজকর্মের বিবরণ বিস্তৃতভাবে নানা ভারতীয় গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু, বিভিন্ন ভাষার ছোটো বড় নানা গ্রন্থে, লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে এই গ্রন্থে ঐ অধ্যায়ের পুনর্বতারণা অপ্রয়োজন। উৎসাহী পাঠক, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', চিন্মোহন সেহানবীশের 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' ও ইংরেজিতে M.N.Roy-এর 'Memoirs', ও ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের 'Central Asia in Modern times' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পড়ে দেখতে পারেন।

কয়েকজন প্রখ্যাত প্রবাসী বাঙালীর ভূমিকা

রজনীপাম দত্ত

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবকে, বিদেশে যে ভারতীয়, ঐ বিপ্লব সংঘটনের পূর্বেই ব্রিটেনে এক সভা সংগঠিত করে অবশ্যম্ভাবী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রতি নিজেদের solidarity (সংহতি) জ্ঞাপন করেছিলেন—তাঁর নাম রজনীপাম দত্ত। যিনি কলকাতার বিখ্যাত রাম বাগান দত্ত পরিবারের সন্তান। পিতার নাম উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। বিখ্যাত সিভিলিয়ন-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন রজনীপাম দত্তের একান্ত আত্মীয়। রজনীপাম দত্তের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে প্রবাসী ভারতীয়দের কেউ কেউ বিপ্লব-পূর্ব রুশিয়ার সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে

কতটা পরিচিত ছিলেন। রজনীপাম দত্তের জীবনই প্রমাণ করে ঐ একটি 'Crime'-এর জন্য তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির সমস্ত classics পেপারে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও ইউনিভারসিটি থেকে বহিষ্কৃত হন। ব্রিটেনের একটি কলেজেও তার মত অসামান্য মেধাযুক্ত একটি যুবকের লেকচারারের পদও জোটে না। সারা জীবন তাঁকে একটি স্কুলের চাকুরী জুটিয়ে খুশি থাকতে হয়।[২]

এই অসামান্য প্রবাসী-ভারতীয় বাঙালী যুবকের হাতেই গড়ে ওঠে ব্রিটেনের 'কমিউনিস্ট পার্টি' ১৯২০ সালে। তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন Harry Pollit, William Gallacher প্রমুখ ব্রিটেনের প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ।

আমৃত্যু R.P.D. বিখ্যাত 'Labour Monthly'-র সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশ করেছেন তাঁর 'India To-day' ছাড়া 'Fascism and Social Revolution', 'World Politics, crisis of Britain and British Empire', 'Internationale' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

রুশ-মহাবিপ্লবের পরে আজ যে প্রত্যয়ে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী, সে প্রত্যয়ের মূল কথা হল স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি আর সার্থকতা শোষণ মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বিনা সম্ভব নয়। যদিও এই বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দেবার জন্য বহুরূপী চক্রান্তেরও শেষ নেই তথাপি জগৎ জুড়ে স্বাধীনতা আর সমাজবাদের মেলবন্ধন ক্রমেই অপরাজেয় হয়ে উঠছে—এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৮৪৮ সালে মার্কস এঙ্গেলস্-এর 'সাম্যবাদী ইস্তেহার' যে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘোষণা করেছিল যার ফলে আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশ থেকে ধনিক-বণিকের প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরো বহু দেশ থেকে এই প্রভুত্বের অবসান ঘটবে।

কিন্তু রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সর্বহারার-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর এই অমোঘ বিশ্বাস স্থাপন করা যে কতটা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু এই প্রবাসী বাঙালী রজনীপাম দত্ত সেই সুদূর প্রবাসে বসে ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'লেবার মান্থলি' পত্রিকায় লেখেন: 'কার্লমার্কস-এর জন্মের (১৮১৮) একশো বছর পরে প্রথম সর্বহারা বিপ্লব আর সর্বহারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর (১৮৮৩) পরে কি দেখা যাবে বিশ্বব্যাপি সর্বহারা লোকরাজ্য?' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চরৈবেতি ?', 'পরিচয়' শারদীয় সংখ্যা

[১৮৮৩ সালের পর ১৯৮৩ সালও বিগত হয়েছে। সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে কি বলা যায় না এখন, যে সর্বহারা-রাষ্ট্রের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি না পেলেও ধনিক-বণিকের নাগপাশ থেকে এশিয়া আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রই আজ মুক্ত? বলা যায় না কি রুশ-বিপ্লবের প্রভাব আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত

নির্যাতিত মানুষকে সংগ্রাম ও অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের দিকে অভ্রান্তভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ?]

১৯৬৩ সালে আবার রজনীপাম ঐ পত্রিকাতে লেখেন "১৯৮৩ আসতে এখনও বিশ বছর বাকি আছে। অনেক কিছু ইতিমধ্যে ঘটতে পারে। ইতিহাসের গতি বিষয়ে মার্কসবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তারিখ সম্বন্ধে নয়। তবু বলবো যে ১৯৮৩ নাগাদ সময়ে দুনিয়া জুড়ে সাম্যবাদের জয় একেবারেই অকল্পনীয় নয়। সন্দেহ নেই যে, ক্রমশ আরও জোরে দৌড় চলেছে, আর লক্ষ্যস্থল খুব বেশি দূরও নয়।" রজনীপাম দত্ত-র পরিচয় যারা পেয়েছেন তারা জানেন তাঁর জ্ঞান, তাঁর একাগ্র কমিউনিস্ট নিষ্ঠা, তাঁর আজীবন সাধনার মূল্য। ...বহু ভারতীয় কমিউনিস্টের গুরু-স্বরূপ এই মানুষটি হৃদয়বান ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অলস, অলীক কল্পনা প্রবণতা তাঁর লেশ মাত্র ছিলো না। নক্ষত্র-বিজ্ঞানের মতো ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করতে বসেন নি, চলমান জীবনের সম্ভাব্য স্পন্দনেরই আভাস দিয়েছিলেন। বাছাই করেছিলেন হয়তো শুধু মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) শতবর্ষ পূর্তিকাল বলে নয়, সম্ভবত পাশ্চাত্যের 'বিদগ্ধ'-চক্রে যশস্বী অরওয়েলের '১৯৮৪' গ্রন্থটিরও কথাও ভেবে..." (ঐ, পৃঃ ১১-১২)

রজনীপাম দত্তের আশ্চর্য জীবন ও লেখনী ভারতীয় পাঠক, বিশেষ করে জাত-কমিউনিস্টদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলো সেকালে। এমনি একজন জাত-কমিউনিস্ট হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'তরী হতে তীর' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন..."Labour Monthly-পড়ে যেতাম-রজনীপাম দত্তের অকাট্য তথ্য-সমাবেশ আর স্পষ্টোচ্চারিত যুক্তির দীপ্তি ছড়িয়ে থাকত তাঁর দীর্ঘায়ত বাক্য বিন্যাসে—"এই প্রসঙ্গেই হীরেন্দ্রনাথ আত্মানুসন্ধান করেছেন, এত অকাট্য তথ্য ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট জনসমর্থন এত সীমিত কেন ? উত্তরে শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেই লিখছেন "মাঝে মাঝে মনে ঢুকত একটা চিন্তা যে কমুনিস্টদের ব্যবহারে সচরাচর এক ধরণের গোঁয়ার্তুমিই বুঝি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে—তখন জানা বা বোঝা সম্ভব ছিল না যে এই সমাজ থেকে বেরিয়ে অথচ এর মধ্যেই কমুনিস্ট হতে পারা সোজা ব্যাপার নয়। তখন জানতাম না যে নিজেদের বদলানো আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজকে বদলানোর কাজ হুট করে শেষ করা যায় না, তৈরি থাকতে হয় পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে লড়াই চালিয়ে যাবার কাজে, যে লড়াইয়ের পথ কখনো সোজা কখনো বাঁকা, যাতে কখনো যুদ্ধ কখনো শান্তি অথচ যা নিয়ত নানারূপে বিদ্যমান বলে তার সাচ্চা সিপাহী হতে পারা বড়ো সহজ কাণ্ড নয়।" (পৃঃ ২৪৫-২৪৬)

ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর এই প্রবাসী-বাঙালী কমিউনিস্টের প্রভাবের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ আরও চমৎকার হতে পারে কি ?

মানবেন্দ্রনাথ রায়

২৪ পরগণা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম উরবেলিয়ায় এক যাজক পরিবারের সন্তান নরেন্দ্র ভট্টাচার্য কালক্রমে বিপ্লব-প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশ্ববিপ্লব সংগঠনের কর্মচঞ্চল ক্ষেত্রে এক কিংবদন্তীর পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় এই মানুষটিরই ছদ্মনাম যে নামে তিনি পরবর্তীকালে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িককালে শুধু অবিভক্ত বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র এশিয়ায় তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আর কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলো না। তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত অন্তত বারোটি দেশ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কর্মযজ্ঞের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছিলো, সেই সেই দেশে তিনি জাতীয়তাবাদী-আন্দোলন, কমিউনিস্ট ও মানবতাবাদী-আন্দোলনে নানা গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িককালে সেই বিরল-উদাহরণ ব্যক্তিত্ব যিনি ক্ষমতা ও দক্ষতার তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন, ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই সময়ের ইতিহাস-বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক চরিত্রগুলির সঙ্গে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের দোষগুণ যাই হোক তিনি কখনো একই বিশ্বাসে স্থির থাকেন নি। পার্টি, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মত, মানবেন্দ্র নাথের কাছে হয়তো ধ্রুব বলে মনে হয়নি। তিনি নিজের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, বিশ্বাসকে তথাকথিত কোনো রকম রাজনৈতিক 'কমিটমেণ্টের' আড়ালে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাননি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনে বাঙালী তো দূরের কথা কোনো ভারতীয়ও তাঁর মতো শীর্ষবিন্দুতে আজও পৌছতে পারেননি—তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের সুদূর-প্রসারী বিস্তারের কাছাকাছিও আসতে পারেন নি।

অথচ দুর্ভাগ্য মানবেন্দ্রনাথ ও আমাদের যে, তিনিও আমাদের কাছে চিহ্নিত হলেন সাম্প্রতিক ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত, নিন্দা-প্রশংসায় মণ্ডিত এক অদ্ভুত প্রতিভা হিসেবে।

অক্টোবর-মহাবিপ্লবের পরবর্তীকালে বিশ্বের নানা স্থানে ঐ বিপ্লবের বাণীকে পৌছে দিতে ও বিশ্ববিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অবদানের কথা কারো অজানা নেই। ভারতবর্ষের বিপ্লব-চেষ্টার পিছনে একটি সময়ে এই মানুষটির গভীর প্রভাব পড়েনি এমন কথা বলা মানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো। অক্টোবর-বিপ্লবের পরে তিনি সেই বাঙালী যিনি সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নেতৃবর্গ লেনিন, স্টুটস্কি, স্টালিন, জেনোভিয়েভের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। লেনিন 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানেলের' তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের জন্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর 'থিসিস' রচনার দায়িত্ব মানবেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করেছিলেন। লেনিন সেই 'থিসিস' কিছু কিছু সংশোধন করলেও বহু বিষয়ে তিনি ও মানবেন্দ্রনাথ ঐক্যমতে পৌছেছিলেন। যদিও অধিবেশনে লেনিনের

থিসিস গ্রাহ্য হয়ে গৃহীত হয়েছিলো ; তথাপি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের থিসিসও লেনিনের থিসিসের পাশাপাশি পরিপূরক থিসিস হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। এ এক দুর্লভ সম্মান।

তাই এই কিংবদন্তীর পুরুষটির মধ্য দিয়ে এক সময়ে অক্টোবর-বিপ্লবের বাণী, ভারতবর্ষের তথা বাঙালী-বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলো, তাই বাঙলাদেশে আজও মানবেন্দ্রনাথের ভক্তের অভাব ঘটেনা। যাঁরা তাঁর সমালোচক তাঁরাও শুধু নিন্দা দিয়ে তাঁকে ভূষিত করেন না।

ভারতবর্ষের এক প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাই লিখতে হয়—'এম.এন. রায় মহাশয়ের গুণগ্রাহী কিছুতেই হব না বলে ধনুকভাঙা পণ কখনো করিনি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে শ্রদ্ধা অবশ্য বেশ কমে যায়, বুঝেছিলাম শুধু পরিস্থিতির চাপে নয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ফলেও তিনি কেমন যেন ভেদনীতি বিশারদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে বিতর্কিত হলেও কীর্তিমান বাঙালী বলে আমাদের কাছে আদৃত হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। এদেশের রাজনীতিতে যখন তাঁর প্রকাশ্য আবির্ভাব, তখন কংগ্রেসে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু তাঁকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হননি।... কংগ্রেসে তিনি যে প্রতিষ্ঠা সহজে পেতে পারতেন তা সম্ভব হল না, রায় চললেন নিজের একক রাস্তায়, এবং যে অতীত নিয়ে তিনি এসেছিলেন তার ফলে কম্যুনিস্ট সোসালিস্ট কারো সংসর্গই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।... আশ্চর্য নয় যে বিবিধ গুণালংকৃত হয়েও এই অসাধারণ বাঙালী বিপ্লবের ইতিহাসে মহত্বের কোনো স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারলেন না। অন্তত একদা বিপুল কর্মক্ষমতা এবং নিয়ত শ্রান্তিহীন মন সত্বেও তিনি যে অবদান রেখে গেলেন তার মূল্যায়নে কঠোর না হবার উপায় আছে কি ?"

(হী: মুখো:, তরী হতে তীর, পৃ: ৪৪৪-৪৫)

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে যে সমস্ত কমিউনিস্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছিলেন বা আসতে চেয়েছিলেন তাঁদের কিন্তু অধিকাংশকেই তিনি হতাশ করেছিলেন। তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বহু লোকের কাছে প্রীতিপ্রদ বলে মনে হতো না। সে প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—"অসংকোচে বলতে পারি, শ্রদ্ধান্বিত মনেই তাঁর সামনে গিয়েছি, যদিও মতভেদ ছিল বহু—আর সবাই তো জানে তিনি ছিলেন আকারে দশাসই মানুষ, দেখলে অহংকার হত, বলা যেত সত্যই যে 'বাঙালী নহে খর্ব' ! বুদ্ধি বৃত্তির ঔজ্জ্বল্য তো নিঃসন্দিগ্ধ, আর জীবন কথায় অন্ধকার পরিচ্ছেদ থাকলেও অগ্নিদীপ্তিও তো ছিল, তাই তাঁকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই প্রস্তুত ছিলাম, আন্তরিক বিনয় নিয়েই কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। বেশ মনে আছে ব্যর্থ হতে হল, অত বড়ো মানুষ হয়েও আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে হয়তো কম্যুনিস্ট পার্টি সভ্য বলেই দূরে রাখতে

চাইলেন। আলাপে উদ্ভট কুণ্ঠা, আলোচনায় একান্ত অনীহা, কেমন সন্দিগ্ধভাব এবং এমনই কষ্টকৃত সৌজন্য যে বেশিক্ষণ তাকে সহ্য করা পীড়াদায়ক লেগেছিল।
(হীঃ মুখোঃ, তরী হতে তীর, পৃঃ ৪৪৪-৪৫)

চোদ্দ বছরের স্কুল ছাত্র মানবেন্দ্রনাথ প্রথমে বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার পরই তিনি ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করেছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে—যে অস্ত্র দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়েরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ উৎখাত করতে। এইভাবে তিনি বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, ফিলিপিন্‌স হয়ে অবশেষে পৌঁছেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকায় তাঁর অবস্থান ততদিনই নিশ্চিত ছিলো যতদিন না আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, এবং জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি পালিয়েছিলেন মেক্সিকোতে।

এই মেক্সিকোতেই এই বাঙালী যুবক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির জোরে মেক্সিকোর 'স্যোসালিস্ট পার্টি'র সাধারণ সম্পাদকের পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রুশ দেশে অক্টোবর-মহাবিপ্লব সংগঠিত হয়ে গিয়েছিলো। মেক্সিকোতে সেই বার্তা ও বিশ্ববিপ্লব-সংগঠনের জন্য সংগঠন গড়ে তোলার দায় নিয়ে মাইকেল বরোদিন মেক্সিকোতে ছদ্মবেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই বরোদিন তাকে নবজাত সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র ও অক্টোবর-বিপ্লবের তাৎপর্যের কথা বিস্তৃতভাবে জানান। মানবেন্দ্রনাথ এই ভাবে কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। মূলতঃ রুশ-মহাবিপ্লবের সার্থকতায় উদ্দীপ্ত মানবেন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টায় তদানীন্তন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট Garranza কে মেক্সিকোতে Latin American Bureau of the Communist International গঠনের ব্যাপারে সম্মত করান। মেক্সিকো-সরকারের উপর এই বাঙালী যুবকের অসামান্য প্রভাবের ব্যাপারটি এই ঘটনা থেকে সুপ্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয় মেক্সিকোর স্যোসালিস্ট পার্টিকে 'কমিউনিস্ট পার্টি'তে রূপান্তরিত করার ঘটনাটিও পার্টির উপর তাঁর অবিশ্বাস্য কর্তৃত্বের ছবিটিকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে। মেক্সিকোর 'কমিউনিস্ট পার্টি'ই রুশ বিপ্লবের পরে রুশিয়ার বাইরে গঠিত প্রথম 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলে স্বীকৃত। এর প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্বই এককভাবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রাপ্য। বরোদিন-দৌত্যের এই সাফল্যের কথা বরোদিনই সোভিয়েত দেশে পাঠিয়েছিলেন। তাতে বরোদিনের গৌরব যত না বেড়েছিলো তার চেয়ে বেশি জাগ্রত হয়েছিলো এই বাঙালী যুবক সম্বন্ধে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের আগ্রহ ও সম্ভ্রম। ফলে ১৯২০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মেক্সিকোর 'কমিউনিস্ট পার্টি'কে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য মস্কো থেকে অনুরোধ আসে। বলাবাহুল্য মানবেন্দ্রনাথ রায় ঐ কমিউনিস্ট

পার্টির অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে নানা শত্রু দেশের মধ্য দিয়ে নানা কৌশলে তাঁর 'Holy Land', 'Cradle of the Revolution', মস্কোতে পৌঁছন। সেখানে অক্টোবর-মহাবিপ্লবের অন্যতম ঋত্বিক ভ্লাদিমির লেনিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। ২৭ বছরের টগবগে যুবক মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বিস্মিত লেনিন সকৌতুকে বলেন—"You are so young ; I expected a grey-bearded wise man from the East."[৩]

যে মানবেন্দ্রনাথ রায় মেক্সিকোতে মাইকেল বরোদিন ও পরবর্তীকালে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হন তা এত দ্রুত হতো না যদি ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব সর্বহারাদের রাষ্ট্র-গঠন করতে সক্ষম না হতো।

ভারতবর্ষে সশস্ত্র-বিপ্লব-সংঘটনের জন্য একদা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো অস্ত্র-সংগ্রহের জন্য, রাজনৈতিক সমর্থন লাভের আশায়। 'বিপ্লব' সম্বন্ধে তখনও তাঁর একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। পরবর্তীকালে 'বিপ্লব' সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো। তখন অতীত-বিশ্বাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বের ধ্যানধারণাকে নির্মমভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করে বলেছিলেন—"···We all shared the same vague desire to uplift the poor and the down-trodden. Bankim Chatterji's Anand Math was our common source of inspiration. Therein we found our revolutionary ideal. As a matter of fact, we had distributed amongst ourselves the roles of the prominent figures of that drama. They were Sanyasins. We had taken the vow to follow in their footsteps. The imagination of establishing our Anand Math somewhere in the upper reaches of the Brahmaputra Valley, winning over the people with our ideals, arming them and then advancing further into the country at the head of an invinicible army of liberation-all this made me feel that if my mission succeeded, I would return to India not only with arms, but a new idea of revolution."[৪]

অক্টোবর-মহাবিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে গঠিত সোভিয়েট-সমাজতন্ত্রের চরিত্র ও রূপ দেখে, নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ ও 'Mission'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতবর্ষের বিপ্লব-সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অক্টোবর মহাবিপ্লবোত্তর রুশিয়াকে দেখে, তার ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে সোভিয়েট বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংঘর্ষে এসে মানবেন্দ্রনাথের বিপ্লবী-

চেতনা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলো তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন "...I was convinced that the Indian revolution was still a long way off, and an uphill path lay ahead. Arms and money would not make the revolution. The army of revolution should be first trained politically. Having travelled around the world since I left India in 1915, I had reached very near her frontiers with plenty of arms and money. It was in quest of those that I had left India. But when I was in a position to get plenty of them, I discovered that it was useless to search for arms before there were people ready to bear them.. So I closed an exciting chapter of my life with the experience of a failure, but without regret."[৫]

অন্যান্য ভারতীয় ও বাঙালী বিপ্লবীদের তৎপরতা

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজ-শক্তির জড়িয়ে পড়ার ঘটনাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলিকে স্বদেশে ও প্রবাসে ভয়ংকরভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলো। এই যুদ্ধের সুযোগে তাঁরা চেয়েছিলেন যুদ্ধে ব্যাতব্যস্ত ইংরেজ-রাজশক্তিকে নানা চাপের মুখে রেখে 'স্বাধীনতা' আদায় করে নেওয়া কিংবা বাহুবলে ঐ রাষ্ট্রশক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করা।

প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্লবীরা যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশে দারুণ তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে জার্মানীর সাহায্যপ্রার্থী হলেন। জার্মানীর তদানীন্তন সরকার এই সমস্ত বিপ্লবী-কর্মতৎপরতাকে শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে সমর্থনই করলেন না, ভারতবর্ষে ইংরেজকে সমূলে উৎখাত করার বিপ্লব-উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। জার্মানী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিলো। জার্মানীর দেওয়া এই সমর্থন ও সাহায্যের আশ্বাস স্বদেশে ও বিদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিলো, এমনকি এর প্রভাব ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যদেরও উৎসাহিত করেছিলো বিপ্লব-এ অংশ গ্রহণ করতে। ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র সাহায্য দেবার উজ্জ্বল জার্মান-প্রতিশ্রুতি যখন সত্য হয়ে উঠলো না তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো সক্রিয় বাঙালী বিপ্লবী হতাশ হয়ে তাঁর Memoirs-এ লিখেছিলেন "The whole plan was a hoax, a veritable swindle" তিনি লিখেছিলেন—"... The plan failed because the Germans would not play such a serious game."[৬]

প্রথম-মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা পাগলের মতো বিশ্বের চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন অস্ত্রের জন্য, রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য। তাঁদের রাজনৈতিক-প্রজ্ঞা ততটা গভীর ছিলো না বলেই তাঁরা বিশ্ব-পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। তাই শুধু ইংরেজ-বিরোধী বলেই তাঁরা জার্মান উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আশ্বাসকে মহৎ মূল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়াতে বসে ১৯১৬ সালের মে মাসে লেনিন কিন্তু জার্মানদের ভারত-প্রীতির আসল মতলবকে ফাঁস করে দিয়ে লিখেছিলেন "..... জার্মান পত্রিকাগুলি প্রচণ্ড দাপটে বিদ্বেষ ভরা উল্লাস, ফুর্তি ও উদ্দীপনায় লিখে চলেছে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের কথা। জার্মান বুর্জোয়ারা কেন বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাসে ডগমগ, তার কারণ সহজেই ধরা যায়; ভারতে অসন্তোষ ও বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে প্ররোচিত করে ভরসা করে তাদের সামরিক অবস্থানের উন্নতি সাধনের।...

জার্মান উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মিথ্যাচারের জড় নিহিত রয়েছে বৃটেন কর্তৃক অত্যাচারিত জাতিগুলির স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের সাড়ম্বর সহানুভূতি ঘোষণায় আর অমায়িকভাবে, কখনো কখনো বড়ই অমায়িকভাবে তাদের নিজ জাতি কর্তৃক অত্যাচারিত জাতিদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মৌন অবলম্বনে।"[৭]

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্লবীরা তখনও রুশ-বিপ্লবের প্রস্তুতির ব্যাপকতার কথা ভালোভাবে জানতেন না, জানতেন না লেনিনকে, কিম্বা তাঁরা পরিচিত ছিলেন না তাঁর লেখনী সম্বন্ধে, তাই তাঁরা প্রবল স্বদেশ-প্রেম ও ভারতবর্ষের শৃঙ্খল-মুক্তির কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা কর্মতৎপরতার মধ্যে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রবাসী ভারতীয়-বিপ্লবীরা শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও শ্রীমতী কামাকে কেন্দ্রে রেখে লণ্ডন ও প্যারিসে তৎপর হয়ে ওঠেন। লণ্ডনে তৈরি হয় 'অভিনব ভারত সংঘ' ও 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট', 'বন্দেমাতরম্‌' ও 'তলোয়ার' পত্রিকাগুলি।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী বসু, বীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, প্যারিসেই এই ভারতীয়-বিপ্লবীদের কারো কারো সঙ্গে রুশ, পোলিশ, আইরিশ, মিশরী ও তুর্কী বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন বাঙালী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়ে জার্মান পররাষ্ট্র-বিভাগের ব্যারন ওপেন হাইমের সঙ্গে একটি ১৫ দফা চুক্তি করেন যার ফলে জার্মানার সাহায্যে ভারতবর্ষে একটি বিদ্রোহ ঘটান যায়। এই চুক্তির একটি শর্তের ফলে গড়ে ওঠে 'ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি'। কয়েকমাস পরে ঐ সমিতির জায়-

গায় শুধু ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে ওঠে Indian Independence Committee বা I.I.C. বাঙলায় 'বার্লিন কমিটি' নামে যা খ্যাত।

এই 'বার্লিন কমিটি' বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারতীয় বিপ্লবী-কেন্দ্রগুলিকে একত্রতে ব্রতী করার চেষ্টা করে। আমেরিকায় 'গদরপার্টি'র সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীকে জার্মানী থেকে আমেরিকায় পাঠান হয়। তার মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালী, নাম ধীরেন্দ্রকুমার সরকার। এই যোগাযোগের ফলে আমেরিকা থেকে জার্মানীতে এলেন লালা হরদয়াল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাশ, বীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখেরা। এইভাবে সুইজারল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে এসেছিলেন চম্পকরমন পিল্লাই ও ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত। 'বার্লিন কমিটি' বাগদাদ, সুয়েজখাল, পারস্য ও আফগানিস্থানেও চারটি বিপ্লবী-মিশন পাঠায়। আফগানিস্থানে প্রেরিত এই মিশনের হাতেই ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর স্থাপিত হয় অস্থায়ী এক 'স্বাধীন ভারত সরকার'। এই সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী মৌলানা বরকতুল্লাহ, স্বরাষ্ট্র সচিব ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, পররাষ্ট্র সচিব চম্পকরমন পিল্লাই ও সমরসচিব মৌলানা মহম্মদ বশীর।

'গদরপার্টি' ভারতবর্ষেও হাজার খানেক কর্মী পাঠায় এবং জাপান, চীন হংকং, যবদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশেও যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে অবিভক্ত বাঙলা দেশ থেকে বিপ্লবীরা সরাসরি লোক পাঠিয়েও ঐ সব দেশে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেন কিছুটা।

ইউরোপে যেমন 'বার্লিন কমিটি' ও 'গদরপার্টি' মিলিত পরিচালন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলো তেমনি ভারতবর্ষেও সেই সময় "বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে একযোগে কাজ করবার প্রবণতা কিছুটা দেখা গিয়েছিলো, কিন্তু পুরো ঐক্য স্থাপিত হয়নি শেষ পর্যন্ত।"[৮]

দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালী, ঐ মিলিত চেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ প্রবলভাবেই ভারতবর্ষের মুক্তি-স্বপ্নকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। সেইসূত্রে 'ম্যাভেরিক', 'লারসেন', 'হেনরী এস' জাহাজ থেকে অস্ত্র প্রাপ্তির আশা ও তার ব্যর্থতায় বাঘা যতীনের সদলে শহীদত্ব বরণের মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ভারতবর্ষে ঘটে গেলো। বাঘা যতীনের অন্যতম শিষ্য মানবেন্দ্রনাথ রায় পরবর্তীকালের ঐ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জাহাজ-ভর্তি অস্ত্র আমদানির ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"They failed to arrive, because, as it was discovered later, the whole plan was a hoax, a veritable swindle."[৯]

ঐ উন্মাদনায় ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয়-সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা ও সেই সূত্রে রাসবিহারী বসুর দেশত্যাগ ও জাপান-যাত্রা।

বিপ্লব-চেষ্টার এই ব্যর্থতার পরিণামে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ চালালো প্রচণ্ড চণ্ড-নীতি। তবু ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের আশা তখনও ছিলো কেননা তখনও ইংরেজ জার্মানীর হাতে যথেচ্ছ নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো।

কিন্তু ১৯১৭ সালে যুদ্ধের গতি অন্যদিকে ঘুরে গেলো। মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগ দিল শক্তিশালী আমেরিকা। জার্মানীর পরাজয় আশঙ্কা-প্রবাসী ও দেশী ভারতীয়-বিপ্লবীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অন্যদিকে জার্মান-সরকারও 'বার্লিন কমিটি'কে আর আগের মতো মদৎ দিতে আগ্রহ হারাতে শুরু করলো।

প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐ আশাভঙ্গের দিনগুলিতে রুশিয়াতে ঘটে গিয়েছিলো অক্টোবর-মহাবিপ্লব। মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এই ঘটনাটির গুরুত্ব প্রবাসী-ভারতীয়-বিপ্লবীদের সবার কাছে স্পষ্ট না হলেও একজন বাঙালীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। তাঁর নাম বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসী স্যোসালিস্ট-পার্টির সদস্য বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লেনিনের নাম প্রথম শোনেন মাদাম কামার কাছে ১৯১০ সালে। তখনও তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার তাৎপর্য বা লেনিনের তৎপরতার গুরুত্ব ঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারেন নি। সেকথা স্বীকার করে বীরেন্দ্রনাথ নিজেই ১৯৩৪ সালের ১৮ই মার্চ লেনিনগ্রাডের বিজ্ঞান-অ্যাকেডেমীর সভায় বলেছিলেন ..."আমরা কেউ তখন বুঝিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যেকার বিভেদ আর লেনিনের ভূমিকার তাৎপর্য।"[১০]

আসলে বীরেন্দ্রনাথ ফরাসী সোস্যালিস্ট-পার্টির খাতায় নাম লেখালেও তিনি তখনও ছিলেন মূলত জাতীয়-বিপ্লবী। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, "কিন্তু ভারতীয় বৈপ্লবিকরা বুর্জোয়া ন্যাশানালিস্ট।.. তাঁহারা সমাজ বৈপ্লবিক নহেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করা তাঁহারা রাজনীতি সংগত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে বিপ্লববাদের পবিত্রতার হানি হয় নাই বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।[১১]

জার্মানীর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাবার দিন তখন ফুরিয়ে গিয়েছিলো এবং রুশ দেশে ঘটে গিয়েছিলো বিপ্লব। ইংরেজকে সোভিয়েট রুশিয়া শত্রু মনে করতো, কেননা, ইংরেজ, আমেরিকা ও ফ্রান্সে বলশেভিকদের ধ্বংস কামনায় অনেক অনিষ্টকর কার্য করেছিলো। ফলে স্বাভাবিক কারণেই রুশরাও চাইত এদের ঘরে আগুন লাগুক। তাছাড়া ১৯১৭ সালের পরে রুশিয়াতে বিশ্ব-বিপ্লব সাধনের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবান ছিলো। তাই ভারতীয় বিপ্লবীরা এবার জার্মানীকে ছেড়ে রুশ পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্য জগতের এই নতুন তীর্থে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

এই সন্ধিক্ষণে এম. এন. রায়, অ্যাগনেস স্মেডলী, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মস্কো যাত্রা করেন। সেটা ১৯২১ সাল।

এম.এন. রায় তখন বিশ্ব-বিপ্লবের ডাকে মুগ্ধ। তিনি সারা ভারতকে 'কমিউনিস্ট' দেখতে চান। কিন্তু স্মেডলী চাইতেন ভারতবর্ষে 'জাতীয় স্বাধীনতা' আগে আসুক। বীরেন চট্টোপাধ্যায় এই দ্বিতীয় মতকে সমর্থন করতেন। কিন্তু একটি কথা সে সময়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে ভারতীয়-বিপ্লবীরা আর একমতের গোষ্ঠী নন। কিছু লোক জাতীয়তাবাদ, অপর কিছু লোক কমিউনিজম পছন্দ করেন।

মস্কোতেও তখন দুটো মত কাজ করছিল, লেনিনের মত আর ট্রট্স্কির মত। ট্রট্স্কি চাইতেন জগৎ জোড়া-বিপ্লব। লেনিনের মত ছিল অন্যরূপ। ভারতের তদানীন্তন অবস্থায় শ্রেণী-সংঘর্ষের পথ অবলম্বন না করে সব দল একত্র হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসকল্পে উদ্যোগী হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন। মস্কোতে বরোদিন, কোয়লুব রাটগার্স, ট্রয়ানস্কি প্রভৃতি কমিউনিস্টরা ভারতীয়-জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে হতাশ করলেন। কিন্তু ১৯২১ সালে সব ভারতীয়দের একত্র করে একটা কার্যসূচী স্থির করার জন্য একটি 'কমিশন' বসে। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই কমিশনে নিজের 'থিসিস' দাখিল করেছিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিলো যে, সব কথা ছেড়ে আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা। ট্যানস্কি এটি পড়েন এবং মত দেন যে, এটি জাতীয়তাবাদী-থিসিস। লেনিনকে এই থিসিস পাঠানো হয়। তিনি পড়ে বলেন যে, তিনি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত।[১২] একথা যে সত্য, তার প্রমাণ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্বীকারোক্তি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-কংগ্রেসে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিণাম নিয়ে রায় ও লেনিনের মধ্যে স্পষ্টতই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো। মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করতেন—"If the nationalist movement succeeded under the leadership of the bourgeoisie, it would only mean transfer of power to the native ruling class : there would be no social revolution."[১৩]

এই দুটি মতামতের পিছনের কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো কেন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা দুটি মতে বিভক্ত হয়ে দেশোদ্ধারের জন্য তাঁদের মতকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, বিশেষ করে, ১৯১৫-১৯১৬ সালে ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদী-বিপ্লব-সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে, পরিণত হয়েছিলো। বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই 'সময়ের' বিশ্লেষণ করে লিখেছেন…"ইংরেজ ও দেশী সেনাবাহিনী প্রায় বেশীর ভাগই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বৈপ্লবিকেরা অস্ত্র হস্তে চেষ্টা করিলে দেশের মধ্যে তুমুল ব্যাপার করিতে পারিতেন। বাহির হইতে অস্ত্র না হয় পৌঁছাইল না, কিন্তু দেশে ত অস্ত্র ছিল।"[১৪] কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের সেই সময়কার বুর্জোয়া-নেতৃবৃন্দের

সহায়তা পেলেন না। বিপ্লবের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিপজ্জনক জ্ঞান করে তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র-সংগ্রামে নামতে সাহস পেলেন না এমন কি জনগণকেও সে পথে যেতে বাধা দিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনেও তাঁদের তেমন গরজ ছিলো না। ইংরেজকে তুষ্ট রেখে তাঁরা 'স্বায়ত্ত-শাসনে' খুশী হতে চেয়েছিলেন। ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময়ের ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী জননেতাদের চরিত্র ও লক্ষ্যের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন : "যুদ্ধের সময় দেখা গেল, রাজার দল 'সাম্রাজ্য' বাঁচাইতে ইংরেজের সঙ্গে মিলিল, আর বুর্জোয়ার দল, যাঁহারা এতদিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত 'থেওথোয়' করিতে ছিলেন, তাঁহারা এক রাজনৈতিক চাল চালিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা বিপবের পতাকা উড্ডীন না করিয়া 'রাজভক্ত' সাজিয়া গভর্ণমেণ্টের সবপ্রকার সহায়তা করিতে লাগিলেন। বুর্জোয়া-শ্রেণী আশা করিয়াছিল যে, এই খয়ের খাঁ গিরির বিনিময়ে 'স্বায়ত্ত-শাসন' পাইবেন। যুদ্ধাবসানে স্বায়ত্ত-শাসন মিলিল না বলিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে বুর্জোয়ার দল 'অসহযোগী আন্দোলন' করিতে লাগিলেন।"[১৫]

ভারতবর্ষে বিপ্লবী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সংখ্যা কম ছিলো না, কিন্তু, তবু তাঁরা ইতিহাসের মহত্তম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারতবর্ষে জাতীয়-বিপ্লব করতে ব্যর্থ হলেন কেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। এর উত্তর বিপ্লবী ভুপেন্দ্রনাথ দত্তই বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন : "বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাবাদের মর্মও বুঝে নাই এবং তদনুযায়ী কর্মের সহিত সহানুভূতি দেখায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে জাত-কর্ম-বিভাগ রীতি বর্তমান বলিয়া রাজনীতি যেন একপ্রকার কর্ম-বিভাগ এবং ইহা একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্তব্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিপ্লব-পন্থা আরও অস্পৃশ্য ব্যাপার। এইজন্য সমাজ ইহাদের সহানুভূতি দেখায় নাই। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবপন্থা গুপ্ত সমিতিতে আবদ্ধ। জনসাধারণ বা গণসংঘকে কখনও কেহ স্বাধীনতার বার্তা দেয় নাই। কেহ কখনও তাহাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয় নাই। এইজন্য তাহারাও বিপ্লববাদের চেষ্টায় নির্গুণ অবস্থায় ছিল।"[১৬]

অন্যদিকে এই বিপ্লব-ভীরু বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঐ 'নির্গুণ' জনগণকে নানা আশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের পক্ষে রাখতে পেরেছিলেন। কম আত্মত্যাগ, কম কষ্ট স্বীকারের বিনিময়ে তাঁরা জনগণকে প্রথমে 'স্বায়ত্ত-শাসন', 'দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট', 'হোমরুল' ও 'স্বরাজ'-এর আশা দেখিয়েছিলেন। সেই স্বরাজ না আসাতে তারা অগত্যা ইংরেজের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন' সংগঠিত করার জন্য জনগণকে ডাক দিলেন। অথচ ১৯২২-২৭ সালের জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক দিক থেকে পরিবর্তিত ভারতীয় গণ-মানুষের প্রভাব যথেষ্টই পড়েছিলো। ফলে জাতীয়-কংগ্রেসের কাজকর্মে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণের ও জনগণের মধ্যে কংগ্রেস কর্মীদের আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ

করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছিলো। কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল অংশের উপর নিশ্চিতভাবে লেনিনের শিক্ষা ও অক্টোবর-মহাবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার কার্যকারিতার সুফল তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে বদলে দিয়েছিলো। ১৯২৭ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর রুশিয়া ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। রুশ-বিপ্লব এই তরুণ যুবকটিকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো।[৭] কিন্তু তবু কংগ্রেস জনগণের প্রত্যাশাকে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করতে পারলো না।

আমরা জানি, অবশেষে এই বুর্জোয়া-নেতৃবৃন্দই ভারতবর্ষের তথাকথিত 'স্বাধীনতা' এনে দিলেন। এনে দিলেন বলা ঠিক নয়, বলা ভালো ইংরেজ এই 'শ্রেণীর' হাতে 'স্বাধীনতা' তুলে দিলেন। ভারতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই বুর্জোয়া-শ্রেণীই সমাজে ক্ষমতাশালী ও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে লেনিন যতই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদীদের 'মত'-এর সঙ্গে একমত হন 'ইতিহাস' কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতামতের সঙ্গেই বেশি মিলে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী-জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পিছনে যদি জনগণের অপরিসীম শক্তি এসে যুক্ত হতো তাহলে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা যেতো। লেনিন সেজন্যই বোধ করি ২৬শে অগাস্ট ১৯২১ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর চিঠির জবাবে এই উত্তর লেখেন যে "ঔপনিবেশিক প্রশ্নে আমাদের আমার নিবন্ধ অনুযায়ী চলা উচিত। ভারতবর্ষে কৃষক সমিতি থাকলে তাদের সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করুন।" [··" I think we should abide by my thesis on colonial question. Gather statistical facts about peasants' League if they exist in India."]

লেনিনের এই চিঠির তাৎপর্য ভেবে দেখবার মত। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী নেতাদের ইংরেজ-হটাও আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন নীতিগতভাবে : কারণ ১৯২১ সালে রুশিয়াতে বসে লেনিন হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে এই আন্দোলনকারীদের পিছনে বৃহত্তর জনগণের সমর্থন ছিলো না, সহায়তা ছিলো না। তিনি তথ্যগতভাবে শুধু এটুকু জানতেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই হচ্ছে কৃষক জনসাধারণ। তাই তিনি সঙ্গতভাবেই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতবর্ষের কৃষক-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন ওদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে। কৃষক-সমিতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে বলা মানেই বিপ্লবী নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে একটি কৃষি-প্রধান দেশে কৃষক-সমাজই হচ্ছে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি।

ঐ চিঠির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সেকথা বুঝতে অসামান্য তীক্ষ্ণধী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিলম্ব হয়নি। পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

লিখেছেন…"লেনিনের চিঠি লেখকের কাছে এক আশ্চর্য রহস্যোদ্‌ঘাটনের মতো হাজির হয়েছিলো। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে যে কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব আছে, একথা জাতীয় বিপ্লবীর কখনো খেয়াল হয়নি। জাতীয়তাবাদের প্রধান আশ্রয় হল হৃদয়াবেগ। মধ্যশ্রেণী নিজেকে মনে করে জাতির প্রতিভূ আর সব আন্দোলনকে দেখে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই। সুতরাং লেনিনের সামাজিক শ্রেণী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং কৃষক আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ার নির্দেশ লেখককে ভাবিয়ে তুলল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপায় ও পদ্ধতি বিষয়ে সে নির্দেশ রূপান্তর ঘটাল লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টির।"[১৯]

ভারতবর্ষের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী-নেতৃত্ব বৃহত্তর জনগণের সহযোগিতা পায় নাই বলে তাঁদের বিপ্লব-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো, অপর দিকে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগণকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত না করে তাদের দাবার গুটির মত ব্যবহার করেছিলেন নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তারা সাড়া দিয়েছিলো এবং সারা দেশকে উদ্বেল করে তুলেছিলো। কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাদের অধিকার গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন নি, আহ্বান করেছিলেন ধর্মের নামে। ধর্মপ্রবণ ভারতীয়-জনসাধারণকে ধর্মান্ধতার মোহে উত্তেজিত করা হয়েছিলো। তাদের নির্দিষ্ট দিনে স্বরাজের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলো। "এই লোকদের মনুষ্যের অধিকারসমূহ প্রত্যার্পণের আশ্বাস না দিয়া, স্বরাজে তাহাদের কি উন্নতি ও কোন স্থান নির্দিষ্ট হইবে তাহা না বলিয়া, সমাজে তাহাদের ন্যায্য দাবী পুরণের অঙ্গীকার না করিয়া, বুরজোয়া দল গণ-শ্রেণীর কেবল ধর্মান্ধতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া বিদেশী আমলাদের শাসন ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন। এই ধর্মান্ধতার দ্বারা রাজনৈতিক কার্য উদ্ধার করার বিষময় ফল সমাজ আজ বিশেষভাবে ভোগ করিতেছে। অন্যপক্ষে ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাকিস্তান রূপ দাবী পরে উদ্ভব হয়।"[২০]

ভারতবর্ষের জনগণের মানসিকতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক অনুতপ্ত বাঙালি-বিপ্লবী লেখেন "আমাদের দেশ মনুষ্যত্ব হিসাবে যত অধঃপতিত, পৃথিবীর সভ্যপদবাচ্য কোন দেশে এই প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা যত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশে তদ্রূপ হয় নাই। ভারতের জনসাধারণ কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে নাই, কাজেই তাহারা স্বাধীনতার নামে কিরূপে অকস্মাৎ চেতনা-শক্তি প্রদর্শন করিবে? হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গোলাম। তাহার জীবনের সর্বদিকই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি প্রকারে সে স্বাধীনতার মর্ম আস্বাদন করিবে?…জেহাদের নামে মুসলমান জাতি সাড়া দেয় নাই।"[২১]

ব্রিটিশ-যুগে ভারতবর্ষে বিপ্লব ও স্বাধীনতা অর্জনের এই দুই মত পথের বিশ্লেষণ সংক্ষেপে করা হলেও এ সত্যটি এই বিচার বিশ্লেষণের মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে

ওঠে যে, বিপ্লব-পন্থীরা জনগণের মধ্যে বিপ্লবচেতনাকে সঞ্চারিত করে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধিত হয়নি; অপরদিকে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-নেতৃবৃন্দ জনগণকে সঙ্গে পেয়েও তাদের স্বার্থের জন্য কাজ না করে নিজেদের রাজনৈতিক-সিদ্ধির সোপান তৈরির কাজে তাদের ব্যবহার করেছিলেন বলেই ভারতীয় জনগণের দুর্দশা আজও ঘুচলো না।

৪

পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম ও তার প্রেক্ষাপট

কিন্তু ভারতীয় জনগণকে নির্গুণ, রাজনৈতিক চেতনাহীন, বিপ্লবে-বিদ্রোহে অনাগ্রহী বলে চিহ্নিত করা অনুচিত। অথচ এই রকম একটি ধারণা বিভিন্ন মহলে প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা অনৈতিহাসিক। পরন্তু জনগণের সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, জনগণের লড়াই দীর্ঘদিন ধরে জনগণই লড়েছে। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরই মধ্য থেকে উঠে আসা সর্বহারা মানুষ। এ সংগ্রামে কোনো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-বিপ্লবী বা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেননি কিম্বা বলা চলতে পারে জনগণ এই শ্রেণীর মদৎকে অগ্রাহ্য করেছিলো। কিম্বা এমনও হতে পারে জনগণ বিপ্লবী বা জাতীয়তাবাদী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্নবিত্ত-নেতৃত্বকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। কেননা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে যাদের দ্বারা বা যাদের মাধ্যমে তারা শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে তাদেরকে বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর ফলে হয়তো জনগণের আন্দোলন যথার্থ বুদ্ধিদীপ্ত ও কৌশলী নেতৃত্বের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু তার জন্য তাদের দোষারোপ করা যায় না। এটাই অবশ্যম্ভাবী ছিলো।

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত এই বৃহৎ ভারতীয়-জনগোষ্ঠীকে যেভাবে মনুষ্যত্বহীন ও অধঃপতিত বলে ঘোষণা করেছেন সেই অধঃপতিত-শ্রেণীর, বিশেষ করে ভারতীয় কৃষক-সমাজের, ইংরেজ-বিরোধী লাগাতার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস কিন্তু ঐ প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যা বলেই ঘোষণা করে।

একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলা বোধ হয় সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যে ভারতীয়-সভ্যতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ পর্যন্ত 'জনসাধারণের ইতিহাস'কে স্বীকৃতি দেয়নি। ইতিহাসের উপাদান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণ রামায়ণ, মহা-

ভারত এবং অজস্র পুরাণ রচনা করলেও ইতিহাস লেখার কথা তাঁরা ভাবেননি। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হলেও জনসাধারণের ইতিহাস সেখানে উপেক্ষিত ছিলো। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-রাজশক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামো এবং ভিত্তি পর্যন্ত পাল্‌টে দিয়েছিলেন। সেই ইতিহাসে আর যাই থাক ভারতবর্ষ ও তার জনগণের কোনো ভূমিকাকে প্রায় স্বীকারই করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে[১] ইংরেজ রচিত এ ইতিহাসকে তাই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস বলতে অস্বীকার করেছিলেন। ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতি দিনের লড়াই, প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার বিবরণের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ নতুন ইতিহাস রচনার জন্য তিনি ভাবীকালের মানুষকে আহ্বান করেছিলেন।

অথচ প্রাচীন কাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের কৃষক-জনসাধারণের ইতিহাস ভূস্বামীগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে 'পুরানকথার' ঢক্কানিনাদে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিলো। পরবর্তীকালে ও বিশেষ করে ইংরেজ শাসনকালে জনসাধারণের সংগ্রামের ইতিহাসকে সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করার সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ভাগ্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের হাতে গড়ে উঠুক এটা যারা চাননি বা চাননা তাদের স্বার্থ বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষের মতো বিশাল একটি দেশের ভাগ্য মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ও গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে রচিত হতে পারে না। তাই দেখি এই সব বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী-বুর্জোয়া-নেতৃত্বে ভারতবর্ষ না পেরেছে সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করতে, না পেরেছে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শোষণ-মুক্তি ঘটাতে।

লেনিন বলতেন, যেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর যেখানে কেবল কয়েক হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের বাস, সেখান থেকেই আরম্ভ হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি। দুর্ভাগ্য আমাদের অক্টোবর-মহাবিপ্লবের এই শ্রেষ্ঠ-রূপকারের প্রত্যয় ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোনো শ্রেণীর নেতৃত্বই আত্মস্থ করতে পারেননি। ভারতীয় বুর্জোয়া-নেতৃবৃন্দ একসময় জনগণের একটি বৃহৎ-অংশের সমর্থন পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা জনগণের চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাহ্য না করে নিজেদের রাজনীতিকেই জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে একসময় জনসাধারণ তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি দেখে নিজেদের ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন ঐ নেতৃত্বের নাগপাশ থেকে। মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া-নেতৃত্ব যে তাদের সর্বাত্মক কল্যাণ করতে পারবে না এটা ভারতবর্ষের অধঃপতিত জনসাধারণ বুঝতে পারছেন বলেই হয়তো তারা দেশের

ভবিষ্যৎ ও নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন। আর আমরা তাদের ভুবছি মনুষ্যত্বহীন জনগোষ্ঠী বলে !!

যাই হোক আমরা দেখেছি, পরাধীন ভারতবর্ষের দুশ বছরের ইতিহাসে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ত্রি-ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সর্বহারাদের লড়াই, সর্বহারা নেতৃত্বে চলেছে ; বিপ্লবীদের লড়াই লড়েছেন দেশ-বিদেশের ভারতীয় শিক্ষিত বিপ্লবীরা ; আর স্বদেশে লড়েছেন জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা, এই তিন-শক্তি কখনোই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সমন্বিত হতে পারেনি।[২]

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে কৃষক-বিদ্রোহের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ঐ কৃষকদের লাগাতার সংগ্রামের ইঙ্গিত করে এই কথাটি প্রতিপন্ন করা আমার লক্ষ্য যে, অক্টোবর-মহাবিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক-বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি কেন ? অক্টোবর মহাবিপ্লবের শিক্ষা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের বৃহত্তর অংশ ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাউকে কাউকে উদ্দীপ্ত করলেও তাঁরা সেই শিক্ষাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তাঁরা বরাবরই কোটি কোটি ভারতবর্ষীয় সাধারণ জনগণের লড়াই-এর ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে ছিলেন। ভারতবর্ষের জনগণের সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে তাঁরা আগ্রহী হননি, ইংরেজ রাজশক্তিও সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে যথাসাধ্য চাপা দিতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি ভারতবর্ষীয়-জনগণ সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই ধরে নেওয়া (Preconceived) একটি হীন ধারণা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের রক্তের গভীরে নিহিত ছিলো।

নইলে ১৭৬৩-১৮০০ সাল পর্যন্ত বাঙলা দেশ ও বিহার প্রদেশে কৃষক ও কারিগরদের বিদ্রোহ, যা সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত তার ইতিহাস আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলো না কেন ? পরন্তু যামিনীমোহন ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকেরা ইংরেজদের যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রাবলী ও রেকর্ডের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছিলেন যে এই বিদ্রোহ ছিলো বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির দস্যু-ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীর উপদ্রব মাত্র। অথচ সে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ প্রমাণ করে যে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলা ও বিহারের কৃষকরাই বিদ্রোহ করেছিলো, বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়ন হতে কৃষকদের জীবন রক্ষার জন্য।[৩] এই দীর্ঘ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন মজনু শাহ, মুশা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও কৃপানাথ নামের সাধারণ গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা।[৪]

এইরকমভাবে কৃষক-বিদ্রোহ মেদিনীপুরে চলেছিলো ১৭৬৬-৮৩ সাল পর্যন্ত। এই লড়াই-এ সামিল হয়েছিলেন বাগদী, বড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়াড় প্রভৃতি আদিবাসী কৃষক-সম্প্রদায়। ত্রিপুরাতে কৃষক-সন্তান সমশের গাজীর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ চলেছিলো ১৭৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত। তাঁর হাতে ত্রিপুরার রাজা বারবার

পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজধানী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সামশের-এর রাজত্বে তার প্রজারা সুখেই কাটিয়েছিলেন। অবশেষে ত্রিপুরার রাজার অনুরোধে বাঙলার নবাব মীরকাশেম সামশেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করে সামশেরকে প্রথমে বন্দী ও পরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

এইভাবে ক্রমান্বয়ে সন্দীপ (১৭৬৯), ঢাকা, শান্তিপুর ও বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে 'কৃষক তন্তুবায়গণের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০)', পার্বত্য চট্টগ্রামের 'চাকমা বিদ্রোহ' (১৭৭৬-৮৭), বিহার বাঙলা দেশে নীলচাষীদের সংগ্রাম, (১৭৭৮-১৮০০) মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে লবণশিল্প শ্রমিক ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০৪), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এবং আরও অজস্র বিদ্রোহে-সংগ্রামে দেশীয় সামন্ত, রাজা, নবাব ও পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের কৃষক ও আদিবাসী কৃষক-সমাজ। এরপরে ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে আমরা মনুষ্যত্বহীন অদৃষ্টবাদী ভীরু বলি কি করে?

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর দীর্ঘদিনের লাগাতার সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাসের অতি-সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে শুধু এই কথাটি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে চাই যে মহামতি লেনিন কেন ১৯২১ সালে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতবর্ষে কৃষক-সমিতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন? কেন তিনি কট্টর-কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-নেতৃত্বে কেবল শোষক-শ্রেণীর বদল ঘটবে মাত্র এই বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেননি? পরন্তু কেন তিনি জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐক্যমতে এসেছিলেন তাও বুঝতে পারি।

লেনিন ভারতবর্ষে না এলেও তথ্যগতভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু সংবাদ তাঁর জ্ঞাত ছিল। তিনি এটুকু জানতেন যে ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ এবং এখানকার হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যাব সিংহভাগ গ্রামেই বসবাস করে। ভারতবর্ষের কোনো আন্দোলনই এই শ্রেণীর অংশ গ্রহণ ছাড়া সফল হতে পারে না।[৫] লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর শ্রেণী-চরিত্র যাই হোক তাঁর নেতৃত্বে যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মানুষের এক বৃহৎ অংশ সংঘবদ্ধ হয়েছে এটা ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর আন্দোলনে ভারতীয়-জনগণের শোষণমুক্তি ঘটেনি পরন্তু তাদের আশাভঙ্গ হয়েছে এটাও সত্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের বা কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব ভারতবর্ষের জনগণের বৃহত্তম অংশকে তাদের সপক্ষে আনতে পারেনি। বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে'র পরবর্তী দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামের শিক্ষাকে অন্তরের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রমাণ মিলবে সন্ত্রাসবাদীদের দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালীর কঠোরতা, যশের প্রতি উপেক্ষা, আত্মত্যাগ, অখ্যাত, অজ্ঞাত থেকে

নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুবরণের হাজার হাজার দৃষ্টান্তের মধ্যে। কিন্তু তাদের এই আত্ম-ত্যাগ যতই মহৎ হোক, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য তা ফলপ্রসূ-বিপ্লবের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

এই ঐতিহাসিক সত্যকে অক্টোবর-বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয়-তাবাদী বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট-নেতৃবৃন্দ ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে লেনিনের মতবিরোধ ও সেই সঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে প্রেরিত তাঁর চিঠির সুদূর প্রসারী ইঙ্গিতের অর্থ অনুধাবন করা আমাদের প্রয়োজন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব থেকেই প্রবাসী-ভারতীয় বাঙালী কমিউনিস্ট-বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবীরা দ্বিতীয় বিশ্বমহা-যুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত যে ব্যাপক কর্মতৎপরতায় নিজেদের ব্যাপ্ত রেখেছিলেন তার একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিলো ভারতবর্ষের সশস্ত্র-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জনগণের শৃঙ্খলমুক্তি ঘটানো। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লব এই পর্যায়ে তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪) অনেক ভারতীয় ও বাঙালী বিপ্লবী অবশ্য ভেবেছিলেন যে ইংরেজের শত্রু জার্মানদের সহায়তায় ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। কিন্তু সেই স্বপ্ন, যুদ্ধের পরবর্তী কয়েকটি বছরেই হতাশায় পরিণত হয়েছিলো আমরা তা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছি। তখন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিলো রুশ-দেশের অভিনব বিপ্লবের দিকে। তাঁদের অনেকেই ছুটেছিলেন রুশিয়ায়। মিলিত হয়েছিলেন বিপ্লবের সার্থক রূপকারদের সঙ্গে। অনেকেই দীক্ষিত হয়েছিলেন কমিউনিজমের আদর্শে। বিশ্ববিপ্লব-সংঘটন ও কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিকের নানা দায় দায়িত্বও তাঁদের অনেকের উপর বর্তেছিল আমরা দেখেছি। প্রবাসী-ভারতীয় ও বাঙালী-কমিউ-নিস্টদের সম্পাদিত নানা পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র গোপনে ভারতবর্ষে এসে পৌছতো এবং কিছু কিছু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তা কিছু সংখ্যক উদ্যোগী মানুষের কাছে পৌছে যেতো।[৬]

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো বিপ্লবী যিনি একদিন অস্ত্রের সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হন্যে হয়ে ফিরছিলেন এই আশায় যে ঐ অস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নির্মূল করবেন। তিনিও ১৯১৭ সালের পর প্রভূত ক্ষমতা ও কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিকের প্রভাবশালী নেতা হয়ে ভারত-উদ্ধারের উদগ্র কামনায় প্রচুর অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে এসে পৌছেছিলেন। কিন্তু সেই অস্ত্র ও অর্থ ভারত-উদ্ধারের জন্য ব্যবহার না করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন তাঁর ব্যাখ্যা তিনিই দিয়ে-ছেন "···I discovered that it was useless to search for arms before there were people ready to bear them. I was sure that if the resources I had at my disposal in Central Asia

could be taken to the Indian frontiers they would most probably be seized by the enemy or misused by mercenary adventures or otherwise lost."[৭]

প্রবাসে বসবাসকারী ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী-জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও কমিউনিস্টরা অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সুফল স্বচক্ষে দেখেছিলেন ও সর্বহারা-বিপ্লবের গভীর তাৎপর্যকেও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ও গভীর-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অক্টোবর-মহাবিপ্লবের দেশকে যাঁরা চাক্ষুষ করেননি পরন্তু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনসরের কড়াকড়ি, অকথ্য কুৎসা প্রচার এবং শাসন-তর্জনের মিশ্র নির্ঘোষের ঘনঘটার মধ্যে—সেই সমস্ত ভারতীয়-দের কাছে, অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংবাদ ঠিকঠাক এসে পৌছয়নি। ফলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও নানা দোটানায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাই অক্টোবর-বিপ্লবের দীর্ঘকাল পরে তিরিশের দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কবি বা মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানী রুশিয়ায় যান তখন ঐ দেশটি সম্বন্ধে তাঁদের দ্বিধা সংশয় দূর হয়নি আমরা দেখেছি। (পূর্বেই বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে)।

এক্ষেত্রে একটি কথা সব সময়ই স্মর্তব্য যে, প্রবাসী-ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট-বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের মুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের চেষ্টা ভারতবর্ষে ফলপ্রসূ না হলেও তাঁদের অবদান ও আত্মত্যাগের কথা ভুলে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, ভারতের 'কমিউনিস্ট-পার্টি' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রবাসী-কমিউনিস্টদেরই উদ্যোগে, অবশ্য ভারতবর্ষের মাটিতে নয়, তাসখন্দে। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর। এই পার্টির প্রথম ৭জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন বাঙালী। মানবেন্দ্রনাথ রায়, এভেলিন ট্রেন্ট রায় (শান্তি দেবী) ও অন্যজন অবনী মুখার্জী। বলা বাহুল্য প্রথম 'কমিউনিস্ট পার্টির' সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বয়ং।[৮]

১৯২১ সালের ১লা ডিসেম্বর মানবেন্দ্রনাথ ও অবনীনাথের যুক্ত-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে রচিত 'কমিউনিস্ট-পার্টির' প্রথম 'ইস্তেহার'। শুধু তাই নয়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ১৯২২ সালের ১৫ই মে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা 'The Vanguard of Indian Independence'। কিছুদিন পরে এই পত্রিকার নাম করা হয় প্রথমে 'Advance Guard' ও তার পরের বছরে শুধু 'The Masses of India'। শেষের পত্রিকাটি অবশ্য প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে। তাছাড়া অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারও বার্লিন থেকে 'বার্লিন কমিটির' মুখপত্র 'Indian Independence' পত্রিকা বের করতেন। রজনীপাম দত্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশ করতেন

'Labour Monthly'। এই সব পত্রিকার কিছু কিছু সংখ্যা সহজপথে না এলেও গোপন পথে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছতো।

অক্টোবর-মহাবিপ্লব রুশদেশে শ্রমিক-কৃষকদের হাতে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলো এ খবর নানা সূত্রে ভারতবর্ষে পৌঁছে একটা সময়ে ভারতবর্ষে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলো। ১৯১৮ সালেই নিজেদের দুঃসহ শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত জীবনকে রাতারাতি বদলে ফেলার সংকল্প নিয়ে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী নানা শিল্পাঞ্চলকে ধর্মঘটে অচল করে দিয়েছিলো। তখন ভারতবর্ষে সবচেয়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল 'কংগ্রেস'। এই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীর ঐ বিপুল জাগরণকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নতুন মাত্রা ও শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারলেন না। ১৯১৯ সালের ৯ই এপ্রিল ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ড। এর প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী হলো। দেশ জোড়া বিক্ষোভ সংঘটিত হলো। ব্রিটিশ বিরোধী নানা সভা সমাবেশ ও প্রতিবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্প শহরের শ্রমিকদের উন্মত্ত করে তুললো। এই কেন্দ্রগুলি হলো বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর ও আহমেদা-বাদ। ১৯১৯ সালেই মহাত্মা গান্ধী তাই সত্যাগ্রহের তৎপরতা বন্ধ করে ছুটে এলেন দিল্লী থেকে আমেদাবাদে বিদ্রোহী শিল্পশ্রমিকদের শুধু এই কথাটুকু বোঝাতে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যেন রাজনৈতিক ধর্মঘটের মতো জঙ্গী আন্দোলনের পথে না যায়। অথচ এই শ্রমিক-বিক্ষোভকে দেখে লেনিনের বিশ্লেষণ হলো ভিন্ন। তিনি লিখলেন "British India is at the head of these countries, and there revolution is maturing in proportion, on the one hand, to the growth of the industrial and railway proletariat, and on the other, to the increase in the brutal terrorism of the British…."[৯]

গান্ধীজী জানতেন ভারতবর্ষের কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে গড়া ওঠা এই আন্দোলনকে যদি জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করে তাহলে গান্ধীজীর তথাকথিত 'জাতীয়-ঐক্যের' শ্লোগান তাসের প্রাসাদের মতো ধসে পড়বে। কেননা গান্ধীজীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যকে জোরদার করতে তখন ভারতবর্ষের বৃহৎ পুঁজিপতিরা অর্থ জোগান দিচ্ছিলেন এবং সেই সঙ্গে মহাত্মার ধর্ম-প্রভাবিত রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তাঁর উপরে ন্যস্ত জনগণের বিশ্বা-সের মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর লড়াই-এর সদিচ্ছা মধ্যযুগীয় মানসিকতার অধিকারী ভূস্বামীদের সমর্থন লাভ করেছিল।[১০]

গান্ধীজী ভারতবর্ষের শ্রমজীবী-শ্রেণীকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করাতে আগ্রহী ছিলেন যে তারা যেন তাদের মালিকশ্রেণীকে শোষকশ্রেণী বলে না ভেবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত গণ্য করে। তাদের কাছে দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এবং

তা যেন কখনো জঙ্গী আন্দোলনের রূপ না পায়, কেননা তাহলে পুরাণ-কথিত ভারতীয় বৃহৎ-পরিবার বা সমাজের ভিত্তিভূমিটি ধসে যেতে পারে।

তিনি ভারতীয় কৃষক-সমাজকে বুঝিয়েছিলেন যে ভূস্বামীরা তাদের স্বার্থরক্ষার অব্যর্থ কবজ। তাই তিনি কৃষকদের ভূস্বামীদের খাজনা প্রদান না করার আন্দোলনকে নিন্দা করেছিলেন। এইভাবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন ভারতবর্ষে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব সঞ্চারণের সমস্ত প্রবেশ পথগুলিকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছিলো। অবশ্য জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধতাকে লক্ষ্য করেই গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯ সালে অমৃতসহরে ডাকা এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে 'ট্রেড-ইউনিয়ন' গড়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯২০ ও ১৯২১ সালের মধ্যে ধর্মঘটের পর ধর্মঘটে ভারতবর্ষের ৪ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ শ্রমিক জড়িত হয়ে পড়লো। শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ফলে এই পর্যায়ে শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা সুদৃঢ় হতে আরম্ভ হয়েছিলো ফলে বোম্বে, জামশেদপুর ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে নানা সংহতি-সূচক ধর্মঘট শ্রমিক সংহতিবোধকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছিলো। শ্রমিকদের এতদিনকার দাবি-দাওয়ার অর্থ নৈতিক আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলো। এমনকি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ বাগিচা-শ্রমিকরাও সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করেছিলো। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা-বাগিচাগুলি অন্তত ১২ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটের ফলে ভয়ংকর ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো।

এই আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলগুলিতে যেখানকার মানুষদের মনে ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি তখনো উজ্জ্বল। ফৈজাবাদ ও রায়বেরিলী অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভ প্রথম ফেটে পড়েছিলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেই শ্রেণীর মধ্য থেকেই তাদের আন্দোলনের নেতৃত্বদানের উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ জন্মাতে শুরু করেছিলেন। ১৯২১-২২ সালে উত্তর-প্রদেশের অযোধ্যা জেলার কৃষকরা সশস্ত্র-আন্দোলনের সামিল হয়েছিলো। তারা ভূস্বামী-তালুকদারদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সমস্ত রকম আক্রমণের সামনে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুই বিখ্যাত কৃষক-নেতা পাশি মাদারি ও সহরাব।

এইভাবে কৃষক-বিদ্রোহ পাঞ্জাবে মোহান্তদের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠলো। কেরালাতে মোপ্‌লা কৃষক-সমাজ অভ্যুত্থানের সামিল হলো। এই আন্দোলনে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মোপ্‌লা-কৃষকদের সঙ্গে তাদের কিছু কিছু ধর্মীয় নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। যদি এই অভ্যুত্থান মূলত ছিল হিন্দু-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষক-সমাজের অভ্যুত্থান কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে ছিল সামন্ততন্ত্র ও উপ-

নিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই মোপ্‌লা-বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন দুজন স্থানীয় মুসলমান আলী মুসালিয়ার ও কুন্নি আহমেদ কাজী।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো। তারা পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে এই অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। মোপ্‌লারা গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়েও অবশেষে দক্ষ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত হলো। ত্রিশ হাজারেরও বেশী মোপ্‌লা কৃষক বন্দী হলো।

অথচ আশ্চর্য! ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস মোপ্‌লা কৃষকদের এই দৃপ্ত সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালো। জাতীয়-কংগ্রেসের এই নিন্দা-প্রস্তাবে 'খিলাফৎ আন্দোলনে'র নেতারাও গলা মেলালেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয়-কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানকে নিন্দা ও অগ্রাহ্য করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

অথচ ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিলো, এদের সম্মিলিত আন্দোলন অবিশ্বাস্য শক্তি অর্জন করতে আরম্ভ করেছিলো। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বাড়ছিলো এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ জনগণের মহাসমাবেশ ঘটতে আরম্ভ করেছিলো। তার ফল ফললো ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্‌সের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে। বোম্বের শ্রমিকরা সেই দিনটি রাজনৈতিক ধর্মঘটে অচল করে দিলো। মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরও ধর্মঘট ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলো।

বোম্বে-শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভকে মহাত্মা গান্ধী নিন্দা করে আবার প্রমাণ করলেন যে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, ধর্মঘট ও প্রতিবাদকে সমর্থন করে না। গান্ধীজী ও জাতীয়-কংগ্রেস বিশ্বাস করতেন যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ণ স্বরাজ আসবে।

অথচ, সমস্ত ভারতবর্ষের অধিকাংশ শ্রমিক-কৃষক তখন সশস্ত্র-বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। চারপাশে বিপ্লবের ক্ষেত্র অবারিত। অহিংস অসহযোগের সাফল্যের ব্যাপারে অন্ধ-বিশ্বাসী জাতীয়-কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাই 'চৌরিচেরা'য় উন্মত্ত কৃষকদের দ্বারা ইংরেজ সরকারের পুলিস-নিধনের ঘটনাটিকে ইতিহাসের ভুল পরিপ্রেক্ষিতে থেকে দেখে শঙ্কিত হলেন। অহিংস আন্দোলনের জাত গেল—এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী থানা আক্রমণকারী কৃষক-বিপ্লবীদের তীক্ষ্ণ ভাষায় নিন্দা করলেন এবং দেশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালাবার জন্য মানসিক দিক প্রস্তুত নয় এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দেশ-জোড়া ব্রিটিশ বিরোধী-আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। উপরন্তু তিনি

'চৌরি-চেরায়' নিহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারবর্গকে গভীর দুঃখে সমবেদনাও জ্ঞাপন করলেন।

কয়েকটি মানুষের মৃত্যুর জন্য ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখবোধে বিচলিত হয়ে যে-নেতৃত্ব দেশ-জোড়া ব্যাপক অভ্যুত্থানের সুবর্ণ-সুযোগকে হেলায় অগ্রাহ্য করে সে দেশে বিপ্লব-সাধন যে কী দুঃসাধ্য তা সহজেই অনুমান করা যায়। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটি ও 'বরদোলৈ' অধিবেশনের সদস্যরাও সমর্থন করলেন। তাদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। এই অধিবেশনে কৃষকদের আন্দোলনকে কবরে পাঠিয়ে ভূস্বামীদের জন্য অজস্র সহানুভূতি সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।[১১]

অক্টোবর-বিপ্লবের যে বাণী ১৯১৭ সালের পর ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকদের কাছে এক স্বপ্নের জগতের ছবি উন্মোচিত করে দিয়েছিলো তা ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসের নিরন্তর অসহযোগিতা ও নিন্দাবাক্য উচ্চারণ, ব্রিটিশ রাজশক্তির অকথ্য দমন পীড়নে পুনরায় অন্ধকারে তলিয়ে গেলো। ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষকরা যে অক্টোবর-বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস জানতো তা নয়, কিন্তু তাদের অনেকেই এটুকু জেনেছিলো যে সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকরাই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। এবং সে অধিকার তারা সংগ্রাম ও অস্ত্রের লড়াই-এ অর্জন করেছে। তাদের কাছে কোনো বিপ্লবী-তত্ত্ব ছিলো না, যথার্থ শিক্ষিত নেতৃত্ব ছিলো না, ছিলো শুধু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির ব্যাপক শোষণ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের হাত থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত হবার উদগ্র আকাঙ্খা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইচ্ছে করলেই এই কোটি কোটি দেশ-প্রেমী, নির্ভীক, স্বভাব-বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষককে রাজনৈতিক-শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারতেন। কিন্তু এই বিপ্লবের পন্থায় তাদের কোনো আগ্রহ ছিলো না। রক্তপাত, হত্যায় তাদের দারুণ অনীহা ছিলো। তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ-স্বরাজের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। সবাইকে তুষ্ট করে, তোষামোদ করে, কিছু রক্তপাতে, ও কিছু কষ্ট স্বীকারে তারা যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সে 'স্বাধীনতা' ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্টে তারা পেয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনগণ, কৃষক ও শ্রমিকরা কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র লড়াই-এর ইতিহাস রচনা করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস, খিলাফৎ-আন্দোলনকারী, জাতীয়-বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ যদি যথার্থভাবে তাদের নেতৃত্ব দিতেন তাহলে হয়তো ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই ভারতবর্ষে সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতো পারতো।

দেশের শ্রমিক-কৃষকদের এই জঙ্গী আন্দোলনকে সমর্থন না করায় ভারতীয়

জাতীয়-কংগ্রেসের সামনেও নানা সংকট দেখা দিলো। ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিকালে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের 'বরদোলৈ' সিদ্ধান্ত-সমূহ ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সমস্ত স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করলো। কংগ্রেস অনুমোদিত নানা সংগঠনে এর বিরুদ্ধে জনমত ও বিক্ষোভ প্রবল হলো। এর ফলে ভারতবর্ষের বামপন্থী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পেলো এবং বে-আইনী গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো।

১৯২১-২৩ সালের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেলো। ১ লক্ষ থেকে তিন বছরের মধ্যে সদস্য সংখ্যা সীমিত হয়ে গেলো কয়েক সহস্রের মধ্যে। জনগণ থেকে কংগ্রেস অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

৫

ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়-কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যাবলী যখন কংগ্রেসের ভিতরে তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, দেশের সংগ্রামী জনগণ যখন চরম রাজনৈতিক হতাশায় ভুগছে, ব্রিটিশের দমন পীড়ন যখন বেড়ে চলেছে তখন ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা সংঘবদ্ধ হবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন দেশজোড়া এই রাজনৈতিক শূন্যতার (Vacuum) পূর্ণ সুযোগ তাদের গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধির সেই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। ভারতীয় কমিউনিস্টরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৎপরও হয়ে উঠেছিলেন। এই পর্বেই রুশিয়ায় সংঘঠিত অক্টোবর-মহাবিপ্লবের বিস্তৃত খবর ভারতবর্ষে এসে পৌছতে শুরু করেছিলো, নবজাত সোভিয়েট-রাষ্ট্রের জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক-অধিকার-বিষয়ক সনদ-পত্রগুলির বয়ান ভারতীয় কমিউ-নিস্টদের কাছে জ্ঞাত হতে আরম্ভ করেছিলো। নবগঠিত কমিণ্টার্ণের তৎপরতা ও বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়-কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়েব চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম 'মার্কসিস্ট সার্কেল' তৈরি হবার ভূমি প্রস্তুত করেছিলো।

এই সূচনাপটে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের রচিত একটি ছোট বই 'গান্ধী ভার্সাস লেনিন' ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়ে ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটালো। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতাদর্শকে তীব্র সমালোচনা করা হলো। পাশাপাশি দেখান হলো লেনিনের সংগ্রামী নেতৃত্বের চরম রাজনৈতিক সাফল্য। গান্ধী না লেনিন কার নির্দেশিত পথ ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনগণের শোষণ

মুক্তি ও নতুন রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক সেটা বুঝতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ঐ গ্রন্থটি ভয়ংকরভাবে সাহায্যে করেছিলো। তাছাড়াও ডাঙ্গে-সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'স্যোসালিস্ট' ধারাবাহিকভাবে মার্কস ও লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে ভারতীয় মার্কসবাদীদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে আরম্ভ করলো ১৯২২ সাল থেকেই। এই পত্রিকার মারফৎ অক্টোবর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট-রুশিয়ার নানা সংবাদাদি ভারতীয় মার্কসবাদীদের জানা হতে থাকলো ও সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নানা দিক ও সার্থকতার নানা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে থাকলো।

এই সব তৎপরতার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে 'মার্কসিস্ট গ্রুপ' গড় উঠতে আরম্ভ করলো। সৌকত উসমানি বেনারসে, গুলাম হুসেন লাহোরে, সিঙ্গারভেলু চেটিয়ার মাদ্রাজে ও মুজফ্ফর আহমেদ অবিভক্ত বাঙলাদেশে 'মার্কসিস্ট গ্রুপ' গড়ে তুলেছিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন অনেক মার্কসিস্ট সার্কেলও গড়ে উঠেছিলো। ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের এই গ্রুপ ও সার্কেলগুলির মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা হলো। বিদেশের ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হলো। এই সব গ্রুপ ও সার্কেলের পরবর্তী চিন্তা দাঁড়িয়েছিলো কি করে পরস্পরের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে তোলা যায়।

এই তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেবার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টাও অব্যাহত থাকলো। ১৯২২-২৩ সালে বিদেশে ভারতীয়-বিপ্লবীদের মদৎ দেবার অপরাধে সদ্য দেশে প্রত্যাগত 'মুজাহিরদের' বিরুদ্ধে 'পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা' আর ১৯২৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 'কানপুর মামলা' তৈরি করা হলো। বিচারে ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ ও উসমানি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ভারতীয় কমিউনিস্টরা 'বলশেভিক এজেণ্ট' একথা সরকারীভাবে ঘোষিত হলো। এই দমন-পীড়ন কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে আরো সংহত হতে উদ্দীপ্ত করলো।

১৯২৪ সালে সত্যভক্ত নামে কানপুরের একজন সাংবাদিক, ভারতবর্ষে বৈধ কমিউনিস্ট-পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন, যদিও এই পার্টি 'কোনোভাবেই' কমিণ্টার্ণ বা বিশ্বের অন্যান্য 'বিপ্লবী-কেন্দ্র'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো না। এই পার্টি-গঠনের ব্যাপারে অন্যান্য কমিউনিস্টদের অনীহা থাকলেও সত্যভক্ত এই পার্টি গঠন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মার্কসবাদী-গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯২৫ সালে কানপুরে চেটিয়ারকে সভাপতি করে সরকারীভাবে একটি 'ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টি' গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী-কমিটিতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মার্কসিস্ট-গ্রুপের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

'কমিউনিস্ট-পার্টি' গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে অন্তর্বিরোধ ঘনিয়ে উঠলো। ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টি 'কমিণ্টার্ণের' সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কিনা এটাই বিরোধের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো। সত্যভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে 'কমিণ্টার্ণের' অঙ্গ না করে তার 'জাতীয়-চরিত্র' গড়ে তুলতে চাপ দিলেন। ১৯২৬ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টির কলকাতার দ্বিতীয়-সম্মেলনে সত্যভক্তের নীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধীতায়, পরিত্যক্ত হলো। সত্যভক্ত 'পার্টি' ত্যাগ করে 'জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন করলেন।

এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টি 'কমিণ্টার্ণের' অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিশ্বের বিপ্লবী-তৎপরতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বা তদনুসারী কাজকর্ম চালাতে ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো। মনে রাখা দরকার 'কমিণ্টার্ণের' কার্যকরী-সমিতির নির্দেশেই গ্রেট-ব্রিটেনের 'কমিউনিস্ট-পার্টি' এই সংযোগ স্থাপন করেছিলো। ১৯২৫-১৯২৮ সালের মধ্যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-পার্টির বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এর পরেই ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট পার্টি' একটি বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগঠন হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করে।

ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট-পার্টি' গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সংহত কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পথ তৈরি হয়ে গেলো। কমিউনিস্ট-পার্টি, বিশেষভাবে, ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট-পার্টির কর্মীদের তৎপরতার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো।

এই সংহত ও সংগঠিত শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির উপর কারা নেতৃত্ব করবেন এই নিয়ে জাতীয় সংস্কারবাদী (National Reformist) কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী সমাজবাদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিলো। ১৯২৭ সালে All-India Trade Union Congress-এ এই নেতৃত্বের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। এই অধিবেশনে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেসের আমস্টারডামের আন্তর্জাতিক 'Yellow' ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে A.I.T.U.C.-র যুক্ত করার প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। একই সঙ্গে নাকচ হয় বামপন্থীদের ভারতীয়-কমিউনিস্ট পার্টির 'profintern' ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগে যোগদানের প্রস্তাবটিও। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জাতীয়-সংস্কারবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখনও সারা ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তবু এই সংগঠনের দু-একটি কমিটিতে দুজন কমিউনিস্ট (D. R. Thengadi ও Dange) যথাক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান ও সহকারী সাধারণ-সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি এরপর কৃষকদের সংগঠনগুলিকে শ্রমিকদের সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বিত করে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষক-শ্রমিকদের যুক্ত-

আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। পার্টি সর্বশক্তি দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে মদৎ দিতে থাকলো। ভারতবর্ষ থেকে জমিদারী ভূমি-ব্যবস্থাকে বাতিল করা ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে কৃষক-শ্রমিককে আন্দোলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে টেনে আনলো।

১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের দিনগুলিতে ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিকরা দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলো। কৃষিজাত পণ্যের দাম হু হু করে কমে গেলো। গমের দাম ও পাটের দাম যথাক্রমে শতকরা ৫০ থেকে ৬৫ ভাগ পর্যন্ত নেমে গেলো। পণ্যের বাজারে পণ্য দ্রব্যের দাম ক্রমাগত কমে যাবার ফলে হৃতসর্বস্ব কৃষকরা তাদের জমি-জমা অর্থমূল্যে মহাজন, ধনী কৃষক ও ভূ-স্বামীদের হাতে তুলে দিতে আরম্ভ করলো।

এর অবধারিত প্রতিক্রিয়া শহরগুলিতেও আছড়ে পড়লো। সেখানে অধিকাংশ কারখানা ও ছোট ছোট শিল্পকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেলো। ফলে ব্যাপকভাবে হলো শ্রমিক ছাঁটাই। এই সব অবনমন, ছাঁটাই ও নানা অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসান ঘটাতে ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-শ্রেণী দীর্ঘ আন্দোলনে সামিল হলো। ১৯২৯ সালে বোম্বাই-এর 'গিরনি কামাগর' দলের নেতৃত্বে বোম্বাই-এর সুতাকল-শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটে নামলো। সেই ধর্মঘট ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষের শিল্প-শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়েই চললো। অন্যদিকে কৃষক-সংগঠনগুলিও শক্তি অর্জন করতে থাকলো।

এই নবজাগ্রত কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রমাদ গুনলো। তারা ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ৩৩ জন বামপন্থী (১৪ জন কমিউনিস্ট সহ) শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে 'মীরাট ষড়যন্ত্র' মামলায় জড়িয়ে ফেললো। শাসকশক্তি এই নেতৃবৃন্দকে 'ইংরেজকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। চার বছর ধরে এই মামলা চলেছিলো। এই মামলার ফলে অভিযুক্তরা মুক্ত কণ্ঠে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক-নীতির সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক-সমাজবাদের স্বপক্ষে তাঁদের বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার সুযোগ পেলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভারতীয়-কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাদের রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ ও জাতীয়-কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে লড়াই চালাবার জন্য স্বদেশ ও বিদেশে 'স্পেশাল-কমিটি' গড়ে উঠেছিলো।

ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যখনই ভারতবর্ষে কোনো দল ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করার সন্ধিক্ষণে পৌছোয় তখনই নানা মতবিরোধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের অধিকার নিয়ে নানা ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সেই সুযোগকে নষ্ট করে দেয়। এই পর্যায়েও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা যখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিলো, সমাজবাদের আদর্শের কথা উচ্চ-

কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছিলো ; ঠিক তখনই গ্রেপ্তার না হওয়া বাকী নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত পদক্ষেপ ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলো।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'কমিণ্টার্ন'-পরিচালিত International Press Correspondence' ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টির উদ্দেশ্যে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়ে "Draft Platform of Action of the C.P.I." পুস্তিকা প্রচার করা হলো। সেই Draft-এ জানানো হয়েছিলো যে ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের উচিত সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা ও ভারতবর্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম করা।

কিন্তু C.P.I. বা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টি 'কমিণ্টার্ণের নির্দেশিত পথে যাবার কোনো আগ্রহ দেখালো না। এমনকি জাতীয়-কংগ্রেসের আহ্বানে তখন ভারতবর্ষে যে গণ-আন্দোলন চলছিলো তাতেও অংশগ্রহণ করলো না।

কমিউনিস্ট-পার্টির এই অন্তর্বিরোধ, দ্বিধাগ্রস্থতা ও দেশের বাস্তব পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অক্ষমতা ভারতবর্ষের বিপ্লবী-আন্দোলনকেও দুর্বল করে ফেললো।

তৎসত্ত্বেও ১৯৩০-১৯৩৩ সালে বৃহত্তম ধর্মঘটে জড়িত হয়েছিলো Great Indian Peninsular Railway-এর আট হাজারের বেশি কর্মী। এই ধর্মঘটে সুতাকল শ্রমিকেরাও সামিল হয়েছিলো। নেতৃত্বের আপোষকামী মনোভাব, ব্যাপক লক-আউট ঘোষণা, সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাস থাকা সত্ত্বেও এই জঙ্গী ধর্মঘট প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়েছিলো। এই ধর্মঘটকে অন্যান্য শাখার রেলকর্মীরাও সমর্থন জানিয়েছিলো।

ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর এই স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী আন্দোলনের সহায়তা পেয়েও ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস সেদিন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে বিবাদ করে ইতিহাসের মহত্তম সুযোগগুলিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। ১৯৩১ সালে ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা-অধিবেশনে বামপন্থী-কমিউনিস্টরা 'ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' পরিত্যাগ করার নীতি ঘোষণা করলেন। এর কারণ, কমিউনিস্ট-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ট্রেড-ইউনিয়ন-কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এই প্রশ্নে তীব্র মতান্তর যে, রেলওয়ে কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের পূর্ণ সদস্য বলে গণ্য করা হবে কি হবে না। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে কমিউনিস্টরা ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করে গড়ে তুললেন নিজেদের নিজস্ব শ্রমিক-সংগঠন 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন সেণ্টার'। এই সংগঠন সঙ্গে সঙ্গে Profintern-এর স্বীকৃতি লাভ করলো।

ভারতীয়-কমিউনিস্টদের ভুলভ্রান্তি এবার কমিণ্টার্ণ ও বিশ্বব্যাপী সুহৃদ কমি-

উনিস্ট পার্টিগুলির বুদ্ধি ও পরামর্শে কাটিয়ে ওঠার ঐতিহাসিক লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করলো। ১৯৩২ সালে 'কমিণ্টার্ণ' Open letter to the Communists of India পুস্তিকায় ভারতীয়-কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিলেন যে তারা জাতীয়-কংগ্রেস পরিচালিত দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে নিশ্চয়ই যোগদান করবেন এবং এইভাবেই গড়ে তুলবেন একটি ঐক্যবদ্ধ 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট'। এই নির্দেশ এসেছিল জার্মান, ব্রিটিশ ও চীনের কমিউনিস্ট-পার্টির সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনার ফসল হয়ে।

১৯৩৩ সালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির অধিবেশনে নতুন 'কেন্দ্রীয়-কমিটি' গঠিত হয়েছিলো এবং তারপর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী গণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে থাকলো। যখন ভারতবর্ষের বিপ্লবী-আন্দোলন ভাঁটার দিকে তখনই কমিউনিস্ট-পার্টি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে এই কথাটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমিক-সংগঠনগুলিতে কমিউনিস্টদের প্রভাব কমলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত 'কিষান-সভা'গুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস কৃষকদের ভিতরে কমিউনিস্টদের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে রোধ করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলো। এদিকে ১৯৩৪ সালের সুতিশিল্প-শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং তাদের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির তৎপরতায় সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ-সরকার 'কমিউনিস্ট-পার্টিকে' নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং ঐ পার্টি-প্রভাবিত ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকেও 'নিষিদ্ধ' করলেন। ফলে বাইরের দিকে পার্টির কাজ বন্ধ হলেও নানা গোপন কর্মকাণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ চলতেই থাকলো।

১৯৩৪ সালে 'সাইমন-কমিশনের' পরামর্শে ভারত-সরকারের New Government of India Bill, কেন্দ্রীয় আইন-প্রণেতা পরিষদে (Central Legislative Assembly) উত্থাপনের বিরুদ্ধে সমস্ত 'দল' ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো।

১৯৩৭ সালে সরকার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন-পরিষদগুলিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করলে ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক-নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছিলো।

এই নির্বাচনের প্রস্তুতি-পর্বে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী-সমাজবাদীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজবাদী-মোর্চা গঠনের সর্বাত্মক চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিলো। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে 'কমিণ্টার্ণের' ৭ম কংগ্রেসে রজনীপাম দত্ত ও বেন ব্রাডলীর উদ্যোগে ভারতীয়-কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিলো।

এই নির্দেশ ও পরামর্শের সুফল ফললো। ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট পার্টি' ১৯৩৬ সালে 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে' এই প্রথম এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে অতঃপর কমিউনিস্ট-পার্টি দল হিসেবে জাতীয়-কংগ্রেসে

যোগদান করবে। শুধু তাই নয় 'সারা ভারত কিষান-সভা'ও ঐ একই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। কিন্তু 'কংগ্রেস', কমিউনিস্টদের এই সিদ্ধান্তকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেনি। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী-সমাজ-বাদীরা 'কংগ্রেসে' ঢুকে পড়লেন। দেখতে দেখতে 'কংগ্রেসের' ভিতরে এই 'বামশক্তির' ক্ষমতা ও প্রভাব ভয়ংকরভাবে বেড়ে উঠলো। ১৯৩৬ সালে কংগ্রে-সের লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তাঁর নিযুক্ত কংগ্রেসের 'কার্যকরী-সমিতি'তে প্রতি ৩ জনে ১ জন বামপন্থী-দলের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলেন।

মনে রাখা প্রয়োজন জাতীয়-কংগ্রেসের ত্রিশের দশকের দুই বড় নেতা জও-হরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই সমাজ-পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁদের দুজনকেই যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিলো। তাঁরা দুজনেই রুশ-বিপ্লব ও বিপ্ল-বোত্তর রুশিয়ার কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন, শুধু তাই নয় তাঁরা স্প্যানিস, চীনা ও অ্যাবিসিনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামকেও অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করে-ছিলেন।

১৯৩৬ সালেই সারা ভারত 'ছাত্র ফেডারেশন', 'All India State Peo-ples Conference' এবং "সারা ভারত প্রগতি-সাহিত্য সংস্থা" গড়ে উঠে-ছিলো। এই সমস্ত সংস্থায় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবী সমাজবাদীরাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৭-১৯৩৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টিতেই জয়-লাভ করে 'প্রাদেশিক সরকার' গঠন করে। এই সরকার চালানোর অধিকার অর্জন করে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নানা অধিকারকে খর্ব করার জন্য কংগ্রেস সরকার নতুন শ্রম-নীতিকে আইনে পরিবর্তিত করতে গেলেই কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত এই নিষিদ্ধ ও আত্মগোপনকারী 'কমিউনিস্ট-পার্টি' অজস্র অসুবিধার মধ্যে থেকেও প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে-ছিলো। বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিউন ও কৃষক-সভাগুলিতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছিলো। ভারতবর্ষের রাজনীতিকে কমিউনিস্ট-পার্টির এই শক্তি বৃদ্ধিকে কংগ্রেস কখনোই প্রীতির চোখে দেখেনি। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিকল্প কৃষাণ-সভা গড়া হয়েছিলো। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটি, বিহার-পার্টির প্রস্তাব অনুসারে, কমিউনিস্টদের চালিত 'কৃষাণ সভা' থেকে সমস্ত কংগ্রেসকর্মীকে বিযুক্ত হতে নির্দেশ জারী করেছিলো। অবশ্য জনমতের চাপে কংগ্রেসের পরবর্তী বৈঠকে ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিলো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ একটি

মোর্চায় 'কংগ্রেস'কে টেনে আনার চেষ্টা কংগ্রেসী প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের বিরোধীতায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কংগ্রেসের ভয় ছিল এই যে, মুক্তি-আন্দোলনে তাদের একনায়কত্ব কমিউনিস্টদের প্রভাবে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এই ভীতি রুশ-বিপ্লবের পর তদানীন্তন ব্রিটিশ-সরকারকেও বিচলিত করে তুলেছিলো। রুশ বিপ্লবের সফলতার সংবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে কিম্বা কমিউনিজমের ভাবাদর্শে প্রত্যয়ী হয়ে পাছে ভারতবর্ষে কোনো বিপ্লবের কেন্দ্র তৈরি হয়ে যায় এই ভাবনায় বিচলিত ব্রিটিশ সরকার নানা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অবশেষে ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট-পার্টিকে' নিষিদ্ধ ও পার্টির নেতাদের নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাগারে প্রেরণ করে বিপ্লব-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেবার চেষ্টা ১৯১৭ সালের পর নানা পর্যায়ে নিরন্তরভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের এই কার্যক্রমের একটি অধ্যায়ে ছিলো ১৯২৮ সালে তদানীন্তন Legislative Assembly-তে Public Safety Bill (ভারত থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিতাড়ন) পাশ করিয়ে নেবার অপচেষ্টা। ব্রিটিশ সরকারের Home Member এই সূত্রে M. N. Roy-এর একটি চিঠি সভায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিলেন। যে চিঠিতে M. N. Roy নাকি লিখেছিলেন, "...every little act of a real communist is a blow to Imperialism, and the Imperialist knows it ; therefore, if the communist does not act illegally he must pass his life in prison. There is no fair play, no gentlemanliness, in the revolutionary struggle...An illegal organization is traditionally associated with terrorist conspiracy, bombs and revolvers...."

মানবেন্দ্রনাথ রায় ঐ চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করে Home Member-কে জানান, "...I hereby declare that I did not address any such letter to anybody in India."[১]

এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যে অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাকে প্রশংসা করলেও ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট পার্টি' ও কমিউনিস্টপন্থীদের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের সুরটিকে আমরা প্রশংসা করতে পারি না।

ব্রিটিশ-সরকার কমিউনিস্টদের তৎপরতা ভারতবর্ষে চিরকালের মতো রুদ্ধ করে দেবার চক্রান্ত করেই ঐ চিঠির সূত্র ধরে একটি জনস্বার্থ-বিরোধী বিল 'সভায়' পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, ব্রিটিশ-সরকার কমিউনিস্ট জুজুর ভয় পেলেও জাতীয়-কংগ্রেস ও অন্যান্য ভারতীয়-নেতৃবৃন্দের কিন্তু ঐ ভীতি ছিল না। তার প্রমাণ 'Legislative Assembly-তে পণ্ডিত

মতিলাল নেহরুর মতো মানুষের তীব্র বিরোধীতা। তিনি প্রথমে ঐ চিঠির সত্যতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ঐ চিঠি এম. এন. রায়ের নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশদের কমিউনিস্ট ভীতিকে অর্থহীন ঘোষণা করে, ভারতবর্ষে বলশেভিক-পন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির মূল্যায়ন করে, এই প্রতীতিতে পৌছেছিলেন যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের আশু বিপ্লব-সাধনের কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি Assembly কক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন—"...Honourable the Home Member...has described in glowing colours the danger of communism, the danger of a Red revolution, and a great deal has been said on the floor of this House about the Terrors of Communism... Now there is no doubt that things have happened in India which bear a suspicious resemblance to the doings of Communists in other parts of the world. There is no doubt also that there are some people, but they are a very negligible proportion here who might be said to belong to the Communist Party, but no attempt has been made either on the floor of this House or in any court of law to connect the atrocities referred to with the Communists in India or elsewhere."[২]

পরন্তু ভারতবর্ষে তখন যে শ্রমিক অসন্তোষ, অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিলো তার কারণ যে কমিউনিস্টদের তৎপরতা বা কোনো 'বিপ্লবের' বাণীতে উদ্দীপ্ত তা অস্বীকার করে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলেছিলেন,··"In fact the labour unrest and cases of sabotage and other things which have happened may equally well have arisen from natural and economic causes. But because they are there and because this Red terror is also somewhere hovering about, it is argued that the one must be connected with the other."[৩]

ব্রিটিশ রাজশক্তির এই কমিউনিস্ট ও বিপ্লব-ভীতিকে লক্ষ্য করে পণ্ডিত মতিলাল তীব্র ব্যঙ্গে সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে যে শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে তার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে 'সরকার' শ্রীনিবাস আয়েংগার ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর উপর চাপাতে পারেন কেননা তাঁরা সম্প্রতি রুশিয়া ঘুরে এসেছেন···"We have been there (Russia)··· and we came back and say things, what is more reasonable

than to believe that it is we who are the causes of the trouble. Is there any greater evidence against any Communist than that ?"[৪]

সবশেষে তিনি শ্লেষাত্মক বাক্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, রুশ-বিপ্লবের দ্বারা ব্রিটিশ-সরকারই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। যে প্রভাব তাদের আতংকিত করছে। তিনি বলেছিলেন,…"The fact is that this great Government is in a state of panic and its mind is unhinged just by two persons…the names of Bradley and Spratt are as red rag to a bull to the Government."[৫]

(বেন ব্রাড্লী ও স্প্রাট কমিণ্টার্ণের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কমিণ্টার্ণের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন)

১৯২৮ সালেও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষাণ সভাগুলিতে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধির সংবাদ হয় জানতেন না, না হয়, সেই শক্তি বৃদ্ধিকে তিনি তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিলেন। তাই Assembly-তে দাঁড়িয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন "…terrors of Communism …might be enough to terrify old women and children, but I am sorry to say that it had no effect on hard headed men of affairs like us."[৬] তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন …"The firm conviction of the people of India that Communism will never have a hold in this country."[৭]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অক্টোবর-বিপ্লবোত্তরকালে যে রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্লবী ও স্বদেশে জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী-জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ভারত-উদ্ধারের যে সক্রিয় চেষ্টার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে নিশ্চয়ই একথা প্রমাণিত হয় না যে 'কমিউনিজম' ভারতবর্ষের বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদেরই সন্ত্রস্ত করে পেরেছিল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মতো স্থিতধী মানুষদের উপর কোনো প্রভাবই ফেলতে সক্ষম হয়নি। আমরা তো দেখেছি যে ১৯১৮-১৯১৯ সালে বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পালের মতো সর্বভারতীয় নেতারা 'বলশেভিক'দের সফলতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর মতো সর্বভারতীয় নেতৃত্বও অক্টোবর-বিপ্লব ও কমিউনিজমের প্রসারে তাঁদের সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যদিও ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ও তাদের আন্দোলনের ধারার সঙ্গে তারা কখনো সহযোগী হয়ে চলতে চাননি।

১৯২৮ সালে Legislative Assembly-তে 'Public Safety Bill'-এর

বিরোধীতা করতে গিয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতবর্ষের সর্বত্র যে প্রচণ্ড শ্রমিক-বিক্ষোভ ও নানা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন তার কারণ নাকি ছিলো কেবলমাত্র স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক শোষণের কারণে অসন্তোষ। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কংগ্রেসেরই ডাকে যে সংগ্রাম ব্রিটিশ-সরকারকে ভীত চকিত করে তুলেছিলো, যাতে অংশ নিয়েছিলো ভারতের শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণী তাদের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবেও পড়েনি একথা বলা অনৈতিহাসিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত নানা ভাষার পত্র-পত্রিকা, জননেতাদের ভাষণ, যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্লবের ফলে সেখানে যে শোষণের অবসান হয়েছে ও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র-পরিচালনের ক্ষমতা এসে পড়েছে একথা অস্পষ্টভাবে হলেও ভারতবর্ষের মেহনতী-মানুষকে ইংরেজ বিরোধী লাগাতার সংগ্রামে যে অনুপ্রাণিত করেছিলো একথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই।

আর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনাধিকার পত্তনের শুরু থেকেই প্রথমে ইংরেজ বণিক-শক্তি ও পরে ইংরেজ-রাজশক্তির শোষণ-পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শোষিত জনগণ যে ছোট বড় নানা সংগ্রামে অসংখ্যবার বণিক ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত লড়াই-এ নেমেছিলো একথা তো আজ ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত। অক্টোবর-বিপ্লবের বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া এই সমস্ত সংগ্রামের পিছনে মতিলাল নেহরু-কথিত শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোধ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটানোর ইচ্ছাই প্রবল ছিলো। কিন্তু ১৯১৭ সালের পরে ভারতবর্ষে সংঘটিত নানা সংগ্রাম ও উত্থানের পেছনেও ঐ একই কারণ ছিলো একথা বলা মানে জনগণের লড়াইকে ছোট করে দেখা। ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে সংকুচিত করে দেখা। এই দুটি দেখাই অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র থেকে সালে প্রকাশিত K. Antonova, G. Bongard Lenin ও G. Kotovsky রচিত 'A History of India' নামক মূল্যবান গ্রন্থের ২য় খণ্ডে 'The Influence of the October Revolution on India' নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। বিপ্লবের পীঠস্থান সোভিয়েট রুশিয়ার ভারতবিদ্যা-বিশারদরা ভারতবর্ষের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কিভাবে এসে পড়েছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের সারবস্তুটিও ঐতিহাসিক কারণে বিপ্লব-বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত যে কোনো ভারতীয়ের জ্ঞাত হওয়া উচিত। G. Kotovsky লিখছেন, "News of the February revolution and overthrow of the Tsar which had come to India via the British press made a deep impression on the Indian nationalists who had always regarded the Russian autocracy as a phenomenon on a par

with British despotism in India. [দ্রষ্টব্য : সংবাদ প্রভাকর, জুন, ১৮৫৪, সালে এই সংবাদ প্রকাশ করেছিলো, "শহরে গুজব উঠিয়াছে যে রুশ রণ-তরী এই শহর লুণ্ঠন করতে করতে আসিতেছে। এই গুজব আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করিয়া দিয়াছে।"]

[দ্রষ্টব্য : জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪৮-৪৯, "বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোন এক সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতে ছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন (১৮৬৮ সালের মে মাস) পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুশিয়েরা সহসা ধূমকেতুর মত প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না, এইজন্য মার মনে অত্যন্ত, উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছিল।"—শুধু ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে নয়, বহু পূর্ব থেকেই জার-শাসিত রুশ-ভীতি ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সংবাদ প্রভাকর ও জীবনস্মৃতিতে উল্লেখিত দুটি সংবাদই তার অভ্রান্ত প্রমাণ।]

A brochure published in 1917 by the Home Rule committee and given the symbolic title "Lessons from Russia (Home Rule Series 23) contained an appeal to the educated classes to expound to masses of the Indian people the significance and implications of the liberation movement in Russia. The victorious revolution in Russia inspired Indian nationalists to intensify their liberation struggle···in an article appearing in the Allahabad newspaper Abhyudaya ('অভ্যুদয়') March 24, 1917 where it was pointed out that the "Russian revolution convinces us that there is no power in the world which an animating and life-giving nationalism could not have overcome." ···However despite all these measures of the colonial administration the truth about the October Revolution spread quite fast to India. Montagu···and Chelmsford were obliged to acknowledge this in the Report···in 1918." The Revolution in Russia and its belonging was regarded in India as a triumph over despotism···it has given an impetus to Indian political aspirations."

The people of the Indian villages learnt of what was

happening in farway Russia from demobilised soldiers returning from the battle fields of Europe and the Middle East at the end of the war.

[উল্লেখ্য : বাঙলার বিখ্যাত কবি নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে, করাচী সৈন্য-নিবাসে ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টের হাবিলদার ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে রচিত তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পটি ১৯২০ সালের ১৫ জানুয়ারির কাছাকাছি কোনো তারিখে প্রকাশিত হয়েছিলো 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। সেই গল্পের নায়ক ও প্রতি-নায়ক উভয়েরই লাল-ফৌজে যোগদানের কথা ছিলো। ঐ গল্পে বালুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান, চমন প্রভৃতি যে সব এলাকার উল্লেখ আছে সেগুলি নজরুলের পরিচিত আর পেশোয়ারের কাছে নৌশহরায় নজরুলের সামরিক ট্রেনিং-এর হাতে খড়ি। বালুচিস্তানের ঐ সব জায়গা থেকে সোভিয়েট দেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার জন্যই নজরুল তাঁর কাহিনীর স্থান ঐখানে নির্বাচন করেছিলেন—[চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃঃ ১৩৩-৩৪]

···The Indian nationalist press which had started publishing news of events in Soviet Russia in Mid-November 1917 devoted particular attention to Lenin's famous Declaration of the Rights of the Peoples of the Russia (adopted on November 15, 1917) and the Appeal published on December 3 · to All Muslim Toilers in Russia and the East.

···In the early years after the October Revolution the majority of Indian nationalists who had welcomed the struggle being waged in Russia had not really appreciated the social implications of those revolutionary events (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে)·· even at the stage, however, some of the leaders of the Left Wing of the national movement saw the October Revolution as an epoch-making social change.

B. G. Tilak···in the newspaper Kesari (January 29, 1918) defending Lenin···and pointing out that "Lenin's influence in the army and among the common people has increased as a result of the distribution of the lands of the nobility to the peasantry···." B. Ch. Pal, another leader of the Left

nationalists, who actively supported the basic political principles adhered to by the young Soviet state, declared out right in one of his speeches in 1919 that the Bolsheviks were against all kinds of economic and capitalist exploitation and speculation and that they opposed social equality by Indian society in the Bolsheviks 'programme and policies grew rapidly'. Works by Indian authors on Lenin and the Soviet state began to appear at the beginning of twenties. ···over a dozen books were published in India about Lenin and the October Revolution in Hindi, Urdu, Bengali, Marathi, Kannara and English (পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে) ।

The left Indian nationalists working in underground revolutionary organizations regarded the Soviet Republic as their close ally in the struggle against the British colonial regime and began to establish direct contacts with Soviet Russia. (আলোচিত হয়েছে)

···Indian revolutionaries in exile also were beginning to establish contacts with Soviet Russia.

···Thus, the Victory of the October Revolution promoted a considerable expansion of the international Ties established by the Indian liberation movement, and introduced in them a qualitatively new element—and alliance between the World's first socialist state and the national liberation struggle of the peoples of the East.

The effect of this influence on various groups within the Indian national movement varied in impact. (আলোচিত হয়েছে)

···The influence of the October Revolution undoubtedly accelerated the adoption of a scientific socialist position by certain groups of extremists and revolutionaries, by members of underground anti-British organisations.

As far the most influential of the national political organisations—The Indian National Congress—on the whole its leaders welcomed the October Revolution, although

they did not approve of its socio-political programme. ...The impact of the October Revolution on India was a long and many-faced process. The most important and unmistakable lesson...was that the liberation struggle could only be successful if the masses were actively involved in it."[৮]

এই শতাব্দীর সবচেয়ে চমকপ্রদ, বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী ঘটনাটি হলো জার-শাসিত রুশিয়ায় সর্বহারা-শ্রেণীর অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র-বিপ্লব সংঘটনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম সর্বহারা-রাষ্ট্রের প্রবর্তন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি নানা কারণে বিশ্বের সর্বত্র বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টি করেছিলো। ঐতিহাসিক, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নানা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীদের সমস্ত অনুমান, গবেষণা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা ঘোষণা করে এই 'বিপ্লব' হয়েছিলো। শুধু হওয়া নয়, বিপ্লবের এই সুফলকে গৃহযুদ্ধ, ফ্যাশিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী নানা রাষ্ট্রের হিংস্র আক্রমণের প্রবল চাপকে ব্যর্থ করে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়েছিলো। পৃথিবীর সেই প্রথম সর্বহারাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯১৭ সালে রুশিয়ায় সর্বহারা কোটি কোটি মানুষের যে স্বপ্নের দেশটি আশা-বৃক্ষের মত মুকুলিত হয়ে উঠেছিলো আজ তা বিশ্বের দিকে দিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেছে। পৃথিবীতে আজ একাধিক দেশে সর্বহারাদের হাতে নতুন শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

কিন্তু ১৯১৭ সালে অক্টোবর-মহাবিপ্লবের পর এর সার্বিক প্রভাব আজকের মতো স্পষ্ট হয়ে বিশ্বের উপর পড়তে পারেনি। পড়া নানা কারণে সম্ভবও ছিলো না। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক-পার্টির দ্বারা যদিও জারতন্ত্রের অবসান ঘটে নতুন 'সরকার' গঠিত হয়েছিলো কিন্তু সেই কোয়ালিশন সরকারে বলশেভিকরা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলো। বিপ্লবের পরেও রুশিয়ায় লেনিন ও বলশেভিকদের শত্রুর অভাব ছিলো না। তারা বলশেভিকপন্থী ও লেনিনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নানা জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলো। বহু বলশেভিক নেতাও এই পর্যায়ে লেনিনের সঙ্গে হয় মতৈক্যে পৌছতে পারেননি কিংবা লেনিনের বিরোধীতা করেছিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিলো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর লড়াই জিতে যখন বলশেভিক পার্টি নিজেদের শক্তিকে সংহত ও বৃদ্ধি করেছিলো সেই সময় ফাশিস্ট-রাষ্ট্রগুলি এই নবজাত শক্তিহীন রাষ্ট্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য রুশিয়ায় তাদের হিংস্র অভিযান চালিয়েছিলো। কেবল একটি মহাবলী কমিউনিস্ট পার্টির কিছু মহান্ নেতার

নেতৃত্বে, মূলতঃ, দেশপ্রেম ও স্বদেশ ভূমিকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার ইস্পাত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী ফ্যাশিস্ট-আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁত চেপে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। সেই মানুষ প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে হিংস্র ফ্যাশিস্ট-দানবদের বজ্রমুষ্টি চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। এ লড়াইয়ে রক্ত ঝরেছে প্রচুর—নিহত হয়েছে লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী, তবু এক ইঞ্চি জমি তারা ছেড়ে দেয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ও তার ফলাফল দেখে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময় মেনেছে। জগৎ-জুড়ে তখন এই প্রশ্ন ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে গেছে,—কোন্ শক্তিতে, কার নেতৃত্বে, কোন্ বিশ্বাসে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী এই অসম লড়াইয়ে বিজয়ী হলো ? আজ সে সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য-বিষয়ের কালসীমা ১৯১৭ সালের 'অক্টোবর মহা-বিপ্লবের' প্রস্তুতি-পর্বের আলোচনা থেকে ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শেষ হয়েছিলো ১৯৪২ সালে। ১৯১৭-১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই সময়টুকুতে রুশিয়ার জনগণ তাদের 'বিপ্লব'কে রক্ষা করার জন্য রক্তক্ষয়ী বিভিন্নমুখী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো।

সুদূর ভারতবর্ষের মানুষ রুশিয়া, তার জনগণ, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার বিপ্লব-সংঘটন ও পরবর্তীকালে ফ্যাশিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করার বিবরণ নানাসূত্রে জেনেছে, প্রভাবিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ভারত-চিত্তকে নানা ভাবনা ও নব আশ্বাসে উদ্বেল করে তুলেছে। ভারতবর্ষের বহু মনীষি কখনো নিজের তাগিদে কখনো সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে আগ্রহান্বিত চিত্তে ছুটে গেছেন রুশিয়ায়। দু'চোখ ভরে নবজাত এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে দেখে অভিভূত হয়েছেন। নানা গ্রন্থে, চিঠিপত্রে, ডায়েরীতে সেই অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা লিখেও রেখেছেন। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর বহুদেশের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানবতীর্থে গিয়ে পৌছেছেন।

কিন্তু যে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা বিমূঢ় হই তা হচ্ছে, এই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অবিশ্বাস্য জয়যাত্রার মূল কারণটি কোথায় সত্য হয়ে আছে ? প্রাচীন রুশ-জাতির স্বভাব বৈশিষ্ট্যে, না রুশ শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে, না ১৯১৭ সালে সংঘটিত 'বিপ্লব'-এর মধ্যে ? যদি রুশ-বিপ্লবের মধ্যে এই জাতির এই শক্তির বীজ নিহিত থেকে থাকে তাহলে আমাদের রুশ-বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে হবে এবং তার জন্য আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে রুশ-জাতির বিপ্লব-পূর্ব বহু লড়াই ও শোষণ-নিপীড়নের নানা কথা-মালার মধ্যে। আমাদের বুঝে নিতে হবে বিপ্লব-পূর্ব রুশিয়ার মানুষ ও তাদের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে বহু দেশের মানুষ ও তাদের সমাজ-ব্যবস্থার অমিল থেকে মিলই ছিল বেশি। তাহলে কোন্ মন্ত্রে ঐ দেশের মানুষ ধীরে ধীরে জেগে উঠে, সংঘবদ্ধ হয়ে, নানা লড়াইয়ের মাধ্যমে উল্টে দিলো এক প্রবল প্রতাপশালী প্রাচীন রাষ্ট্র-কাঠামোকে ?

উত্তর হচ্ছে কার্ল মার্কস। তাঁর রাজনৈতিক-দর্শন ও স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রুশ-দেশের এক অভিজাত পরিবারের খর্বাকৃতি এক যুবক, তাঁর নাম ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। অবশ্যই লেনিনের আরো সহযোগী ছিলেন, যেমন ট্রট্স্কী, স্টালিন, জেনোভিয়েভ, বয়োদীন প্রমুখেরা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্কসবাদ তাঁদেরকে উজ্জীবিত করেছিলো পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি 'বিপ্লব'-সংঘটনের। সেই ইচ্ছা থেকেই তৈরি হয়েছিলো একটি রাজনৈতিক সংগঠন, যার নাম বলশেভিক বা 'কমিউনিস্ট পার্টি'। এই 'পার্টি'র নেতৃত্বে রুশিয়ার অসংগঠিত ও মার্কসীয় রাজনীতির চেতনাহীন জনগণকে ধীরে ধীরে 'পার্টির' রাজনৈতিক-বিশ্বাসের সঙ্গে সহমতে আনতে হয়েছিলো; এই 'পার্টি' ও এই 'পার্টির' প্রতি অনুগত লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারীকে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছিলো পৃথিবীর প্রথম 'পরিকল্পিত বিপ্লবের' জন্য। এবং সেই বিপ্লব ১৯১৭ সালে সার্থক হয়েছিলো।

১৯১৭ সালে সংঘটিত অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব-নির্ণয় করতে গিয়ে সম্ভবত ভারতবাসীরা এবং বিশেষ করে বাঙালী-চিন্তাবিদেরা কিছু ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিষয়টি সরলীকরণের পথে নিয়ে গেছেন।

অনেক গবেষক প্রাচীন রুশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীক যোগাযোগের বহু প্রমাণ দাখিল করেছেন। রুশিয়ার মানুষের চিন্তাধারা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের যে প্রাচীনকাল থেকে, ক্ষীণ হলেও, যোগাযোগ ছিলো তাও প্রমাণ করেছেন। সবশেষে সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষের উপর রুশের প্রভাব এবং রুশের উপর ভারতের প্রভাব পড়ার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁরা হেরাসিম লেবেডফ, টলস্টয়, গর্কি, লেনিন এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জহরলাল, মেঘনাদ সাহার নাম উল্লেখ করে দেখিয়েছেন উভয় দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা উভয় দেশে, উভয় দেশের রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে ভাবনা চিন্তা করে আসছেন।

এসব গবেষণায় লভ্য তথ্যাদি যে অসত্য তা অপ্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার প্রতিপাদ্য, সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা 'প্রভাব'-এর বহতা স্রোতে একদিন রুশ-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত বাণী আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে স্বাভাবিকভাবেই, এই অতি সরলীকরণের প্রবণতাকে অস্বীকার করা।

একটি মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্বাধীনে কিভাবে রুশদেশে একটি 'পরিকল্পিত বিপ্লব' (Planned Revolution) সংঘটিত হলো তার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে দেখবো ইতিহাসের ধারাবাহিক স্রোতে স্বাভাবিকভাবে এই বিপ্লব-চিন্তা এসে পড়েনি। একে আবাহন করে আনা হয়েছিলো অ-রুশ দার্শনিক

কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক দর্শন-চিন্তা থেকে। কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো ও মার্কস-বাদকে সামনে রেখে রুশিয়ায় গড়ে তোলা হয়েছিলো 'বলশেভিক পার্টি'। বরঞ্চ বলা যায় ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐ 'পার্টি' ও ঐ পার্টির নেতা ও কর্মীরা ইতিহাসের চাকা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এই যুগান্তকারী ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ না হলে অক্টোবর-মহাবিপ্লবের প্রভাব-বিষয়ক আলোচনা ভ্রান্তির কবলে পড়তে পারে।

এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যুগে যুগে বিপ্লব-চিন্তার বিবর্তন, বিপ্লব-পূর্ব জার-শাসিত রুশিয়ার সমাজ-চিত্র, শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে রুশ নরনারীর নিরন্তর সংগ্রাম ও অবশেষে লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ছোটবড় অসংখ্য ব্যর্থ ও সার্থক লড়াই-এর মধ্য দিয়ে রুশ-জনগণের সংহতি ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং পরিশেষে বিপ্লব-সাধন ও পরবর্তীতে সেই 'বিপ্লব'কে নানা অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার অদৃষ্টপূর্ব ইতিহাস যথাসাধ্য বিস্তৃতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব বাঙলাদেশের উপর ব্যাপকভাবে পড়লে তাতে বাঙালী জাতির গৌরব বাড়ে তাদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে অখণ্ড বাঙলাদেশের কথা আমরা আলোচনা করছি তা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ভূগোলের একটি শিল্প-কৃষি-সমৃদ্ধ ও জনবহুল প্রদেশ মাত্র ছিল। সেই প্রদেশে বিপ্লবের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হলেও অক্টোবর-বিপ্লবের উদ্গাতাদের বিশ্ববিপ্লব ঘটানোর যে প্রত্যাশা তা বাঙালী জাতির দ্বারা সাধিত হবার সম্ভাবনা কমই ছিলো।

একথা সত্য যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালী মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রমুখেরা তখন ভারত-বর্ষের রাষ্ট্র-গগণে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো বিরাজমান। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের মতো লেখক-কবিদের স্বচ্ছন্দ অভিসার ; বিজ্ঞানের জগতে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুদের জয় জয়কার ; ধর্মজগতে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা প্রমুখের বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞ ও শ্রীঅরবিন্দ, উল্লাস-কর, বটুক দত্ত, রাসবিহারী বসু, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয় বাদল দীনেশ, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরাদের মতো শত সহস্র বিপ্লবীদের বিপ্লবসাধ-নের চেষ্টা ; সম্মুখ-সমর, ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় পেতে নেবার মতো ঘটনা—সারা ভারতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ভারতবর্ষ-জোড়া বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মতো দৃঢ় সংগঠন বাঙলাদেশে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তবু বাঙালী-সন্ত্রাসবাদী ও জাতীয়-তাবাদী-কমিউনিস্টরা (যেমন রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅরবিন্দ,

বারীণ ঘোষ, বাঘা যতীন, বটকৃষ্ণ দত্ত, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো বিপ্লবীরা) দেশ বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতবর্ষ-জোড়া একটি বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলেন একথা সত্য। নানা কারণে সে চেষ্টা সফল হয়নি বলে তাঁদের কীর্তি ও ইতিহাসকে আমরা বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে চেয়েছি এটাও সত্য।

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক নানা অসুবিধার জন্য বিপ্লবী-চেতনা সম্পন্ন বাঙালী-জাতির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারতের ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়নি। যে সর্ব ভারতীয় দলগুলির নেতৃত্বে তখন দেশজোড়া ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চলছিলো তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনসমর্থনপুষ্ট দলটির নাম ছিলো 'ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস' যার সর্বাধিনায়ক গান্ধীজী ছিলেন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী। অপরপক্ষে ছিল স্বরাজ্যপার্টি ও সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু এই সমস্ত সর্বভারতীয় দলগুলি ভারত স্বাধীন করার মত ও পথের প্রশ্নে কখনো মৈক্যে পৌঁছেতে পারেনি। ফলে ভারতবর্ষের জনগণ ও নেতৃত্ব বহুধা-বিভক্ত থাকার ফলে একটি 'বিপ্লবে' রাজশক্তিকে উল্টে দেওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী অধ্যায়-গুলিতে মত ও পথের এই অনৈক্য কিভাবে, 'বিপ্লব' তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও বহু বিলম্ব ঘটিয়ে দিয়েছিলো সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অথচ বাঙলা দেশে রুশ-দেশ, রুশ-জাতি, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ রুশ-বিপ্লবের বহু আগে থেকেই জাগ্রত ছিলো। কিছু ইংরেজ পাদ্রী ও বিভিন্ন যুগে বেশ কিছু বাঙালী রুশদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁদের সেই দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাঙলাদেশের, বাঙলা, ইংরেজি কিছু কিছু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে রুশ-দেশ সম্বন্ধে বাঙালী জাতির একাংশের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিলো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিশপ হিবার, পাদ্রী লং, মাদাম ব্লাভাটস্কির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসকও কিছু কিছু ভারতীয়দের (যেমন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর) দ্বারা তখন রুশাতঙ্ক চরমে উঠেছিল। প্রচার হচ্ছিলো, রুশ-দেশ 'অসভ্য বর্বর', 'নরখাদক' ও 'রাক্ষস'দের দেশ। তখন রুশ-দেশ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে এদেশে এলেন পাদ্রী হিবার। তিনি সকল অপপ্রচারের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন রুশ-দেশকে বরং 'ল্যাণ্ড অফ রোমান্স' বলা যায়।

পরবর্তীকালে পাদ্রী লং ভারত-রুশ মৈত্রীর কথা ঘোষণা করে রুশাতঙ্ক কাটাতে ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীদের সাহায্য করলেন বটে কিন্তু নিজে পড়লেন ইংরেজ-বৈরিতার সামনে। 'নীলদর্পন' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করার

অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সেদিন কর্তৃপক্ষ তাঁর "dangerous pro-Russian tendencies"—এর দিকেও বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৯] 'হিবারস জার্নাল'-এর অনুবাদ করেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির প্রকাশের প্রথম বছরেই। কলকাতার লর্ড বিশপের মত সম্মানিত পদে থেকেও তাঁর অতৃপ্ত রোমান্টিক মন, ক্রিমিয়া, কুবান-কসাকদের দেশে দেশে বিচরণ করে বেড়াতো।

পাদ্রী লং-এর শৈশব কেটেছিলো রুশ-দেশে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। ১৮৪০-এ তিনি কলকাতায় একটি ব্রিটিশ মিশনারী স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কলকাতা থেকেই তিনি দুবার রুশ-দেশে গিয়েছিলেন। সেই দেশ-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার কথা তিনি অকপটে বিবৃত করলেন ইংল্যাণ্ডে, রুশ-দেশে ও ভারতবর্ষে। সে-কাজ সে-যুগে যথেষ্ট দুঃসাহসিক ছিলো।

পাদ্রী লং-এর পাঁচ মাসের রুশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা নির্ভয়ে নিজের পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ ছাপালেন মহান সাংবাদিক হরিশ মুখোপাধ্যায়। পাদ্রী লং-ই আমাদের প্রথম শুনিয়েছিলেন:

(১) রুশ-দেশ আমাদের মতো গ্রাম্য-সভ্যতা-ভিত্তিক শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র।

(২) ভারত ও রুশ-দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কথা ভাবা উচিত।

(৩) নির্বাচনের মাধ্যমে রুশ গ্রাম-পঞ্চায়েত-এর আদর্শকে এ দেশে চালু করা উচিত।

(৪) রুশ-দেশের মতো বন্দর-শ্রমিকদের ইউনিয়ন কলকাতার বন্দর শ্রমিকদেরও গড়ে তোলা উচিত।

পাদ্রী লং বার্লিনে দাঁড়িয়ে রুশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন "Russia has latent elements of power—the effects of which the century will see"[১০]—একশো বছরের বেশি আগে রুশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দুর্দশাগ্রস্ত একটি দেশ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎবাণী বিস্ময়কর।

১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে আসেন রুশ-পণ্ডিত অধ্যাপক মিনায়েভ। ঐ দশকেই ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক হিসাবে সেণ্ট পিটর্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন (১৮৭৮)।

যদিও রুশ-বিপ্লবের পূর্ব থেকেই রুশিয়ার বিপ্লব-চেষ্টার ইতিহাস কিছু কিছু মনীষী-বাঙালী অবগত ছিলেন এবং কেউ কেউ তাঁদের প্রখর দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়ায় এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যা বিশ্বের ইতিহাসকে নতুন দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবে। আমরা রজনীপাম দত্তের উল্লেখ করেছি, যিনি রুশ-বিপ্লবের আগেই লণ্ডনে 'সভা' করে রুশ-বিপ্লবের প্রতি তাঁর সংহতি জ্ঞাপন করে রাজরোষে পড়েছিলেন।

কেননা বাঙালী হিসাবে একথাটি কখনোই ভুলতে পারি না যে আমরা একটি ইতিহাস-বিস্মৃত ও আত্মবিস্মৃত জাতি, "দু'শ বৎসর আগেও বাঙালী ছিল গ্রামের বাঁশবনের আড়ালে গ্রাম্যসভ্যতায় আত্মতৃপ্ত জাতি, আর সেই সঙ্গে পৃথিবী বিমুখ, বাইরের জগৎ ও বৃহত্তর মানবসমাজ সম্বন্ধে অচেতন, উদাসীন জাতি। এখনো আমরা তাই।···এখন পৃথিবীর এক আধটুকু দেখি, এবং পৃথিবীর আগামী কালের রূপের আভাসও এক আধটুকু সেই সূত্রে সংগ্রহ না করেও নিষ্কৃতি পাই না। তার কারণ বর্তমান যুগ আমাদের সেই কুনো মনোভাব ও আত্মতৃপ্তিকে মেনে নেয় না। সেই সূত্রেই আবার এই যুগ এই ভাবনাটাকেও উসকিয়ে দেয়—কেন আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে এমন বিমুখ থেকে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চেয়েছি? আবার কেমন করে আধুনিক যুগ, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনযাত্রার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং রামমোহন রায়ের মত কারাই বা তারা যারা যুগের সত্যকে বুঝতে চেয়েছে, এবং নানা দুর্যোগ সুযোগের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে এখন দেখতে পেয়েছে সমাগত প্রায় সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই আধুনিক যুগের আগামী প্রভাতের অভ্রান্ত আভাস? 'অবশেষে রাশিয়াতে এলাম, না এলে এ জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত' কবির কথাটিকে স্মরণে রেখে বলতে পারি, আর রাশিয়াকে না জানলে বাঙালীজীবনের কূপমণ্ডূকতা ও মূঢ়তার অন্ধকার কাটতে আরও অনেক দেরি হত। বড় জোর ভাবতাম ইংরেজ ও বুর্জোয়া ইংরেজি সভ্যতাই মানব সভ্যতার চরম সৃষ্টি তার সূর্যাস্ত নেই।"[১১]

বাঙালী চরিত্রের এই আপাত নিস্পৃহতা ও উসকে-দিলে বিশ্ব-ব্যাপারে আশ্চর্য-আগ্রহী প্রবণতার কথা স্মরণ রেখেই আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে বারবার ভারত ও রুশের অনেক অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য তোরণের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অক্টোবর-মহাবিপ্লবের মতো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনাকে বিচার বিশ্লেষণ না করলে আমাদের বাঙালী মানসে ও তার সাহিত্যে ঐ ঘটনার প্রভাব কতটুকু সত্য হয়ে পড়েছিলো বা পড়তে পারে তার আলোচনা আবেগ-তাড়িত, অনৈতিহাসিক কথার ফুলঝুরিতে পরিণত হতে বাধ্য। মানুষ ইতিহাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তার কর্মতৎপরতা ও নানাবিধ জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্রোতকে অলক্ষ্যে আরো তীব্র করে তোলে। প্রতিটি বাঙালী, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ, নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে অক্টোবর-মহাবিপ্লবের প্রভাব-নিরূপণের প্রসঙ্গে অগ্রসর হবেন এমত বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমাকে 'প্রভাব-নির্ণয়ের' স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অক্টোবর-মহাবিপ্লব উৎপন্ন করেছে একটি নতুন ও অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, দূর করেছে শোষণ ও নিপীড়ন। পৃথিবীর সমস্ত

সর্বহারার কাছে নিজের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে 'পিতৃভূমি' রূপে। সুতরাং ইতিহাসের এই মহতী ঘটনা ও তার প্রভাব রুশ-দেশে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে একটি নতুন মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে দিয়েছে,—বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী পরাধীন বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলিতে। ভারতবর্ষ ছিলো তেমনি একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসিত দেশ। এই পরাধীন দেশের লেখক, সাংবাদিক ও কবিরা তাই তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই 'বিপ্লব'কে অভিনন্দিত করেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের সম্মিলিত যে প্রচণ্ড শক্তি সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসীবাদীদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেয় তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁদের সাহিত্যে 'সর্বহারা' মানুষের জীবন ও সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিলো।

কিন্তু অক্টোবর-বিপ্লবের পীঠস্থানে আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিলো। বিপ্লব-পূর্ব কিছু কিছু রুশ কবি-লেখকের রচনা অক্টোবর-বিপ্লবের নেতৃত্বকে উদ্দীপ্ত করেছিলো। জার-শাসিত রুশিয়ার অর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো, রুশ-সমাজের অন্তঃস্থিত সুপ্ত সামাজিক ব্যাধি ও রুশ অভিজাত সমাজের নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্লেদকে তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে 'বিপ্লব'-এর নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। টলস্টয়কে কমরেড লেনিন তাঁর প্রবন্ধে, 'The mirror of the Russian Revolution' বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১২] 'সাহিত্য' থেকে প্রাপ্ত এই 'শিক্ষা', বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকে গোটা সোভিয়েট-সমাজকে স্পষ্ট করে দেখতে সাহায্য করেছিলো। যে সমাজ-ব্যবস্থাকে উল্টে দেবার জন্য ঐ বিপ্লব, সেই ব্যাধি-গ্রস্থ সমাজকে তাঁদের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছিলো টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, আলেকজাণ্ডার পুশকিন, সলোকভ প্রভৃতি লেখক ও কবির রচনাবলী। এঁরা কেউই তথাকথিত সমাজবাদী-লেখক (Socialist Writer) ছিলেন না, কিন্তু তবু এঁদের অনেকের রচনা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন-এর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলো। আমরা প্রায়শই এই ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হই যে, 'সমাজবাদী-সাহিত্য'কে একজন সমাজবাদী-লেখকের সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় বহন করতে হবে এবং তাকে ভয়ঙ্করভাবে বাস্তববাদী হতে হবে। কিন্তু এঙ্গেল্‌স বা লেনিনের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যায় যে, তাঁরা এই ধরণের 'Point-blank' সোসালিস্ট-সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স মিস ম্যারগারেট হার্কনেসের 'City girl' উপন্যাসটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে "...I am far from finding fault with your not having written a point-blank socialist novel; a 'Tenderzroman' as we Germans call it, to glorify the social and political views of the authors. This is not at all what I mean. The more the opinions of the author remain hid-

den, the better for the work of art. The realism I allude to may crop out even in spite of the author's opinions".[১৩]

৬

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত। প্রভাব বিশ্লেষণ

খোদ সোভিয়েট রুশিয়াতেই প্লেখানভ, লেনিন, ট্রট্স্কি প্রমুখ মার্কসবাদীরা রুশিয়ার প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সাহিত্যের এই উত্তরাধিকার যে তাঁদের পিতৃভূমির বিস্তৃত রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্পষ্ট ছবিটিকে দেখতে সাহায্য করেছিলো সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই কথাটি স্মরণ রেখে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের পর্যালোচনা করতে হবে, বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষের 'বঙ্গদেশ' নামক একটি প্রদেশের সাহিত্যালোচনায়।

সেই সঙ্গে এই কথাগুলিও মনে রাখতে হবে যে, না পরাধীন না স্বাধীন ভারতবর্ষে মার্কসবাদীরা ভারতবর্ষীয় জনগণের হৃদয়ে 'মার্কসবাদের' প্রতি আস্থাকে খুব একটা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হননি। ১৯৮৬ সালের স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে 'কমিউনিস্ট পার্টি' নিজেরাই বহুধা-বিভক্ত এবং তাদের শক্তি ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি রাজ্যে সীমিত। ট্রেড-ইউনিয়ন ও কৃষকসমিতিগুলিতে আজও কমিউনিস্টদের প্রভাব কংগ্রেসের প্রভাবাধীন ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি থেকে কম।

রুশ-বিপ্লব বিশ্বকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলো ঠিকই এবং সে নাড়া ভারতবর্ষেও যে লাগেনি এমন নয়। ভারতীয় রাজনীতিতে রুশ-বিপ্লবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মোটামুটি বিস্তৃত চিত্র আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়গুলিতে দেবার চেষ্টা করেছি। রাজনৈতিক দিক থেকে যাদের উপর এই বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে পড়ার কথা সেই ভারতীয় কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-পার্টির কথাও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 'কমিউনিস্ট-পার্টি' প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পরেও ভারতবর্ষের গণমানুষের উপর এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আজন্ম-লালিত সনাতন

ভারতীয়-সংস্কার, ধর্মবোধ ও জীবন-চর্যায় রুশ-বিপ্লবের মর্মবাণী তেমন কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

অখণ্ড বাঙলাদেশ, অন্তত ইংরেজ-রাজশক্তির দুই শতাব্দী-ব্যাপী শাসনকালে, রাজনৈতিক দিক থেকে কেবল সচেতনই হয়ে উঠেছিলো এমন নয় ভারতীয় রাজনীতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকাও নিয়েছিলো। অবশ্য সে রাজনৈতিক-সচেতনতা কেবলমাত্র বাম-রাজনীতিকে অবলম্বন করে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি; কংগ্রেস, স্বরাজ্যপার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং মুসলীম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দলকে ঘিরেও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলো। যদিও দলমত নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ জননেতারা রুশ-বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছিলেন কিন্তু তবুও তাঁরা ঐ বিপ্লবের শিক্ষাকে ভারতীয়-রাজনীতিতে সংযুক্ত করে ভারতবর্ষে রুশ-বিপ্লবের মতো একটি বিপ্লব ঘটাতে আগ্রহ বোধ করেননি। আসলে রুশবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে নতুন সমাজ-প্রতিষ্ঠার ফর্মূলাগুলি স্বীকৃত হয়েছিলো ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের সংস্কার বশতঃ তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে সম্ভবত প্রস্তুত ছিলো না। "হয়ত ইহার অর্থনীতির উপর অত্যধিক জোর, মানুষের খাওয়াপরার মানের উন্নয়নের জন্য অতি আগ্রহ, ইহার কলকারখানা-রাষ্ট্র-সংগঠ-নের বস্তু কাঠামোর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ও জাতির কল্যাণের জন্যই সমস্ত জাতীয় চিন্তা ও কর্মধারার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, জাতির ঐহিক শক্তি ও সুখবৃদ্ধির জন্য ইহার স্বাধীন আত্মার নিগূঢ় অবমাননা ইহার ভাবগত আবেদনকে সংকুচিত করিয়াছে। ইহার বাস্তব সংগ্রামশীলতার সাফল্যই ইহার ভাবজগতে আপেক্ষিক বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১]

উদ্ধৃতিটি এই কারণে দেওয়া হলো যে উদ্ধৃতিটির বক্তা ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা-সাহিত্যের একজন শ্রুতকীর্তি সাহিত্য-সমালোচক এবং রুশ-বিপ্লবের সমসাময়িক কালের মানুষ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-সমালোচনা গ্রন্থ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনিবার্যভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব-বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমরা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতা-মতের সঙ্গে সর্বাংশে একমত হই বা নই সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাঁর যুক্তির কিছু কিছু অকাট্যতাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

তিনি বাঙলা আধুনিক 'সৃজ্যমান উপন্যাস সাহিত্যের' কতকগুলি প্রবণতার কথা বলেছেন। প্রথম প্রবণতাটি হচ্ছে উপন্যাসে রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগময় সাধনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর জনপ্রিয়তা ও জনমনে অভাবনীয় আলোড়ন জাগাবার শক্তিটিকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নির্বাচন। তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকরা অনেকেই সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত গণ-আন্দোলনগুলির দিকে চোখ রেখেই

নিজ সাহিত্যসাধনার প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, যা বহু লোককে আকর্ষণ করছে তা স্বতঃই সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এরূপ চিন্তাধারার ফলে, ঘটনার আপাত আকর্ষণীয়তার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য দ্রুত সাংবাদিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছে।[২]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই এই পর্যায়ের বাঙলা-উপন্যাসের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "গণ আন্দোলনের যে বিপুল উত্তেজনা জোয়ারের বানের মত সাহিত্যের উভয় তট প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া আসে, তাহার মধ্যে যদি কোন চিরন্তন ভাব-তাৎপর্য, সার্বভৌম প্রেরণা না থাকে, তবে জোয়ারের উচ্ছ্বাসের মতই ক্ষণস্থায়ী হইবে।"[৩]

রুশ-বিপ্লব তাঁর কাছে এইরকম একটি ভাবতাৎপর্য ও সার্বভৌম প্রেরণাহীন ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র। রুশ-বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবশ্য তিনি তার পূর্বেই বলেছেন যে ঐ বিপ্লব একটি জাতির আত্মার বিনিময়ে ঐহিক সুখ ও শক্তি বৃদ্ধি করেছে মাত্র। এবং রুশ-জাতির বাস্তব সংগ্রামশীলতার সাফল্য তার ভাবজগতে আপেক্ষিক বিফলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে এই, রুশ-বিপ্লবের ফলে রুশ-দেশে যে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে দেশে নতুন গড়ে উঠতে থাকা সাহিত্য-রীতি সম্বন্ধে এরকম একটি বিশ্বাস কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও পরাধীন ভারতবর্ষের মতো সাম্রাজ্য-বাদ-শাসিত দেশের গুনীজনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো। মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র যে মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এমন বিশ্বাস আজও পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ মানুষের মধ্যে দৃঢ়মূল।

১৯১৭ সালের পর থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত যে সময়-সীমা আমরা এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি তার মধ্যে বাঙলা-সাহিত্যে যে কবি-সাহিত্যিকরা সাহিত্য-রচনা করেছেন তাঁরা রুশ-বিপ্লবের প্রভাবকে কতটা সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন সে আলোচনায় প্রবেশের আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রভাব তাঁদের চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাসের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১]

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে আসা যাক। অক্টোবর-বিপ্লবোত্তর বাঙলা সাহিত্যে তিনিই ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভা। তিনিই ছিলেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ প্রাণ ও চেতনার প্রতীক যাঁর মধ্যে সেই সময়ের পৃথিবীর নানা ঘটনার সূক্ষ্মা-তিসূক্ষ্ম ঘাত প্রতিঘাত ব্যঞ্জিত হয়ে উঠতো। অক্টোবর-বিপ্লবের বয়স যখন এক বছর পূর্ণ হয়নি, তখনই ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায়

রবীন্দ্রনাথ রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"We know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty material in our hands we can not be certain if she in her tribulations, in giving expression to man's indomitable soul against prosperity, built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet come, especially as Real Politik is in such a sorry plight itself. No doubt if modern Russia did try to adjust herself to the orthodox Tradition of Nation-worship, she would be in a more comfortable situation to-day, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her tangles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that, as a nation, she will fail ; but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the new age"[৪]

শুধু তাই নয়, বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্লব ও রুশের অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রায়ই রুশ-প্রশস্তি রচনায় ব্যবহৃত হয়। বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার অকুণ্ঠ প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাশিয়ার চিঠি'তে বারংবার করেছেন একথা সত্য। পরশ্রমজীবীর ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে কবির সহানুভূতি ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে। অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও জাতিগত বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশ-বিপ্লবে ধ্বনিত হয়েছিল। "তাই মানবতন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রথমে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু রুশ দেশ ভ্রমণে তাঁর ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে গোড়ার দিকে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাচন আছে। কিন্তু শেষের দিকটা ক্রমেই সংশয় মিশ্রিত হয়ে ওঠে।"[৫] আবার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যু-পথযাত্রী রবীন্দ্রনাথ যখন শুনলেন যে হিটলারের হিংস্র ফ্যাসিস্ট বাহিনী সেই—'Morning Star' কে ধ্বংস করবার জন্য উদ্যত তখন বিপন্ন বোধ করে মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন যেন সোভিয়েট রুশিয়া এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়।

খোলা মন নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়ার গিয়েছিলেন, তাঁর দেখার 'প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক'।[৬] কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবোত্তর সরকারের 'একনায়কতন্ত্র'কে (Dictatorship of the Proletariat)। তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রুশিয়াতে 'আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই'।[৭] বিপ্লবোত্তর

রুশিয়ায় মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের নামে যে 'যথেষ্ট জবরদস্তি আছে' তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আত্মকেন্দ্রিক নির্বিবেক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে তাঁর যেমন রুচি ছিলো না, তেমনি অন্ধ সাম্যবাদেও তার সমর্থন আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই রুশিয়াতে সমষ্টির নামে ব্যক্তি স্বার্থের বলিদানকে তিনি নিন্দা করেছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'-র দ্বাদশ পত্রে তিনি লিখেছেন, "মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খ্যাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না, ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।"[৮]

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাজনীতির কথা বিশেষ বলেননি। 'সোভিয়েট' সম্বন্ধেও তাঁর মন্তব্য সমালোচনায় তীক্ষ্ণ। তিনি বলেছেন "সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ·· যেখানে আশুফল লাভের লোভ প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না।"[৯]

তবে 'আশুফল লাভে' প্রবল লোভী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র-নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের একা-সনে বসাননি। এতো বুদ্ধি ও বিবেচনার দৈন্য তাঁর অন্তত ছিলো না। তাই স্পষ্টোচ্চারণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন·· "সেখানকার পলিটিকস মুনাফা লোলুপ-দের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে।"[১০]

বিপ্লবোত্তর রুশ-দেশ পরিভ্রমণের পর সে দেশ সম্বন্ধে, প্রশংসা ও সমালোচনা, এবং কখনো কখনো তীক্ষ্ণ নিন্দাবাদও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও তাঁর স্বধর্ম লালিত বিশ্বাসকে রুশ-বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনাও সচকিত করতে পারেনি। রুশ-বিপ্লবের যতটুকু ভালো ততটুকুকে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং যেখানে একমত হতে পারেননি সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃবৃন্দ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সীমা ঠিকমত ধরতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিলো। এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়মূল। তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি দিকে সে স্বতন্ত্র আরেকদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত।[১১] এর একটিকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে তা অবাস্তব, তিনি উভয়ের সমন্বয় চেয়েছিলেন। 'ফ্রিডম' বলতে রবীন্দ্র-

নাথ বুঝতেন, আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি। কোনো সঙ্কীর্ণ মতবাদে তা আবদ্ধ নয়। সর্ববিধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিধি ও নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে তিনি মুক্ত, সৃজনশীল জীবনের জয়গান করেছেন। যে যূথবাদী-সভ্যতায় ব্যষ্টিকে গোষ্ঠীর বেদীমূলে বলি দেওয়া হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তি সত্তাকে দমন করা হয় তার তিনি তীব্র নিন্দা করেন।[১২]

তবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাঙলা দেশের সেই বিরল মানুষদের একজন যিনি 'যূথবাদী' সভ্যতার (তার নাম 'সমাজতান্ত্রিক রুশিয়া' হলেও) আদর্শের বিরোধী হলেও পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবী রুশিয়ার সংগ্রামী সাধারণ মানুষদের শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হবার ব্যাপারটিকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আনন্দ-সংবাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। যে আত্মীয়তাবোধের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ গোটা পৃথিবীকে নিজের দেশ বলতে ভাবতে শিখেছিলেন সেই বোধই তাঁকে সোভিয়েট রুশিয়ার কোটি কোটি মানুষকে পরমাত্মীয় বলে জ্ঞান করতে শিখিয়েছে। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন গৌরববাহী ভারতবষায়-আদর্শের মূর্ত প্রতীক, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে দৃঢ়চিত্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনায় বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট-রুশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য-বিষয়ক ভাবনা চিন্তা প্রবলভাবে অনুভূত হবে এমন আশা করা ঠিক সঙ্গত নয়। পরন্তু একথা বলা সঙ্গত যে, পৃথিবীর যে কোনো শুভ ও মঙ্গলকর্মে, তা সে সময়-বিশেষে বিদ্রোহ বিপ্লব যাই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী তার কাছে পৌছবেই। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থখানি তারই প্রমাণ। কমিউনিজম বা স্যোসালিজম, জাত্যভিমানের গণ্ডী পেরিয়ে, যে আন্তর্জাতিকতাবাদের জয়গান করে, রুশ-বিপ্লবের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্ব-নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষে হলেও এবং স্বদেশের জন্য তাঁর ভালবাসা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁকে আমরা কোনো দিন জাত্যভিমানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ একবার দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে একপত্রে লিখেছিলেন, "I love India, but my India is an idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot—I shall ever seek my compatriots all over the word".[১৩]

রুশ-বিপ্লবের কাছে মানব-সভ্যতা বহু ঋণে ঋণী। সেই 'বিপ্লবের' ও ঋণী থাকা উচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহা মনীষার কাছে যিনি রুশ-বিপ্লবের আগে থেকেই বিশ্বজুড়ে তাঁর 'Compatriots' খুঁজে বেরিয়েছেন। শুধু রুশ-বিপ্লব কেন জগতে যেখানে যা কিছু শুভ ও মঙ্গলময় কর্মযজ্ঞ কবি দেখেছেন তাকেই তিনি সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্যদিকে জগতের যা কিছু ক্রূর, ভ্রান্ত ও হিংস্র তার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এমন বস্তু ও জগৎ-সচেতন শ্রেষ্ঠ মনীষার মননে ও সৃষ্টিতে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব পড়লেও তাকে সনাক্ত

করা সহজ নয়। একটি পূর্ব-প্রস্তুতি-হীন মানব-হৃদয়ে যুগান্তকারী কোনো ঘটনা যত দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম একটি প্রস্তুত-হৃদয়ে সেই ঘটনা কোনো অতিরিক্ত চমক বা বিস্ময় বহন করে আনেনা। রবীন্দ্রনাথ রুশ-বিপ্লবের সমসাময়িক, তিনি শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামে শেষোক্ত শ্রেণীর জয়ের খবর শুনেছেন, বিপ্লবের পরে রুশ-দেশ ভ্রমণে গেছেন, বিপ্লবের সুফলকে রুশ-সমাজের সর্বস্তরে অন্বেষণ করেছেন, গ্রন্থ-রচনা করেছেন—বিপ্লবের যতটুকু ভালো তাকে বন্দিত করেছেন, যতটুকু তাঁর মনঃপুত নয় তাকে তীক্ষ্ণ বাক্যে সমালোচনা করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্যান্য অনেকের মতো তাঁর রুশ-বিষয়ক লেখা আবেগ-তাড়িত, বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ চরিত্র ও মনোভঙ্গি যে কোনো কোনো রুশ-পণ্ডিতদের অজানা ছিলো এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপ্লবোত্তর রুশীয় চিন্তাবিদ্‌দের ধারণা কি ছিলো তা জানার কৌতূহল আমাদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মস্কোর অধ্যাপক পি.এস. কোগান একবার লিখেছিলেন (মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত) :

"অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, রাজনীতি ও সমাজ সংগঠনের ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের ঊর্ধ্বে ধ্যানসমাহিত রবীন্দ্রনাথকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহা ভুল। **অনন্তকালের চিন্তানিমগ্ন ভাবুকের সহিত একান্ত বর্তমানের সমস্যা নিমগ্ন বিপ্লবের কোনো বিরোধ নাই**, ঊর্ধ্বে সর্বশেষ শিখরে কোথাও একদা তাহাদের মিলন হইবেই। মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃত্বের 'স্বর্ণযুগের' আশাকে আমাদের বিপ্লব অলীক বলিয়া উপহাস করে না, এই ভাবাদর্শই বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সমস্ত ধর্ম ও মানব জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। এই ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই সাম্যবাদী বিপ্লবের পতাকা বহন করিতেছে। বিপ্লব মহান্ চিন্তার শত্রু ও সংহারক নহে বরঞ্চ সর্বহারা শ্রেণী নিজেকে ইহার একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে, মনে করে এই ভাবাদর্শকে কার্যে পরিণত করার ভার একমাত্র তাহারই।" যে সমস্ত উগ্র বিপ্লববাদী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মানুষ, লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবী এখনও এই ভ্রান্ত ধারণার অনুগত যে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে সমাজকে বদলে দেবার কর্মযজ্ঞে ভাববাদীদের কোনো প্রয়োজন নেই কিম্বা যে সমস্ত অরাজনৈতিক, নরমপন্থী, ভাববাদী লেখকগোষ্ঠী ও চিন্তাবিদ্‌রা মনে করে থাকেন যে বিদ্রোহ বিপ্লবে তাদের কিছু করার নেই কিম্বা 'সাম্যবাদ সাহিত্যিকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংহারক অধ্যাপক কোগানের এই বক্তব্য হয়তো তাঁদের ঐসব ভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। আমরা সময়মতো অন্যত্র এমন অনেক উদাহরণ উপস্থাপিত করে অধ্যাপক কোগানের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবো।

স্বামী বিবেকানন্দ [১৮৬৩-১৯০১]

যদিও অক্টোবর-মহাবিপ্লব সাধনের অন্তত পনেরো বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটেছিলো তবু এই মহাসন্ন্যাসীর জগৎ ব্যাপারে আশ্চর্য কৌতূহলী, সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন মন এই রকম এক মহাগণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। আমরা কেবল ধর্মনিষ্ঠ, অধ্যাত্মবাদী, বাস্তব জগৎ ও মানুষের ভবিষ্যৎ-ব্যাপারে নিস্পৃহ 'শুক্‌নো সন্ন্যাসী'দের ভবিষ্যৎ বাণীতে আগ্রহী নই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ঘুরে কলম্বো ও দক্ষিণ ভারত দিয়ে কলকাতায় পৌছন স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতায় ফিরে তাঁর প্রধান কাজই হয় 'রামকৃষ্ণ মিশনের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর মিশনের প্রধান-দপ্তর 'বেলুড় মঠে' স্থাপিত হয়। 'মিশন' প্রতিষ্ঠার পর, সমাজ-সেবাই হয় বিবেকানন্দের প্রধান কাজ। তখনই কিছু গুরুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁরা বলেন যে প্রচার, অধ্যয়ন, শাস্ত্রপাঠ ও সেবাকার্য থেকেও বড় ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করা। তাঁরা বিবেকানন্দের এই সব কর্মোদ্যোগকে তাঁর পশ্চিমী-শিক্ষা ও পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের কুফল বলে অভিহিত করলে ক্রুদ্ধ বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের জানিয়ে দিয়েছিলেন—"I am not a servant of Ramkrishna or any one, but of him only, who serves and helps others, without caring for his own Mukti".[১৪]

মাতৃভূমির দুর্দশার জন্য স্বামী সর্বদাই অন্তরে এক তীব্র জ্বালা অনুভব করতেন, তাই তিনি জনসেবাকেই শ্রেষ্ঠ 'ধর্মাচরণ' বলে জ্ঞান করতেন। জনসেবা করতে গেলে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতেই হবে এমন তত্ত্বে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। অথচ, তৎকালীন অখণ্ড বাঙলাদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিবেকানন্দের কর্মতৎপরতা, তাঁর একান্ত সহচর-সহচরীদের রাজনীতিতে তীব্র আগ্রহ, স্বামীর দেশাত্মবোধক উদ্দীপক ভাষণ ও নানা রচনা এবং সর্বোপরি 'স্যোসালিস্ট'-ভাবনা-চিন্তা সেই যুগে বিদ্রোহী যুব-সম্প্রদায়ের মনে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের জন্ম দিয়েছিলো। তাঁর অন্যতমা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী-আন্দোলনের নেপথ্যে এসে দাঁড়ান এবং অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের দীক্ষিত করেন।

বিবেকানন্দের অন্তরে ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য যে তীব্র দাহন ছিলো এবং সেই অভিশাপ থেকে ভারত-উদ্ধারের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক-প্রবণতার কথা গোপন থাকত না। রাজনীতি না ধর্মপ্রচার—এ দুটোর কোন্‌টা তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় এ দ্বিধা থেকে স্বামী কখনোই

মুক্ত হতে পারেন নি। যদিও তিনি প্রকাশ্যে তীক্ষ্ণ ভাষায় একটি চিঠিতে একবার লিখেছিলেন, "I am not a political agitator. I care only for the spirit···so you must warn the Calcutta people that no political significance be ever attached falsely to any of my writings or sayings".[১৫]

অথচ ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন—"···and yet again the Swami would recite long passages from Carlyle's French Revolution and they would all sway themselves backwards and forwards dreamily repeating together "Viva La Republique ! Viva La Republique !"[১৬]

"স্বামীজি মার্কসের সাম্যবাদের সহিত যে পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি জানিতেন যে, এই মতবাদের অর্থনীতি বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও ইহার দার্শনিক ভিত্তি নিছক জড়বাদমূলক—একেবারেই যুক্তি বিচার সহ নয়। পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রবাদী মাত্রই আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বামীজি কেবল অর্থনীতি নয়, পরন্তু মানব-জীবনের সকল বিভাগ, এমনকি ব্যক্তি মাত্রের প্রাত্যহিক জীবন পর্যন্ত বেদান্তের চরম সাম্যের নির্দেশে পরিচালনা করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ সর্বাংশে সমর্থন করিতে পারেন নাই।"[১৭]

তত্রাপি "···অজ্ঞ, নিরক্ষর, সামাজিক অত্যাচার ও অবজ্ঞায় নিপীড়িত, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ভারতের নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক জনগণের উন্নয়নের জন্য তাঁহার পূর্বে Working Class—কর্মী সমাজের উন্নয়নের জন্য এতটা চেষ্টা আর কে করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্যবোধ এতটা কে জাগরিত করিয়াছেন ?[১৮]

ভারতবর্ষের অধঃপতিত বিপুল জনগোষ্ঠীর দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকারের ভাবনা যে সন্ন্যাসীকে অহরহ বিচলিত করতো তিনি রাজনীতির চেতনা-শূন্য একথা অবিশ্বাস্য। ভারতবর্ষীয় অধঃপতিত 'শূদ্র'-সমাজের সমস্যা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা-চিন্তা যে তাঁর প্রবল বাস্তববুদ্ধি, সমাজ-চেতনা ও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক-বোধের পরিচয় বহন করে—তা ভগিনী নিবেদিতার বিবেকানন্দের উপর রচিত একটি 'বিশ্লেষণ-ধর্মী' রচনার উদ্ধৃতি নিয়ে প্রমাণ করা যায়। নিবেদিতা লিখছেন : "Vivekananda's passion of pity, however, did not concern itself with the Indian people only. True to his Oriental birth, he would always defend the small farmer or the small distributor against those theorists who seem to consider that aggregations (unite individual to

Company) of business are justified in proportion to their size. He held that the age of humanity now dawning would occupy itself mainly with the problems of the Sudra···. Later, in 1900, he had a clearer view of the underlying selfishness of **Capital** and the struggle for privilege and confided to some one that Western life now looked to him 'like hell'. At this riper stage of experience, he was inclined **to believe that China** had gone nearer to the ideal conception of human ethics than newer countries had ever done, or could do. Yet he never doubted that for man, the world over, the coming age would be "for the people".

"We are to solve the problems of the Shudra", he said, one day, "but oh, through what tumults! What tumults!"[১৯]

১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লব কি ঐ প্রচণ্ড 'tumult'-এর মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের 'coming age for the people'-এর স্বপ্ন-সাধন করেনি? এবং পৃথিবীর ঐ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কি বিবেকানন্দ কথিত 'Problems of Shudra'-র সমস্যা মীমাংসিত হয়নি?

তিনি যতই বলুন "I care only for the spirit"—কিন্তু শুধু 'Spirit' দিয়ে কি 'শূদ্রদের' সমস্যার সমাধান বা পৃথিবীতে 'জনগণের শাসন' প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? আসলে স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি ও ধর্মবোধের সমন্বিত প্রয়াসের ফলে উদ্ভূত এক অভিনব ও উন্নত স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন। কেননা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, তিনি মূলতঃ ছিলেন "···no student of economic sociality, but his Asiatic common sense and brilliant power of insight were of themselves enough to teach him that the labour-saving mechanism of Far West,—where vast agricultural areas have to be worked single-handed—could only introduced to the remote East—where a Tiny plot of land maintains its man or men—at the cost of overwhelming economic disaster···the problem of Asia today is entirely a question of the preservation of her old institutions at any cost, and not at all of the rapidity of inovation.·· India must find herself in Asia, not in a Shoddy Europe 'Made in Germany'."[২০]

'India must find herself in Asia'—এই প্রত্যয়ের কঠিন শিলায়, ইউরোপের রাজনীতি ও বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বার বার প্রতিহত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো মহা-প্রতিভারা দ্রুত পরিবর্তনশীল নানা যুগান্তকারী ঘটনায় সচকিত হলেও এ সত্য কখনো বিস্মৃত হননি যে ইউরোপের পন্থানুসরণেই কেবল ভারতবর্ষের দুর্দশামুক্তি সম্ভব নয়। অথচ পাশ্চাত্যে ঘটে যাওয়া নানা ঐতিহাসিক পরিবর্তন তাঁদের সত্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছিলো একথা সর্বাংশে সত্য। কিছু কিছু মতান্তর থাকলেও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালী-মনীষা ভারতবর্ষের মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ কিসে সাধিত হবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি একই অভিমত পোষণ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই সমন্বয়ী চিন্তাধারাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন—··"স্বামীজী রাজনীতিক ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য জাতীয়ভাবের সহিত ভারতের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ন্যায় ভারতেও খণ্ড বিখণ্ড দেশ ও মনুষ্যগোষ্ঠী মিলিত হইয়া এক স্বাধীন জাতির প্রতিষ্ঠা হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। **কিন্তু কোন্ মিলনের ভিত্তির উপর ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে এটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের একটি অতি কঠিন সমস্যা।** পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রধানতঃ ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য প্রভৃতির একত্বের উপর এক একটি ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক একটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, ইহার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভাষা বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানায় ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রাচীনকালেও যে সমুদয় ভারতবাসী যে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—এইরূপ মনে করার কারণ নাই। পরবর্তী যুগে মুসলমান আক্রমণের পরে ধর্মের প্রভেদ এই জাতীয়তার আর একটি প্রকাণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বাঙালী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া কোনো জাতি গড়িয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রেও দুইটি বিরুদ্ধ মত ও দলের সৃষ্টি হয়। একশত বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি ধর্মের ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরাও নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করিত। এই বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসীকে লইয়া এক অখণ্ড জাতি গঠন করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় জাতীয় কন্‌ফারেন্স ও পরে বোম্বাই শহরে জাতীয়-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমান মিলনের ভিত্তিতে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয় নাই। উন-

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আলিগড়ে সৈয়দ আহম্মদ যে স্বতন্ত্র মুসলমান জাতির দাবী তুলিয়াছিলেন, জিন্নার আমলে তাহাই পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতাগণ ৬০ বৎসর চেষ্টা করিয়াও এই সমস্যা'র সমাধান করিতে পারেন নাই—মহাত্মা গান্ধীর আপ্রাণ চেষ্টাও হিন্দু মুসলমানকে এক জাতীয়ত্ববোধে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং রাজনীতি ক্ষেত্রেও যখন একদিক ধর্ম ও অন্যদিক রাজনীতিক ঐক্যের উপর জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস চলিতেছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই দুয়ের মধ্যেও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।...

পাকিস্তানের সৃষ্টি দ্বারাই জাতীয়তাবাদের সমস্যা মিটিয়া যায় নাই, কারণ এখনও ভারতে বহুসংখ্যক মুসলমান ও পাকিস্তানে বহুসংখ্যক হিন্দু আছে। সুতরাং রাজনীতিকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে এক জাতি প্রতিষ্ঠার যে বাধা ছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান। এই বাধা দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম সংখ্যালঘিষ্ঠ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমূল উচ্ছেদ, দ্বিতীয় তাহাদের মধ্যে একটি মিলন সূত্রের আবিষ্কার। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ধর্মপ্রাণ জাতি—উভয়েরই সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং এই উভয়ের মিলনে যদি জাতি গঠন করিতে হয়, তবে ধর্মকে বাদ দিলে তাহার ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন জগতে যে সমুদয় জাতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম। এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাঁচিবে না—বাঁচিয়াও কোনো লাভ নাই। সুতরাং এই ধর্মের যাহা মূলতত্ত্ব, সেই আধ্যাত্মবাদের উপরেই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব—অন্য কোনো ভিত্তির উপর সম্ভব নয়,...

সাধারণ দূরদৃষ্টি ও ইতিহাস চেতনার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চবর্ণের ভূতকাল—তাহাদের ধ্বংস আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের মধ্য থেকে কারখানা থেকে।" ইউরোপে কার্ল মার্কস শূদ্র শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও এই শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে অন্য শ্রেণী আর সমুদয় উচ্ছেদের বার্তাই জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু এখানে স্বামীজী অসামান্য-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘর্ষের দ্বারা শূদ্র-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার কথা বলেন নাই। যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা শূদ্রের উৎকর্ষ-সাধন হয় এবং শূদ্র-আধিপত্যের যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি অব্যাহত থাকে—ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।...

সাম্য বলিতে তিনি সমান অবস্থার কথা নয়, সমান অধিকারের কথাই বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে এবং তা চিরকালই

থাকবে, সুতরাং সকল মানুষ এক রকম হইবে—এরূপ কল্পনা করা বাতুলতা। কিন্তু জগতে সকল মানুষেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। কৃত্রিম সামাজিক বিধানের জোরে কাহারও চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা খর্ব করা হইবেনা এবং কোন শ্রেণীকে কোন বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা দেওয়া হইবে না।···

দ্বিতীয়তঃ, তিনি উচ্চশ্রেণীকে নীচে টানিয়া নিম্ন শ্রেণীর সহিত সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণীকে শূদ্রে পরিণত না করিয়া শিক্ষাদীক্ষাদি দ্বারা শূদ্র প্রভৃতিকে উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন। এই জন্যই তিনি অনুন্নত শ্রেণী অর্থাৎ দরিদ্র-নারায়ণের সেবার প্রতি এত জোর দিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, এই শ্রেণীর আধিপত্য শীঘ্রই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুতরাং যাহাতে তাহারা এই আধিপত্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেইজন্যই তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।···শত শত শতাব্দীর ঘৃণা ও অবহেলার ফলে শূদ্রশ্রেণী যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে উচ্চশ্রেণীর পর্যায়ে পৌঁছিতে তাহাদের বহু সময় লাগিবে।···

···তৃতীয়তঃ স্বামীজী যে সাম্যের কল্পনা করিতেন, তাহার সহিত জাতীয়তাবাদের বিরোধ নাই। কার্ল মার্কস জগতের সকল দেশের শ্রমিককে একত্র হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্তমান কমিউনিস্টগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ শ্রেণীগত, দেশগত নয়। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টগণ রাশিয়া বা চীনের কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের সহিত যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদের সুখদুঃখ ইষ্টনিস্টের সহিত যে পরিমাণে জড়িত ও সহানুভূতিশীল, কমিউনিস্ট গণ্ডীর বাইরে ভারতের অগণিত অধিবাসীর সম্পর্কে সেরূপ নন। কমিউনিস্টদের সম্প্রদায় আছে, দেশ বা দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নাই।"[২১]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দের মতো মনীষা বুঝতে পেরেছিলেন যে "উচ্চবর্ণের ভূতকাল—তাহাদের ধ্বংস আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী।" তাঁরা জানতেন "নূতন ভারত" বেরুবে "লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথর মধ্য থেকে·· কারখানা থেকে।"

স্বামী বিবেকানন্দ রুশ-দেশে উচ্চবর্ণের সেই অবশ্যম্ভাবী বিনস্টি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। সে দেখা দূর থেকে বসে দেখা নয় বিপ্লবোত্তর রুশিয়াতে আমন্ত্রিত হয়ে সরেজমিনে বিপ্লবের ফলাফল দেখারও সুযোগ কবির হয়েছিল। তিনি শূদ্রশ্রেণীর এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে নতুন সোভিয়েট-রাষ্ট্রের নানা কিছুর ভূয়সী প্রশংসা করতেও দ্বিধা করেননি।

তবু বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি করতে হয় যে আজও স্বাধীন ভারতবর্ষে শূদ্র শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে 'নতুন ভারত'-এর জন্ম হল না।

'কেন হল না'? এই প্রশ্নের জবাবও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে। তাঁরাও চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে 'শূদ্র রাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, কিন্তু তা কার্ল মার্কস-এর শ্রেণী সংগ্রামে বা সমাজের অন্য সমুদয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়ে নয়, পরন্তু, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শ্রেণীকে জোর করে 'শূদ্র' না বানিয়ে বিদ্যাবুদ্ধি প্রদানের মধ্য দিয়ে শূদ্র শ্রেণীকেই উচ্চশ্রেণীতে উন্নত করা।

লক্ষ্য করার বিষয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের 'একনায়কতন্ত্র' রবীন্দ্রনাথের পছন্দ না হলেও সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরাট উদ্যোগ ও অগ্রগতি তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল ["···এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি, শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।"২২

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।"২৩

আমরা পূর্বেই বলেছি 'রুশ-বিপ্লব' যে রাজনৈতিক তত্ত্বকে ইতিহাসে পরিণত করেছে সেখানে স্থূল অর্থে 'ধর্ম' ও 'অধ্যাত্মবাদের' কোনো স্থান নেই। এই-খানেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে সোভিয়েট সমাজবাদের বিরোধ। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ধর্ম। শুধু বিবেকানন্দ বলে নয় অধিকাংশ ভারতীয়রই বিশ্বাস 'এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাঁচিবে না—বাঁচিয়াও কোন লাভ নেই·· অধ্যাত্মবাদের উপরেই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব অন্য কোন ভিত্তির উপর সম্ভব নয়।'

তাই আমরা সবিস্ময়ে দেখি সভ্যতার সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা, মহান্ অক্টোবর-বিপ্লব-সংঘটনের পরেও ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়-মনীষারা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বিচার-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতেই বেশি করে ভরসা পেয়েছেন। এদেশে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ত্যাগব্রতী বিপ্লবীদের কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন মহত্তম আদর্শ ও প্রেরণার স্থল। "Vivekananda vitalised the nationalism of India by putting it on a spiritual level and making it a clarion call of the Hindu to realise the value of the spiritual heritage, which it was their mission to spread to the West ··The Swami asked the Indians to shed fear and be manly and look upon the service of the country as the true worship of God."২৪

একথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে সংহত করে এক মহান্-দেশ-গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক সর্দার কে. এম. পানিক্কর স্বামিজীর এই ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, "…What gave Indian nationalism its dynamism and ultimately enabled it to weld at least the major part of India into one State was the creation of a sense of community among the Hindus for which the credit should to a very large extent go to Swami Vivekananda. This new Sankaracharya may well be claimed to be a unifier of Hindu ideology travelling all over India. He not only aroused a sense of Hindu feeling, but taught the doctrine of Universal Vedanta as the back ground of the new Hindu Reformation. The Hindu religious movements before him were local, sectarian and without any all-India impact.…It is Vivekananda, who first gave to the Hindu movement its sense of nationalism and provided most of the movements with a common all-India out look".[২৫]

স্বামীজির এই নূতন-ভারত গঠনের স্বপ্নকে পাছে কেউ সংকীর্ণ হিন্দুয়ানী ও একটি বিশেষ গোষ্ঠী-চেতনার ফল বলে না ভাবেন সেজন্য সর্দার পানিক্কর বলেই দিয়েছেন যে বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না।

ভারতীয় রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একবার বলেছিলেন "… স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে।"[২৬]

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের নানা সমস্যা সম্বন্ধেও স্বামিজী সচেতন ছিলেন। এই জনগোষ্ঠীকে বর্জন করে অখণ্ড ভারত-সংস্কৃতির কল্পনা করা যে ভ্রান্তিমূলক একথা স্পষ্টোচ্চারণে স্বামীজি বলেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অভ্রান্ত। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য ভগিনী নিবেদিতা ব্যাখ্যা করে লিখছেন… "As a factor in the evolution of modern India, he could never for a moment be forgetful of the loyal acceptance, by Islamic intruders, of the old Indian civilisation, and administrative system. Nor could he disregard the service

they had done, not only in exalting the social rights of the lowly-born, but also in conserving and developing, in too gentle a race, the ideals of organised struggle and resistance. He constantly pointed out that Mohammedanism had its, four fold 'castes' Syyed, Pathan, Mogul and Sheikh— and that of these Sheikhs had an inherited right to the Indian soil and in the Indian memory, as ancient and indisputable as those of any Hindu.···and finally, his highest prayer for the good of the Motherland was that she might make manifest the two fold ideal of 'an Islamic body and a Vedantic heart'."[২৭]

যে সন্ন্যাসী এতো উদারকণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে আমার মাতৃভূমির শরীর 'ইসলামী', ও হৃদয় 'বেদান্তিক' হোক : তিনি যে ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাসকারী মুসলমানদের কত বড় মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তার পরিমাপ আজও বোধ করি আমরা পুরোপুরিভাবে করে উঠতে পারিনি।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ [১৮৭২-১৯৫০]

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব-নির্ণয়ের প্রশ্নে যাঁরা তেমন ভাবে সাহিত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন না তাঁদের প্রসঙ্গ বারবার অবতারণা করার কারণ একটিই। বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ যথাক্রমে 'উদ্বোধন' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উভয়েই অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও ভক্তিমূলক গান ও কদাচিৎ একটি দুটি ছোটগল্পের রচয়িতা ছিলেন তবুও 'সাহিত্যিক' বলতে আমরা যা বুঝি তা তাঁরা ছিলেন না।

কিন্তু আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের উপর এঁদের প্রভাব প্রবলভাবে এসে পড়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ-এর চিন্তা-ভাবনা, চারিত্র্য ও জীবন-চর্যার প্রভাব এড়ানো সেই যুগের বাঙালি-সাহিত্যিকদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিলো না। আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের মানস-প্রকৃতি গঠনে এঁদের প্রভাব সুদূর-বিস্তারী হয়েছিল।

তাই মহান্ অক্টোবর-বিপ্লবের প্রবল জোয়ার এঁদের চিত্তের তটভূমি ছুঁয়ে গিয়েছিলো মাত্র—তাতে কোনো তীব্র ভাঙনের চিহ্ন এঁকে যেতে পারেনি, কারণ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষীরা বাঙালীর চিত্তে এমন বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল

করতে পেরেছিলেন যার ভিত্তিভূমিকে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতও উল্টে দিতে সক্ষম হয়নি।

এই সমস্ত মানবতাবাদী, স্বদেশ প্রাণ, ভারতীয়-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মনীষারা ভারতবর্ষের মুক্তি ভারতবর্ষের সনাতন কাঠামোকে অবিকৃত রেখে ও প্রয়োজনে বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মধ্য দিয়েই লাভ করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপের ঋণ গ্রহণে তাঁদের কোনো আপত্তি ছিলো না, এমনকি রুশ-বিপ্লবের ঋণও। তথাপি তাঁদের অন্তরের অন্তরতম বাণীটি যেন স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছিলো…"India must find herself in Asia, not in a shoddy Europe made in Germany".

স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদেরও পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষারা—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বা মাইকেল মধুসূদন দত্ত'রা কেউ সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না—যদিও তাঁদের কারো কারো রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো।

এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। উচ্চ-শিক্ষার জন্য শৈশবেই অরবিন্দকে বিলাতে পাঠানো হয়েছিলো। আই.সি.এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন থেকেই তাঁর মন রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলো। ঐ সময় অরবিন্দ লণ্ডনে Lotus and Dagger নামে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক গুপ্ত বিপ্লবী-সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন।

তারপরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসন কার্যে এবং পরে বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। তাঁর বরোদায় অবস্থানকাল ১৮৯৩-১৯০৬ সাল পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত ও বরোদায় কর্মরত এই বাঙালী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তখনও বাঙলায় কথা বলতে জানতেন না। ১৮৯৮ সালে দুর্গা পূজার কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীঅরবিন্দকে বাঙলাভাষা শেখাবার দায়িত্ব নিয়ে বরোদায় যান শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।[২৮]

এই বরোদা রাজ্যে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার বাঙলার ইতিহাসে এক অগ্নিগর্ভ যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলো। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের কোনো এক তারিখে এই দুই মহা-বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার ঘটে।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের একটি গুপ্ত-চক্র ছিলো। ঠাকুরসাহেব ছিলেন তার প্রেসিডেণ্ট। তিনি তখন দেশে ছিলেন না, বৈপ্লবিক কাজের শলা-পরামর্শের জন্য জাপান গিয়েছিলেন। তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অরবিন্দ সেই সময়ে ঐ গুপ্ত-সমিতির কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০২

সালের প্রথম ভাগে গাইকোয়াডের বাঙালী-দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (নিরালম্ব স্বামী) অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়ে বাঙলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার পরামর্শ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। অরবিন্দের নির্দেশে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সার্কুলার রোডে গুপ্ত-সমিতি করেছিলেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলকাতায় এসেছিলেন এবং মেদিনী-পুরে গিয়ে হেমচন্দ্র কানুনগোকে একহাতে গীতা ও একহাতে তলোয়ার দিয়ে গুপ্ত-সমিতির দীক্ষা দিয়েছিলেন।[২৯]

"শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার তিনটি দিক ছিল। প্রথমতঃ স্বাধীনতা-আদর্শের প্রচার ও সর্বহারাদের স্বার্থে কংগ্রেস দখল করা। দ্বিতীয়তঃ, বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস। তৃতীয়তঃ, বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন। আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রথম প্রয়াস (১৯০২-১৯০৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।"[৩০]

ভারতবর্ষের জাতীয়-আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা দুটি ভিন্নমুখী আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। যদিও উভয়পন্থার একটিই প্রধান লক্ষ্য ছিল— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জন। নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে ইংরেজেরই তদারকিহীন স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন। নরমপন্থীদের এই মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিকে আজ আমরা যত নিন্দাই করি না কেন, তবু নিরপেক্ষ বিচারে বলতে হয় তাঁদের রাজনীতি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁদের মনোভাবে তথ্য-নির্ভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য ছিলো। তাঁরা ধর্মের মতো সাংঘাতিক প্রশ্নটিকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপরদিকে চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ। তাঁরা চাইতেন আপোষহীন প্রতিরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। লালা লাজপত রায়, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্মের পোষাকে আবৃত করে এবং তার সাহায্যে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর সহজাত ধর্ম-সংস্কারে আঘাত দিয়ে তাদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন একটি মুসলমান ও অহিন্দু ধর্ম-বিরোধী ভারতবর্ষ গঠন করতে। তাই হিন্দু-অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে তিলক মহারাষ্ট্রে 'গণপতি' ও 'শিবাজী উৎসবের' সঙ্গে 'গোরক্ষা আন্দোলনের'ও সূচনা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল 'শ্রীকৃষ্ণ'কেই ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা বলে মনে করতেন। বার্মাতে অবস্থানকালে লালা লাজপত রায়ের উপর অন্তরীণ আদেশ (১৯০৭) জারী করার প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র পাল সারা দেশ জুড়ে 'রক্ষাকালী পুজো' ও 'শ্বেতছাগবলীর' নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়া'য়

প্রচ্ছদে জগদ্ধাত্রীর ছবি ছাপা থাকতো। অন্যদিকে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচ্ছদে শোভা পেত খড়্গ-সহ কালীর হাত।

এই উত্তরাধিকার বহন করে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও জনশক্তির বোধন ও শত্রু নিধনকল্পে বরোদায় 'বগলা' মূর্তি গড়িয়ে পূজো করেছিলেন (১৯০৩)। চরমপন্থী-দের নির্দেশিত রাজনৈতিক পথে ভারতীয় মুসলমান-সমাজ কেন আসেননি একথা বুঝতে আজ আর সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। চরমপন্থীদের আন্দোলন মূলতঃ হিন্দু-ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো বলেই চরমপন্থীদের জাতীয়-সংগ্রামে ভারতের সমগ্র জনগণের ঐক্যের বদলে বিভেদের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো। তাই চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যে শঙ্কিত হয়ে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মুসলিম-নেতৃত্ব দেশের মুসলমান-সমাজকে সহজেই বিপথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো।

একজন চরমপন্থী বিপ্লবী পরবর্তীকালে লিখেছিলেন "…বাংলা দেশের হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও মুসলমানদের মধ্যে এক-দল নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করলো।"[৩১] তিনি অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার লক্ষণ দেখা দেয়নি বলেই তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে বঙ্গ-বিভাগের সমর্থন পাওয়ার জন্য লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে এলেন।[৩২]

তবে একটি সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি যে "…শ্রমজীবী শ্রেণীর জনগণ সাধারণত কুলী, মজুর, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি সমিতির (অনুশীলন সমিতি, ১৯০৬-১৯০৮) সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়নি। …এদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার উপর যদিও কোনো নিষেধ ছিল না, কিন্তু এদের মধ্যে থেকে সমিতির সভ্য করার কোনো চেষ্টা হয়নি।"[৩৩] [স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন সন্ন্যাসীর বাস্তব-বুদ্ধি ও ভারত-চেতনার কাছাকাছিও এই সমস্ত চরমপন্থীরা পৌঁছতে পারেননি এটাই লক্ষ্য করার বিষয়—গ্রন্থকার]

বরোদা থেকে কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষই বাঙলার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করেন—এ ব্যাপারে সংশয় নেই। তাঁর সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্' [পর-বর্তীকালে, 'কর্মযোগিন্' (ইংরেজি), 'ধর্ম' (বাঙলা), ও 'আর্য' (বাঙলা) পত্রিকা-গুলিও তিনিই প্রকাশ করতেন] পত্রিকা ছিলো বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম মুখ-পাত্র। তাছাড়াও ছিলো মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজি 'অমৃতবাজার পত্রিকা', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', ও মনো-রঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' পত্রিকা।

এই সমস্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বাঙলাদেশে একটি চরমপন্থী বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি মাসিক 'ডন' পত্রিকাটিকে (১৮৯৭-১৯১৩) কেন্দ্র করে যে 'ডন

সোসাইটি' গড়ে ওঠে সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল, সিস্টার নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ নিয়মিত নানা বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন।

এই বিপ্লবী অরবিন্দের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিলো এই বিপ্লবীর প্রেরণার উৎস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' আদর্শেই শ্রীঅরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের যোগদর্শন ও বৈদান্তিক চিন্তা তাঁর মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তিনিও স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। [স্মরণীয়—'Twofold ideal of an Islamic body and a vendatic heart'—Vivekananda] তবে অরবিন্দের কাছে 'Islamic' হৃদয় কোনো প্রসঙ্গ ছিলো না। তিনি বলেছিলেন, "Our attitude is a political Vedantism. India, free, one an indivisible, is the divine realization to which we move,—emancipation our aim ; to that end each nation must practise the political creed which is the most suited to its temperament and circumstances".[৩৪]

অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সমসাময়িক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁর যৌবনের কর্মোদ্যোগ ও চরমপন্থী গ্রহণের ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে কেউ যদি অনুমান করে নেন যে শ্রীঅরবিন্দের এই বিপ্লব-চেতনার উপর রুশ বা অন্য কোনো 'বিপ্লব'-এর ছায়াপাত ঘটেছিলো তা হলে ভুল করবেন। শ্রীঅরবিন্দ অনেক ভাষা জানতেন, তাঁর বিশাল নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিলো এবং তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। সেই অরবিন্দকে 'বাঙলা' শেখাবার জন্য যে শিক্ষাগুরু (দীনেন্দ্রকুমার রায়) সুদূর বরোদায় গিয়েছিলেন, তিনিও অরবিন্দের বিশাল গ্রন্থরাজির মধ্যে "...বিপ্লববাদের সমর্থক কোনো গ্রন্থ—Revolutionary literature—"[৩৫] কোনোদিন দেখতে পান নি। অথচ তিনিই বলছেন, "রুশীয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিতেন, কি চিত্র শিল্পে, কি সাহিত্যে, রুশিয়া একদিন ইউরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"[৩৬]

অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, এই রুশ-স্তুতি, বিপ্লব-পূর্ব জার-শাসিত রুশিয়ারই স্তুতি— বিপ্লবোত্তর সমাজ-তান্ত্রিক রুশিয়ার নয়।

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন হয়তো কমিউনিজম বা ঐরকমের কোনো মতবাদের অধীনে পৃথিবীটা সংঘবদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাতে বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা পেলে তাদের মধ্যেও জাতীয় অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠবে। বিশ্বজনীন আদর্শ তখন বিসর্জিত হবে। [স্মরণীয় :..."বর্তমান কমিউনিস্টগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ শ্রেণীগত, দেশগত নয়। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টগণ রাশিয়া বা চীনের কমিউনিস্ট

সম্প্রদায়ের সহিত যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ…ভারতের অগণিত অধিবাসীর সম্বন্ধে সেরূপ নয়। কমিউনিস্টদের সম্প্রদায় আছে, দেশ বা দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নাই।"—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার] কমিউনিজম যে মানবতা-বিরোধী একথা শ্রীঅরবিন্দ বলেননি, বরঞ্চ মনে করতেন সমাজে এমন সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন আছে যার মধ্যে ব্যক্তি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। তার মতে : "The already developed systems which go by the name are not really Communism but constructions of an inordinately rigid State Socialism. But Socialism itself might well develop away from the Marxist groove and evolve less rigid modes ; a co-operative Socialism, for instance, without any bureaucratic rigour of a coercive administration, of a police state, might one day come into existence, but the generalisation of Socialism throughout the world is not under existing circumstance easily forseeable".[৩৭]

বিবেকানন্দ তাঁর ইতিহাস-চেতনা দিয়ে বুঝেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ অক্টোবর মহাবিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করে ও রুশ-দেশ পরিক্রমা করে এই প্রতীতিতে পৌছেছিলেন যে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শোষণমুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ রুশপন্থায় সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ধর্মে। এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না এবং বেঁচেও লাভ নেই বলে বিশ্বাস করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদের উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব অন্য কোনো ভিত্তির উপর নয়। তাঁরা কিন্তু কেউ এই সমন্বয়ী-চিন্তাকে কিভাবে ভারতবর্ষীও সমাজে সত্য করে তোলা যায় তার সঠিক পন্থা-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি। তবে সমাজ-শরীরে কোনো রাজনৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে গেলে যে সাধারণ জনগণের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বারবার বলেছেন। তাঁরা কেবল ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থিত 'সত্য'টিকে অকপটে প্রকাশ করেছিলেন—যে 'সত্য'টি জানা না থাকলে কোনো রাজনীতিকের সাধ্য নেই তাঁদের কল্পিত 'রাজনীতি'কে জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। বর্তমান ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের তাই তথাকথিত 'রাজনীতি'তে এতো অনীহা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ 'মার্কসিজম'-এর বাঁধাছক-মুক্ত এমন এক সমাজতন্ত্রের কথা কল্পনা করেছেন—যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে আমলাতন্ত্রের কঠোর দমন নীতি থাকবে না এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্র থেকে অনেক শিথিল ও সহিষ্ণু একটি সমবায়ি-সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে। অরবিন্দের এই মন্তব্যকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রাজনৈতিক বলে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এ মন্তব্য

একান্তভাবে একজন কবির স্বপ্নের মতো অলীক ও বিভ্রান্তিকর। মার্কসিজমের পথ ছাড়া আর কোন্ পন্থানুসরণে শোষকশক্তির হাত থেকে সর্বহারার মুক্তি ছিনিয়ে আনা সম্ভব তা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ করেননি।

ভারতবর্ষের গণমানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও তাদেরকে শোষণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। তাই তিনি জীবনের একটি পর্বে সক্রিয়-রাজনীতিতে শুধু নেতৃত্ব দেননি পরন্তু চরমপন্থা অবলম্বন করে ব্রিটিশ-রাজনীতিকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার প্রকাণ্ড কর্মযজ্ঞে নিজেকে জড়িয়েছিলেন।

দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন চরমপন্থী-আন্দোলনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখায় তাঁর রাজনৈতিক হতাশাও এসেছিল অনেক দ্রুত। তাই 'মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র' মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এক বছর কারান্তরালে (১৯০৮-১৯০৯) থাকার পর বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেছিলেন, "I looked round when I came out, I looked round for those, to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them. There was more than that. When I went to jail the whole country was alive with the cry of Bandemataram, alive with the hope of a nation, the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of Jail I listened for that cry, but there was instead a silence."[৩৮]

দেশের মধ্যে বিশেষ সাড়া না পেয়ে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক উদ্যম নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তবু তাঁরই উদ্যোগে ১৯০৯ সালে হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর অভিমত সমূহ অনুমোদন করে নিতে সক্ষম হন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার পুলিশের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। তখন অরবিন্দ প্রথমে চন্দননগরে আত্মগোপন করেন এবং পরে সবার অলক্ষ্যে পণ্ডিচেরি চলে যান। এইভাবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকা নেমে আসে। বস্তুতঃ, সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ তাঁর মানসিক-প্রবণতার বিরোধী ছিলো। তাঁর আত্যন্তিক অভিপ্রায় ছিলো অন্তরাল থেকে 'নির্দেশ' দান ও 'মানুষ' গড়ার চেষ্টায় মনোনিবেশ করা। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতির নিষ্ফলতা ও সে ক্ষেত্রে জীবনাদর্শ-পূর্তির ক্ষীণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে তিনি রাজনীতির জগৎ ছেড়ে যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। অনেকে শ্রীঅরবিন্দের এই সরে যাওয়াকে 'পলায়নী মনোবৃত্তি'র উৎকট প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন। তাঁর নিজের হাতে দীক্ষিত বহু বিপ্লবীও তাঁদের 'গুরুর' এই আচরণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন। আমরা সেই তিক্ত বাদানুবাদের প্রসঙ্গে যেতে

চাই না। শুধু শ্রীঅরবিন্দের শেষ চাওয়াটিকে তাঁর কারামুক্তির পর 'উত্তরপাড়া-ভাষণে' শুনতে পেয়েছিলাম—"We do not believe that by changing the machinery, so as to make our society the ape of Europe we shall effect social renovation ··. It is the spirit alone that saves, and only by becoming great and free in heart can we become socially and politically great and free."[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের মতো উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষাদের জীবনদর্শন, রাজনৈতিক-দৃষ্টিভঙ্গি ও বাঙালী গণ-মানসের।উপর তাঁদের রক্তাশ্রয়ী গভীর প্রভাবের কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলা হলেও বাঙালী গণ-মানসের উপর চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন চন্দ্র পাল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, এবং আরো অনেক প্রধান পুরুষদের প্রভাব গভীরভাবেই পড়েছিলো। ফলে, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাঁদের জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক-প্রত্যয়ের ছবিটি বারবার নানারূপে নানাভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৭

বাঙলা পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ঠীর উপর বিপ্লবের প্রভাব

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনায় একটি কথা আমাদের সবসময়ে স্মরণে রাখা উচিত যে বাঙলা-সাহিত্যের দিক্‌পাল লেখক, কবি তো বটেই, অনেক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারাও, বিখ্যাত সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিচিত্র বৃত্তির মানুষেরা এবং অত্যাধুনিক কালে নজরুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাঙালী লেখক ও কবি-সমাজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি-লেখকরা অনেকেই স্বকীয় সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন বলে শুধু তাঁদের 'সৃষ্টিতে' নয়, পত্রিকার 'চরিত্র' গঠনেও তাঁদের স্বকীয় জীবন-ভাবনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। শুধু তাই নয়, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র যূথবদ্ধ লেখকগোষ্ঠীই সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে নানা মতবাদের। আমাদের আলোচনার সময়-সীমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাদির কোনটি জাতীয়তাবাদ, কোনটি চরমপন্থা, কোনটি মধ্য-পন্থা, কোনটি নিরপেক্ষ, কোনটি বা ফ্যাসী-বিরোধী প্রগতিশীল বামপন্থার মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। আবার নির্ভেজাল সাহিত্য-পত্রিকাও ছিলো।

রুশ-বিপ্লবের প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে তাই আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের লেখক কবি প্রাবন্ধিকদের সৃষ্টির আলোচনা করলেই চলবে না, আলোচনা করতে হবে বাঙলার সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির যার সঙ্গে বাঙলাদেশের খ্যাতিমান লেখকগোষ্ঠী (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাঙলা পত্র-পত্রিকার উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব নির্ণয়ের আলোচনা আরো প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে এঁদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাঙলাভাষী জনগণকে অনেক দ্রুত ইতিহাসের সত্য আবিষ্কারে সাহায্য করতো, নানা বিতর্ক থেকে নানা 'সমস্যা'কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণা লাভ করতো।

আশার কথা, বাঙলা সংবাদ-সাহিত্যের উপর লেনিন ও রুশ মহাবিপ্লবের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিলো সে আলোচনার সূত্রপাত বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে।[১] সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে বাঙলাদেশে লেনিন-চর্চা, রুশ-সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদ, সোভিয়েট-ভারত সুহৃদ-সংঘের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের কর্মযজ্ঞ।

বাঙলা সংবাদ ও সমসাময়িক পত্র পত্রিকাদির উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলেও বেশ বিস্তৃত আলোচনা অবিনাশ দাসগুপ্ত মশাই তাঁর গ্রন্থে করেছেন। তিনি সেখানে শুধু রুশ-বিপ্লব নয়, সেই বিপ্লবের প্রাণপুরুষ লেনিনের প্রভাবের কথাও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তবে সে কাজ যে একা একজন গবেষকের পক্ষে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব—সে কথা তিনি বিনীতভাবে তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন।

আমি আমার গ্রন্থের এই পর্বে অবিনাশ দাশগুপ্তের আলোচিত বিষয়গুলির পুনরুক্তি না করে যে তথ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করবো। পাঠক তাহলে এই দুটি গ্রন্থের মধ্য থেকে বাঙলা-সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাগুলির উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কতটা পড়েছিলো তার মোটামুটি ও আরো কিছুটা বিস্তৃত পরিচয় আশা করি লাভ করতে পারবেন।

একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে আমাদের দেশে রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে, গোড়ার দিকে, কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো। বিভ্রান্তি কাটাবার জন্য বাঙলা জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে সেই ভ্রান্তি অপনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করলেও অনেকের মধ্যে কিন্তু সেই 'সংশয়' থেকেই গিয়েছিলো (রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহার মন্তব্য স্মরণীয়)। কিন্তু সংশয় ও বিভ্রান্তি থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু একথা সত্য বলে মেনেছিলো যে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ-দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারাদের এক অদৃষ্টপূর্ব শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এবং সে দেশ থেকে শোষণ, অত্যাচার ও সামাজিক বৈষম্যসকল চিরকালের জন্য বিদূরিত হয়েছে। এই সংবাদ, সেই যুগে, ভারতবর্ষের মতো পরাধীন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুক্ষীগত দেশগুলিতে, প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। শুধু বাঙলাদেশে কেন সমগ্র বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত পরাধীন কোটি কোটি মানুষের কাছে রুশ-বিপ্লবের এই সাফল্যের কাহিনী বড় আশ্বাস বহন করে এনেছিলো। কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী, চরমপন্থী, এমনকি নিছক ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরাও তাই

এই বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রাণ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি।

ঠিক এই জায়গাটিতেই আমরা অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সোজা ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলি। অখণ্ড বাঙলাদেশে সেদিন যাঁরা দলমত নির্বিশেষে রুশ-বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁরা একটি কল্যাণ কর্মকে অভিনন্দিত করেছিলেন মাত্র এবং এ কাজ মানুষ স্বততই করে থাকে। তাঁদের উচ্ছ্বাস-মণ্ডিত অভিনন্দন-বাণীকে লক্ষ্য করে কেউ যদি এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে এই মানুষেরা রুশ-বিপ্লবের মতো আরেকটি বিপ্লবে বিশ্বাসী বলেই এই ঘটনায় তাঁরা এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন তা হলে ভুল করবেন। এটাকে সঠিক ভাবে 'প্রভাব' বলা যায় না, বরঞ্চ বলা ভালো যে অখণ্ড বাঙলাদেশে অনেকের কাছেই রুশ-বিপ্লবের কাহিনী চেতনার উদ্দীপক-বিভাব রূপে কাজ করেছে। রুশ-বিপ্লবের 'ফল'কে সবাই বন্দিত করেছে, কিন্তু যে পথে রুশ-জনগণের শোষণ মুক্তি ঘটেছে সে পথ অনেকেরই মনঃপুত ছিল না। তবু বাঙলাদেশের মানুষ ও পত্র-পত্রিকাগুলি, সেযুগে, যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের যথার্থ ছবিকে পরিস্ফুট করে তুলতে দ্বিধাবোধ করেনি।

কিন্তু কিছু মানুষ ও পত্র-পত্রিকা নিশ্চয়ই ছিলো যারা রুশ-বিপ্লবের শিক্ষাকে কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকে গ্রহণ করেননি, অন্তরেও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরাই কেবল সুপরিকল্পিতভাবে কমিউনিজম, বলশেভিকবাদ, রুশ-বিপ্লবীদের জীবন ও তাঁদের বিপ্লবী কর্ম-কাণ্ডের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং সে ইতিহাস বাঙলাদেশের জনগণকে জানাতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

আমরা আমাদের আলোচনাকে সঠিক কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্য সেই পত্র-পত্রিকাগুলির পর্যালোচনা করতে চাই যারা রুশ-বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, নানা বিরোধিতার মধ্যেও কমিউনিজম, বলশেভিজম, সমাজবাদ, সর্বহারাশ্রেণীর প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কলম-যুদ্ধ চালিয়েছিলেন।

মানবিক কারণে ও সহজ ঔদার্যের বশবর্তী হয়ে এমনকি ইংরেজ রাজশক্তির রক্ত চক্ষুকেও অগ্রাহ্য করে অখণ্ড বাঙলাদেশের কিছু কিছু বাঙলা ইংরেজি দৈনিক ও অনেক পত্র-পত্রিকা সেদিন সাহস ও সাংবাদিক-সততার এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সব পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা এখানে যুক্ত করা হোলো।

সংবাদ পত্র

(১) অমৃতবাজার পত্রিকা (ইংরাজী); (২) বেঙ্গলী (ইংরাজী); (৩) ফরোয়ার্ড (ইংরাজী); (৪) দৈনিক বসুমতী (বাঙলা); (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা

(বাঙলা); (৬) বাঙলার কথা (বাঙলা); (৭) দৈনিক বঙ্গবাণী (বাঙলা); (৮) দৈনিক বাঙলা।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা

(১) অগ্রি ; (২) আজাদ (ঈদ সংখ্যা) ; (৩) উত্তরা ; (৪) কর্ম্মী ; (৫) জনসেবক ; (৬) তত্ত্ববোধিনী ; (৭) দেশ ; (৮) দেশের বাণী (নোয়াখালি) ; (৯) নব্যভারত ; (১০) প্রবাসী ; (১১) প্রাচী ; (১২) বঙ্গবাণী ; (১৩) বর্ত্তমান জগৎ ; (১৪) মাসিক বসুমতী ; (১৫) বাঙলার বাণী (ঢাকা) ; (১৬) বিজলী ; (১৭) বৈঠক ; (১৮) ভারতী ; (১৯) ভারতবর্ষ ; (২০) মালঞ্চ ; (২১) মানসী ও মর্ম্মবাণী ; (২২) মোসলেম ভারত ; (২৩) মাসিক মোহাম্মদী ; (২৪) যুগান্তর (শারদীয়া) ; (২৫) শঙ্খ ; (২৬) শান্তিনিকেতন ; (২৭) সৎসঙ্গী ; (২৮) সোনার বাঙলা ; (২৯) সংহতি ; (৩০) হিতবাদী ; (৩১) জমানা ; (৩২) কল্লোল।

অপরদিকে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা রুশ-বিপ্লবের বাণী প্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলো তারও একটি তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব। যদিও এই তালিকা পূর্বোক্ত তালিকার মতো দীর্ঘ নয় তবুও এই পত্র-পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব নির্ণয় প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সৎসঙ্গী' পত্রিকা ১৯২১ সালে লিখছে "…সমগ্র রুশ রাজ্যে লেনিনের কি রকম দোর্দণ্ড প্রতাপ, জনসাধারণের চিত্তের ওপরে তাঁর নামের কি রকম যাদু-শক্তি তা বর্ত্তমান ভারত ও গান্ধী মহারাজের তুলনায় আমরা কিঞ্চিৎ বুঝতে পারি।…মোট কথা, লেনিনের তুল্য শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে জগতের এই প্রথম পরিচয়। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের এ রকম সংযোগ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে ঘটেনি, সাহিত্যসৃষ্টি আর সংঘসৃষ্টির (Organisation) এত বড় প্রতিভা একটা মানুষে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি,…চরিত্রে এবং মহাপ্রাণতায়, প্রতিভায় এবং কর্ম্ম সামর্থে এই অতিমানবের (Superman) য বিরাট রূপ আমাদের চোখে ফুটে উঠেছে, তার পাশে অতীতের নেপোলিয়নেরা ক্ষুদ্রকায় বামনের মত দেখায়… লেনিন ব'লতে এসেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ কথা, দেখাতে এসেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার (Culture) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Logical conclusion)।…গরীব প্রজাসাধারণের আজীবন বন্ধু যিনি, তিনি সাম্রাজ্যলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ জর্ম্মন সম্রাটের গোয়েন্দা, একথা আমরা স্বীকার করতে পারলাম না, ইতিহাসও সে কথা কোন দিনই মেনে নেবে না।" [সৎসঙ্গী, লেনিন, বৈশাখ-ভাদ্র ১৩২৮]

এই প্রবন্ধটির লেখক বাস্তব তথ্যভিত্তিক, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রভাব, ১৯০৫ সালের বিপ্লব, শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য, লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মসূচী এবং আরও অন্যান্য বিষয় স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বাঙলা-সাহিত্যে 'সৎসঙ্গী'ই প্রথম পত্রিকা যা লেনিনের জীবনের একটি প্রামাণ্য ছবিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ১৯২১ সালে বাঙলাদেশে বসে রুশ-দেশ ও লেনিন সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ ছিলো না। সর্বোপরি রুশদেশ ও লেনিন সম্বন্ধে অকথ্য মিথ্যা প্রচারের বেড়া-জাল ছিন্ন করে সত্য ছবিকে লাভ করা কঠিনই ছিলো। প্রশংসা করতে হয় ঐ নিবন্ধের লেখককে, যিনি, লেনিন সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। লেনিন চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই বিশ্লেষণ করেছেন।

'বিজলী' পত্রিকা ১৮ই মাঘ ১৩৩০ সালের ১২ সংখ্যায় লিখছে—"লেনিনের মৃত্যু এবারের সত্য সত্যই ঘটলো দেখছি। তাঁর মৃত্যুতে রুশিয়ার রাজনীতিক গগনে আবার দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। সেখানে সোভিয়েট ও মডারেটে ঘরোয়া ঝগড়া বাধার উপক্রম হয়েছে। এরা এখন ট্রট্স্কীর উপর ভরসা করে আছেন। এদের বিশ্বাস ট্রট্স্কী ছাড়া দুই সম্প্রদায়ের মিলন অন্য কেউ ঘটাতে পারবে না। রুশ সৈন্যরাও ট্রট্স্কীর অনুগত হতে পারে।" [বিজলী, মাঘ, ১৩৩০]

'শঙ্খ' পত্রিকার ১৯২২ সালের ৪ঠা বৈশাখ সংখ্যায় লেখা হয়েছে "সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই, থাকিতেও পারে না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন লোকের উক্তি, সোভিয়েট রুশিয়াটাকে আমাদের নিকট একটা প্রহেলিকা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ জাতি-সমূহের উক্তি হইতে আমরা উহার স্বরূপ কতকটা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই, রুশিয়বিপ্লবের ধূমের অন্তরালে কত সত্যই না লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

[শঙ্খ, ৪ঠা বৈশাখ, ১৯২২]

'হিতবাদী' পত্রিকা ১৯২২ সালের ২ জুন তারিখে লিখছে—"বলশেভিক বিপ্লবে আতঙ্কগ্রস্ত ইংল্যাণ্ড মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, ভারতে বলশেভিকদের চিত্রিত করেছে নর-দানবরূপে, কিন্তু রাশিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে-প্রাণে খুশী যে এতদিনে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান হল।"

[হিতবাদী, ২রা জুন, ১৯২২]

'দৈনিক বাঙলার' ১৯২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে "ঘাতক, দস্যু, তস্কর, রাক্ষস—এমন কোনও বিশেষণ নাই যে নামে সোভিয়েট রুশিয়া অভিহিত হয় নাই।···কিন্তু সমস্ত কলঙ্ক মাথায় বহিয়া সোভিয়েট রুশিয়া আজও সগৌরবে বাঁচিয়া রহিয়াছে···সম্প্রতি আবার গুজব উঠিয়াছে—সোভিয়েট-গণ নাকি পুরোহিতগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেছে।···ইহা অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহাতে আর লাভ কি?"

[দৈনিক বাংলা, অগ্রহায়ণ ১৯২৭]

রুশ-বিপ্লবের প্রধান পুরুষ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিয়ে বাঙলাদেশের সেই যুগের খ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা রকমের লেখা বেরিয়েছে। লেনিনের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবন ও তাঁর সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নানা মিথ্যা রচনা সে যুগের পত্র-পত্রিকার কাছে উল্লেখযোগ্য সংবাদের বিষয় ছিলো। লক্ষ্যণীয়, ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি সম্বন্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্র-সেবী ও সাধারণ পাঠকদের একটি ঈষৎ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম সর্বদাই জাগ্রত ছিলো। লেনিন ভালো হন বা মন্দ হোন কিন্তু তিনি যে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন এসত্য স্বীকার করতে কারো কোনো দ্বিধা ছিলো না। তাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেনিনের বিস্তৃত জীবনী ছাপাবার একটি প্রবণতা আমরা সেই যুগে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। এবং লেনিন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই, অবশ্য-ম্ভাবী হয়ে ওঠে রুশ-বিপ্লব প্রসঙ্গ তাই যারা লেনিন সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদেরকেও অক্টোবর-বিপ্লবের প্রসঙ্গে সচেতন হতে হয়েছে। তাদের কাগজে লেনিন-সম্বন্ধীয় খবর তাই শুধু লেনিনকে নিয়ে শেষ হয়নি—ইতিহাসের অন্য প্রসঙ্গেও তাদের যেতে হয়েছে। এই ধরণের খবর যে সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে ছাপা হতো: তাদের প্রকাশিত খবরের কিছু উদাহরণ দেবো।

"বলশেভিক জুজু জুজু করেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের আরও রাশিয়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।" [মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা]

"ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের বিপুল মুসলমান জনগোষ্ঠীকে রুশের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রচার চালিয়েছিলো যে বলশেভিকরা মুসলমানদের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে। এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করে ১৯২১ সালের 'জমানা' পত্রিকায় লেখা হয় 'ব্রিটিশ সরকার বলশেভিকদের মুসলমানদের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে এতদিন মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলোর সাথে সোভিয়েট সরকারের মৈত্রী-চুক্তির বয়ান ঐ প্রচারের মুখোস খুলে দিল। ফলে দেখা গেল মুসলমান দেশগুলোর মুক্তির পথে সাহায্য করেছে বলশেভিকরা। এই সকল সংবাদ ভারতের মুসলমানদের বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল।" [জমানা, ৭ই এপ্রিল, ১৯২১]

বাঙলাদেশের নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি যে সেদিন ইংরেজের রুশ-বিপ্লব ও রুশ-দেশ সম্বন্ধে অকথ্য মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। কিছু উদাহরণ দেবো—

১৯১৭ সালেই ঐ সময়কার অখণ্ড বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'প্রবাসী'তে ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'সম্পাদকীয়'তে লিখছেন "... মানুষের নিজের দুর্দশা দূর না হইলেও অপরের আনন্দ দেখিয়া সে যে সুখী হয়,

ইহা মানব প্রকৃতির একটি মহৎ গুণ।…এতবড় একটা পরিবর্ত্তন কখনও কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প রক্তপাতে সাধিত হয় নাই।… এতগুলি জাতীয় লোকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। অন্য-সব দেশের চিন্তাভার, আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তরঙ্গ এখানেও আসিয়া পৌঁছে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া দরকার।" [সম্পাদকীয়— "রাশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ"—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪]

১৯১৭ সালে বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় রুশ-বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ধরা পড়লো 'রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব' নামক প্রকাশিত প্রবন্ধে। বিপ্লবীরা কিভাবে এই বিপ্লব সম্ভব করলেন তার ইতিহাস বর্ণনাই ছিলো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিয়দংশ উদ্ধৃত করি " সৈন্যদল পুষ্ট বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিয়া সরকারী বড় বড় অফিস ও মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের আবাস-ভবন ঘেরাও করিয়া গোলাগুলির দ্বারা ধ্বংস করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া সরকার পক্ষ পরাভব মানিতে বাধ্য হইলেন। একে একে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইলেন। বিদ্রোহের জয় হইল।"

[মালঞ্চ, বৈশাখ ১৩২৪]

বিপ্লবের সাফল্য ও রুশ সম্রাটের পরিণাম দেখে 'মোহাম্মদী' পত্রিকা উৎ-সাহিত হয়ে লিখলো "… এখন অচিরাৎ এদেশের জমিদারদের চালচলন বদলান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা নিজেরা না বদলাইলেও কাল তাঁহাদিগকে আপনিই বদলাইয়া দিবে। যে কাল একদিকে সসাগরা পৃথিবীর শাক্ত গর্ব্বিত সম্রাটকে প্রজাকুলের পাদমূলে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার তুলনায় এই নগণ্য জমিদার ত কোন ছার।" [মোহাম্মদী, 'প্রবাসী'তে পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩২৪]

১৯১৮ সালে ঐতিহ্যমণ্ডিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশ-বিপ্লবকে 'স্বাগত' জানালেন এবং সত্যধর্মের জয় ঘোষণা করলেন। বললেন— "…বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই ধর্ম্ম-বিরহিত র‍্যাসপুটিন নিহত হই-লেন, রুশিয়ার সম্রাট পদত্যাগপূর্বক প্রজাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রুশিয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল…আমাদের দেশে যদি নব-যুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ফলপ্রসূ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।" [বৈশাখ, ১৩২৫—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা]

ঐ একই বছরে বাঙলা-সাহিত্যের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'ভারতী' লিখলো "… রাশিয়ার বিপ্লব। সেখানকার বলশেভিক দল প্রজার বলকেই সম্বল করিয়া জারের প্রভুতন্ত্র এবং ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল।…প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চিরবিদায় লইল। সর্ব্বত্র যথার্থ আত্মক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এইজন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া দিলেন। আমরাও

ইতিহাস বিধাতার প্রলয় লীলার ভিতর দিয়া নতুন স্বষ্টির অপূর্ব্ব ছবি দেখিবার সুযোগ পাইলাম।

"উঠেচে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ" [অগ্রহায়ণ, ১৩২৫—ভারতী]

'বঙ্গবাণী' পত্রিকা (দৈনিক) সাম্যবাদের পরিণাম বিষয়ে লিখছে "সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রুশিয়া হইতে ধনতন্ত্রের শেষ চিহ্নও মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। পূর্ণ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাই লেনিনের আদর্শ ছিল অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া একেবারে কিছু থাকিবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় লেনিনকে আপনার আদর্শ খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল।···রুশিয়ার এই নীতি কতদূর সফল হইবে তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে। যদি সফল হয় তবে সেই সাফল্য অর্থ বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একটা নূতন যুগের স্বষ্টি করিবে। যদি বিফল হয়—সেই শিক্ষাও ব্যর্থ হইবে না।" [বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩৬]

১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংবাদ যে অখণ্ড বাঙলাদেশে প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদ-দৈনিক ও সাময়িক-পত্রগুলিকে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় করে তুলেছিলো সে বিষয়ে আজ আর আমাদের কোনো সংশয় নেই। তাই বিভিন্ন বাঙলা পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে রুশ-মহাবিপ্লব-সংক্রান্ত নানা ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। মিথ্যা অপপ্রচার ও ইংরেজ রাজশক্তির রক্ত চক্ষু ও সেন্সরশিপকে অগ্রাহ্য করে সেদিন ঐ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এক অসাধারণ সাংবাদিক সততার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। আমরা ইতিপূর্বেই ঐ সব পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি।

কিন্তু এইসব পত্র-পত্রিকা ছাড়াও আরও কিছু পত্র-পত্রিকা রুশ-মহাবিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলো। এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার রাষ্ট্রিক, আর্থ নৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব পত্র-পত্রিকাগুলি রুশ-বিপ্লব থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকের অধিকার অর্জনের লড়াই-এ সেই শিক্ষা প্রয়োগের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালিয়েছে।[২]

তাই রুশ-বিপ্লবের যথাথ প্রভাব এদের উপর পড়েছিলো বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। কোনো দেশে ঘটে যাওয়া কোনো বিপ্লব কিংবা যুগান্তকারী কোনো পরিবর্তন যদি অন্য কোনো দেশে কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কিছু ব্যক্তির বোধের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে—তাহলে বলতেই হয়, ঐ বিপ্লব বা যুগান্তকারী পরিবর্তন যথার্থ অর্থে তাদের প্রভাবিত করেছে। প্রভাবের প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। কখনো সেই প্রতিক্রিয়া প্রকট হয় বাহ্য সমর্থন-জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কখনো বা বোধ বা প্রত্যয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের মধ্যে।

বাঙলা-সাহিত্যে সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির উপর রুশ-বিপ্লবের এই দ্বিমুখী প্রভাব পড়েছিলো। প্রথম প্রভাবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে —এবার আলোচনা করবো দ্বিতীয় ধরণের প্রভাবের।

এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিলো, আত্মশক্তি, নবশক্তি, অরণী, ধূমকেতু প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের উপর।

আত্মশক্তি (১৯২২-১৯২৯)

এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২২ সালে কলকাতা মহানগরী থেকে আত্ম-প্রকাশ করে। পত্রিকাটি অবশ্য 'স্বরাজ্য দলের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির মনোভাব ছিলো উদার। তখনকার দিনে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জগতে সাপ্তাহিক আত্মশক্তির প্রভাব ছিলো অপরিসীম। রুশ-মহাবিপ্লব সংক্রান্ত সংবাদ, প্রবন্ধ ও মন্তব্য এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিলো সম্ভবত সবচেয়ে বেশি।

আত্মশক্তির জনপ্রিয়তার কোনো তুলনা ছিলো না। এই জনপ্রিয়তার কথা ঘোষণা করে মাঝে মাঝেই 'আত্মশক্তি'তে বিজ্ঞাপন বেরতো এই বলে—"যে কোন ছয়খানি বাঙলা সাপ্তাহিকের একত্রিত প্রচার সংখ্যা অপেক্ষা 'আত্মশক্তি'র সাপ্তাহিক প্রচার অধিক।"

বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং গোপাললাল সান্যাল।

'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে যেভাবে রুশ-বিপ্লবের বন্দনা রচিত হয়েছে, যেভাবে এই বিপ্লবের সুফলকে ভারতবর্ষের মাটিতে রোপন করবার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্লবের সত্য ছবি ও প্রভাব বাঙালী-চিত্তের উপর স্থায়ীভাবে পড়তে শুরু করেছিলো। শুধু সংবাদ পরিবেশনা নয়, এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য বিচিত্র রচনার মধ্যেও এই প্রভাবের পরিচয় ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। 'আত্ম-শক্তি' পত্রিকাকে ঘিরে বাঙলাদেশে যে প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের রচনাকে কেন্দ্র করেই বাঙলাদেশে রুশ-বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত একটি স্বতন্ত্র, অভিনব ও নতুন স্বাদের সাহিত্য-পরিমণ্ডল তৈরি হতে শুরু করেছিলো। আমরা কিছু কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত করবো—

'আত্মশক্তি' প্রকাশের প্রথম বছরেই 'ভিতর ও বাহিরের বিপদ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। এই রচনাটিতে লেখা হয় "…রুশিয়ার অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথমেই বলসেভিজমের কথা মনে আসে। রুশিয়ার মত ভারত প্রকাণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ। রুশিয়ায় শিক্ষিত

লোকের সংখ্যা যেমন ভারতবর্ষেও প্রায় তেমনি। উভয় দেশই ধর্মপ্রবণ, উভয় দেশেই জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সমাজসেবা ও বিপ্লববাদরূপে দেখা দিয়াছে। রুশিয়ায় বিপ্লবের কাজ বাধা পাইলেই সমাজ সেবার রূপ ধরিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, আর পরিশেষে বলসেভিজমে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ায় যে যে কারণে বলসেভিকবাদ প্রচার হইয়াছিল, ভারতবর্ষেও তার অনেকগুলি কারণ বর্তমান। যাহারা সমাজের ভিত্তির পাথরে চাপা পড়িয়া আছে আজ তাহারা সৌধবাসীদের কাছে আপনার স্বত্ব স্বার্থ বুঝিয়া পাইতে চায়। তাহা-দিগকে আর দাবাইয়া রাখা চলিবে না।

বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যদি এই সামাজিক বিপ্লব দেখা দেয় তাহা হইলে 'ছিন্ন খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ভারত' আবার হয়ত নূতন শত্রুর কবলে গিয়া পড়িবে।

এই বাহিরের ও অন্তরের বিপদ হইতে যদি আমরা বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের এই সমগ্র জাতিকে একভাবের ভাবুক করিয়া এক লক্ষ্যের সাধক করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। রুশিয়ার রক্ত গঙ্গা হইতে যদি এ দেশকে বাঁচাইতে হয়, একজোটে কাজ করিয়া যদি আপনাদের জাতীয় মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে হয় তাহা হইলে এখন হইতেই নানারূপ সদনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদিগকে জনসাধারণের ভালবাসা পাইতে হইবে···আজ যদি আমরা তাহাদের আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করি তাহা হইলে দুর্দিনে তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিবে, পরামর্শ শুনিবে নেতৃত্ব মানিবে। দেশের মধ্যে এই একপ্রাণতা যদি আমরা আনিতে পারি তাহা হইলে ভিতরের বাহিরের সব বাধা অতিক্রম করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারি।" [১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২।৪।১৯২২]

১২ই জুলাই ১৯২২ সালে "স্বাধীনতা সংগ্রামে রুশিয়ার একটি চিত্র" (প্রাপ্ত) প্রবন্ধে লেখা হয়েছিলো—"আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় রুশিয়া তাহার স্বাধীনতার জন্য কি তীব্র সাধনা করিয়াছিল তাহা জানিয়া রাখা ভাল। নিরাশয় দুর্দিনে তাহার জ্বলন্ত ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ইতিহাস আমাদের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিবে।···'নিহিলিস্ট'দের অধিকাংশই ছিল সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোক। ইহারাই, সাধারণের মধ্যে কার্য করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিল।···নিহিলিস্টদের মধ্যে ডাক্তার ছিল, প্রফেসর ছিল, ধাত্রী ছিল, ইহারা সকলে এক একটি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল।···জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার অন্তরায়ও ছিল অনেক।···হৈ চৈ করিবার তাহাদের কোন সুবিধা ছিল না। তাই তাহারা নীরবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নীরবে কাজ করিতে হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা যে কর্ম্ম সমাধা করিয়াছিল তাহার ফল বহু বৎসরের অত্যাচারেও নষ্ট না হইয়া ১৯১৭ সালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।···আমাদের দেশেও···জেলে যাইবার জন্য যত লোক যেভাবে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার

শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না আজ গ্রামে কাজ করিবার জন্য।···আমাদের দেশের এই অবস্থা দেখিয়া রুশিয়ার সেই মহান চিত্রপট চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে আর শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হইয়া আসে।''

[১ম বর্ষ, ১২ই জুলাই সংখ্যা, ১৯২২]

১৯১৭ সালের পরবর্তী কয়েকটি বছর ধরে ভারতবর্ষীও রাজনীতিতে নানা টানাপোড়েন চলছিলো। রুশ-বিপ্লব সার্থক না বিফল এ নিয়েও নানা বিভ্রান্তি ছিলো। ব্রিটিশ সংবাদপত্র সমূহের পরিকল্পিত মিথ্যাপ্রচারের মাত্রা ছিল না, ফলত, বুদ্ধি বিবেচনা স্থির রেখে ইতিহাসের সত্য ছবিকে অন্তরে গ্রহণ করা তখন সাময়িকপত্র পত্রিকাগুলির পক্ষে কঠিনই ছিলো। ব্যতিক্রম ছিলো 'আত্মশক্তির' মতো কিছু পত্র-পত্রিকা। সেই সময়কার সমাজ মানসিকতার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন 'আত্মশক্তির' নিয়মিত লেখক 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী মশাই। তিনি লিখেছিলেন ''···মতের কারও কোনও স্থিরতা নেই কিন্তু মেজাজ সবারই এক অর্থাৎ বেজায় চটা। প্রত্যেকের রাগ এই যে আর কেউ কিছু করছে না। দেশের জন্য দশের জন্য দেশের লোক কেউ কিছু ভাবে না, কেউ কিছু করে না, আর যে ভাবে সে ভুল ভাবে, আর যে কিছু করে সে অন্যায় করে অতএব ঝাড়ো সবার উপর ঝাল। সংক্ষেপে বাঙলায় আজ সবাই বিরক্ত, সবাই অসন্তুষ্ট। কার উপর বিরক্ত, কিসের উপর অসন্তুষ্ট ? সকলের উপর বিরক্ত সব জিনিষের উপর অসন্তুষ্ট। আমাদের সকলেরই মনের কথা এই যে একটা কিছু হওয়া চাই। আর যা হওয়া চাই তা হচ্ছে না, অথচ কি যে হওয়া চাই তা আমরা কেউ জানিনে, কেউ বলতে পারিনে।'' [৩০।৮।১৯২২, আত্মশক্তি]

'কি হওয়া চাই' এ বিষয়ে কিন্তু 'আত্মশক্তি'র বক্তব্য ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ-শিষ্য, বিশিষ্ট-চিন্তাবিদ্ শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত 'আত্মশক্তি'র ৫৮শ সংখ্যায় বোলশেভিকিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তী তার প্রতিবাদ করে 'আত্মশক্তি'তে লিখেছিলেন ''···আমি বলতে চাই শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে—পুরনো গীতার কোন বচন দিয়েই এই নতুন গীতার সৃষ্টি-শক্তির পরিমাণ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী বিরোধের কুরুক্ষেত্র ঢের বড়ো-আদর্শের দিক দিয়ে, মহত্বের দিক দিয়ে, সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলব এই জন্য যে তিনি তাঁর কঠোরতম বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে নতুন করে গড়তে পেরেচেন। এই ভাঙাগড়ার অনিবার্য ফলে যদি নলিনী বাবুর 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণ-

ত্রয়ের বিলোপ ঘটে থাকে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্ত দুঃখ করে লাভ নেই।...” [৩য় বর্ষ, ১লা জানুয়ারী ১৯২৯, ৪১শ সংখ্যা]

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মশাই-র মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার পক্ষে উপরের রচনাটিই যথেষ্ট। কিন্তু আরো আছে। বিদেশের কমিউনিস্টদের প্রচারে ভীত হয়ে তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার এসেম্ব্লিতে ‘পাবলিক সেফটি বিল’ বা বলশেভিক বিতাড়ন বিল নিয়ে জোর আলোচনা চালিয়েছিলো। সেই প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে ‘আত্মশক্তি’ অত্যন্ত দৃঢ়তা, প্রত্যয় ও সাহসের সঙ্গে ‘সম্পাদকীয়’ কলমে লিখেছিলো—

“...কমিউনিজম আমাদের দেশে আসিয়াছে কি আসে নাই, তাহার আলোচনাই বড় কথা নয়। যদি কমিউনিজম আসিয়াও থাকে, তাহা হইলেই যে আইনের সাহায্যে তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে তাহার কি কারণ আছে? আজকালকার দিনে এ কথা বলিবার অধিকার কাহারো নাই যে কমিউনিজম আমাদের দেশের ক্ষতি সাধন করিবে। মানুষের মনোরাজ্যে নতুন সৃষ্টির যে কল্পনা জাগিয়াছে, কমিউনিজম হইতেছে তাহারই প্রকাশ। সেই নবসৃষ্টি আমাদের জাতিকে উন্নতও করিতে পারে। জাতি হিসাবে রাশিয়া একসময় ইউরোপের জাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। কমিউনিজমের আদর্শ ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াই সে আজ সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছে। কমিউনিজম রাশিয়ার পক্ষে মঙ্গলপ্রদই হইয়াছে। আমাদের পক্ষেও তাহা মঙ্গলজনক যে হইবে না তাহা বলিবার অধিকার ক্রেয়ার সাহেবের বা ডেনিস ব্রে সাহেবের নিশ্চিতই নাই।...আমরা চাই ওই কমিউনিজমের-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতে জানিতে বুঝিতে যে আমাদের মঙ্গল করিবার শক্তি সত্যই উহার আছে কিনা। এই কারণে বিদেশ হইতে যাঁহারা কমিউনিজমের বাণী বহন করিয়া আসেন, তাহাদের কথা আমরা শুনিতে চাহি, চাহিনা যে এমন কোন আইন বিধিবদ্ধ হউক, যাহাতে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন। ...তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে বাহিরের প্রভাব না হইলেও কমিউনিজমের আদর্শ জাগ্রত হইতে পারে।” [সম্পাদকীয়, ৩য় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, ১৯২৯]

‘আত্মশক্তি’র ৩য় বর্ষের ৫০শ সংখ্যায় ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে’ সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অভিভাষণ মুদ্রিত হয়েছিলো। মহান্ অক্টোবর-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বভারতীয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ কি ভাবনা-চিন্তা করছিলেন তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে এই অভিভাষণে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন “...সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কীয় কোন মতবাদকে অভ্রান্ত ও অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করা সমীচীন নয়। অধিকাংশ ism বা মতবাদের ভিতর অল্পাধিক সত্য আছে। তাই Socialism (গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র)-এ সত্য যাহা

আছে আমরা তাহা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া fascism-এর শৃঙ্খলা সংঘবদ্ধতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা একেবারে বর্জ্জনীয় নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য যাহারা—সেই রুশ জাতি—কার্ল মার্কসের বাণী অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই। তা যদি করিত তাহা হইলে এত শীঘ্র রুশিয়াতে Bolshevism-এর প্রতিষ্ঠা হইত না। বস্তুতঃ Socialism-এর মূল তত্ত্বগুলি দেশকালোপযোগী করিবার পর রুশ জাতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে।"

[৩য় বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা, আত্মশক্তি]

'রুশ বিপ্লব' পৃথিবীর সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মনকে যে সত্যোপলব্ধি ও নতুন করে লড়াই-এর শপথ গ্রহণে উদ্দীপ্ত করেছিলো তা 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিবন্ধে বারবার স্বীকার করা হয়েছিলো। দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

(১) "আসলে লড়াই শুধু ভারতে রাজায় প্রজায় নয়।...সাধারণ লোক আজ ...ফিরে দাঁড়িয়েছে। সব দেশেই এই একই সুর জেগে উঠেছে।...আমরা খেটেছি আমরা কি পেলাম ?...এর ওষুধ একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়ে দিতে হবে, সামাজিক ওলটপালট করতে হবে।...এতদিন জানতাম আমরা—আমরা গরীব, বলহীন, সহায়হীন, সম্পদবিহীন, কিন্তু এবার দেখব আমরা দলবেঁধে দাঁড়ালে সবই সম্ভব।...যে গতর দিয়ে খাইবে তার মান উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কেরানীর উপর হওয়া উচিত। তোমরা কে ? জাত ত আমরা, এ একটা জগৎ জোড়া হাওয়া এসেছে। এর গতি থামাবে কে ?"

[৩রা জুলাই, ১৯২২, আত্মশক্তি]

(২) "অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ হয়ে গেছে। বুড়োরা যা ভাবেন তা মুখ ফুটে বলেন না...ছেলেদের মনে ক্রমে অন্য আশা, অন্য আদর্শ জাগছে।...সুখের কথা দেশে আর একটা দল গড়ে উঠেছে, সেটা শ্রমিকের দল, কুলি মজুর চাষাভুষোর দল।...তারাও শত্রুমিত্র চিনছে, তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এ স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাই হয়ত, নিজের পুঁটুলি বাঁচাবার চেষ্টা করবে।...কিন্তু এই কুলি মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই। লড়বার মত একটা আদর্শ আর একজোটে কাজ করবার শক্তি যদি এরা পায় তাহলে অসাধ্য সাধন করবে। এরাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে।" [২৫ অক্টোবর, সম্পাদকীয় 'চাই নতুন দল', ১৯২২]

আজ আমাদের বিস্ময়বোধ হয় এই কথা ভেবে যে মূলত 'স্বরাজ্য পার্টির' মুখপাত্র হলেও 'আত্মশক্তি' পত্রিকা ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েছে। সে সময়ে কুলি মজুর চাষাদের সংঘবদ্ধ করে যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে জেগে উঠছিলো তাদের অভিনন্দিত করা যে কত উদারতার উদাহরণ তা উপলব্ধি করতে পারি। শুধু তাই নয়, 'আত্মশক্তি' ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলো যে

লড়বার মত আদর্শ ও একজোটে কাজ করার সংঘশক্তি যদি এই নতুন দলের থাকে তাহলে এরাই অসাধ্য সাধন করবে এবং শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে। এই সততা ও উদারতার তুলনা সংবাদপত্রের ইতিহাসে কমই লক্ষ্য করা যাবে।

এবার 'আত্মশক্তি' পত্রিকার মধ্য দিয়ে নবযুগের বাঙলা-সাহিত্যের কোনো অভিনব শাখাপথ তৈরি হয়েছিলো কিনা সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত রচনা, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, গল্প-কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই পত্রিকাটি বাঙলাদেশের একটি প্রগতিশীল বুদ্ধি-জীবী-গোষ্ঠীকে একটি নতুন সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে আহ্বান করেছে। বাঙলা-সাহিত্যকে তার আঞ্চলিকতার গণ্ডী ভেঙে বিশ্বজনীন করে তুলেছে। তাই অক্টোবর-মহাবিপ্লবের মহানায়ক কমরেড 'লেনিন' বাঙলা আধুনিক-কবিতার একজন প্রিয় 'বিষয়ে' পরিণত হয়েছেন, গোর্কীর mother-এর একাধিক বাঙলা তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে, অনূদিত হয়েছে টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, মায়াকোভস্কি, শেখভের রচনাবলী ও সেইসঙ্গে রুশদেশের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস।

[এখানে একটি জরুরী প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। অক্টোবর-মহা-বিপ্লবের পর লেনিন বাঙলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন এবং এখন জনপ্রিয়তম হয়েছেন—কিন্তু ১৯১৭ সালের পরেও বাঙালী জাতির জানা ছিলো না এই কিং-বদন্তীর পুরুষটি দেখতে কেমন ছিলেন? বাঙলাদেশের কোন্ পত্রিকা লেনিনের ছবি প্রথম ছাপিয়ে আমাদের চোখে লেনিনকে প্রায় প্রত্যক্ষগোচর করে তুলে-ছিলো? এর উত্তর অনুসন্ধান করতে আমাকে বিস্তর পত্র-পত্রিকা ঘাঁটতে হয়ে-ছিলো। সমসাময়িককালে আমি 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতেই প্রথম 'লেনিনের' ছবি দেখেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ প্রমাণ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে আমি দৃঢ় থাকতে চাই যে ১৯২৮ সালের 'আত্মশক্তি' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যাতেই লেনিনের ছবি প্রথম ছাপা হয়েছিলো। 'শতাব্দীর সূর্য' শিরোনামে সেই সংখ্যায় শুধু লেনিন নন, সেই সঙ্গে মুসোলিনী, কার্ল মার্কস, জগলুল পাশা, সান-ইয়াৎ-সেন, কামাল পাশা, আবদুল করিমের ছবিও ছাপা হয়েছিলো—'আত্মশক্তির' একটি সম্পূর্ণ পাতা জুড়ে। কোথা থেকে সেদিন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।]

'আত্মশক্তি' পত্রিকা বাঙলা-সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় যে নতুন যুগের প্রবল স্রোত সংযোজিত করে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলতে সমর্থন হয়েছিলো তার বহু প্রমাণ আছে। ১৯২৭ সালে মজঃফরপুর সাহিত্য-সভায়, সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর বঙ্গসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির উপর প্রদত্ত বক্তৃ-তার একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি—
"...আমাদের সাহিত্য, আকার ও আদর্শে নাকি লঘু হয়ে আসছে, বিদেশী সাহি-ত্যের আবর্জ্জনা রাশির হীনানুকরণে আমরা নাকি আর উচ্চ আদর্শ কল্পনা কর্ত্তে

পারি না।...একথা ঠিক যে আমাদের সাহিত্যে আজকাল ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে রুশিয় সাহিত্যের প্রভাব আসচে আর কতকটা সেই রুশিয় সাহিত্যের প্রভাবেই আমাদের তরুণ সাহিত্যিকরা দেশের গরীব দুঃস্থ উৎপীড়িত লোকের সুখ দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন—বঙ্কিমের আদর্শ সাহিত্যের যাদের কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। তাতে করে আমাদের সাহিত্যের আকার ও আদর্শ যে কি করে লঘু হল তা বোঝা দুষ্কর। বিদেশী সাহিত্যের বা যে সমস্ত বাছা বাছা বই আমরা ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে পড়ি তাঁদের আবর্জ্জনা বল্লে হয়ত'বা দেশপ্রীতি প্রকাশ হয় কিন্তু সত্য বলা যে হয় না নিশ্চিত।...এইসব আক্রমণের টারগেট হচ্ছেন কতকটা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র ও প্রধানত কল্লোল ও কালি কলমের তরুণ সাহিত্যিকের দল।

...তাণ্ডবরত নটরাজের এক পা আজ এসে পড়েচে এশিয়ার বুকের উপরে, ভারতবর্ষ তার বাইরে নয়। সে নিষ্ঠুর বিক্রমে আমাদের সাধের রচা সমাজ ও ধর্ম্ম যদি খোলা ঘরের মতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তবে সাধ্য কি যে সংস্কৃত লেখা পুঁথির সাহায্যে আমরা তার অন্যথা করি। আজ সাহিত্য সমাজে যে বিপ্লবের স্রোত দেখা দিয়েছে এ সেই মহাপ্লাবনের সূত্রপাত। এ স্রোত আজিকার এই মজে যাওয়া গঙ্গার স্রোতের চেয়ে সহস্রগুণে বলীয়ান।"

এই বলিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছিলেন 'আত্মশক্তির' নিয়মিত লেখক—শ্রী অরিন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

১৯১৭ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলো 'আত্মশক্তি'র 'সাময়িক-সাহিত্য' কলমে শ্রীঅরসিক রায়ের আরো বলিষ্ঠ ঘোষণা—"বেঁচে থাকাটা মানুষের চরম লক্ষ্য না হলেও আমাদের যথেষ্ট ভাবতে হয় কি করে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যে লক্ষ্যের কথাই বলি তার গোড়ার কথা হল বেঁচে থাকা। তাই এ বেঁচে থাকার সঙ্গে ভাত ও রুটির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। আজকালকার আর্থিক জগতে এই ভাত-রুটির সমস্যাকে অনেকে চরম সমস্যা মনে করেন—তাই আমরা পাই Communism-Bolshevism প্রভৃতি। এই 'ism-এর মূল হল ভাতরুটি সমস্যা। সাহিত্যেও এদের স্থান দিতে হবে।"

[২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩রা জন, ১৯২৭, আত্মশক্তি]

ঐ সংখ্যাতেই সেদিন প্রকাশিত হয়েছিলো প্রখ্যাত কবি হুমায়ুন কবীরের 'দুঃখ-সাধনা' বলে একটি কবিতা। সেই কবিতার মধ্য দিয়ে যেন 'আত্মশক্তি'র সাধনার কথাই ঘোষিত হয়েছিলো—

'কাঁটার পথে চলতে হবে তোরে
তাহার লাগি সাধনা কর শুরু
আঘাতটুকু সইতে নার আজি ?

কাঁপে তোমার হৃদয় দুরু দুরু ?
সুখের আশা হৃদয় ভরি জাগে,
বিলাস লাগি হৃদয় ভরি ক্ষুধা,
কাঁটার পরে শয়ন রবে তব,
গরল হবে তোমার লাগি সুধা !
নাইক তরু, নাইক ছায়া পথে,
সাপের ফণা প্রতি চরণ ক্ষেপে,
মাথায় ভাঙি পড়বে আকাশ যবে
বজ্রে হৃদয় উঠবে কি তোর কেঁপে,
সঙ্গীহারা অগৌরবে, একা
বিপদ সহি, নিন্দা সহি শত,
আশার আলোয় আঁধারে পথ দেখি,
চলতে হবে তোমায় অবিরত !
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু
চিত্ত যদি মুর্চ্ছে পরে ভয়ে
আপন পথ সৃষ্টি করি তবু
হবে তোরে চলতে অসংশয়ে।''

'আত্মশক্তি'র ৩য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছে। বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ—

''...যারা পা ভাঙে বোঝা বয়ে সোজা হয়ে জনতার ভীড়ে
ঘর্মাক্ত শরীরে,
চাষ করি শ্রাবণে শিশিরে
লাঙলের ফালে যারা ভরি তোলে এই ধরিত্রীর
সোনার সঞ্চয়,
মৃত্যুরে ঠেকায় রাখে—বীর যারা এই পৃথিবীর
আপনারে নিত্য করি ক্ষয়
মানবের নিত্য পরিত্রাতা
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা
যারা
জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানে,
তবু সর্ব্বহারা
বসে নিত্য—দুর্ভিক্ষের তীরে,
আলোকের উৎস হয়ে' রহিল তিমিরে।

বঞ্চিত মহান,
তাহাদের সবার সমান——
···তাহাদের সবার সমান
চাহি মরণের অধিকার
তাহাদেরই ভুবনের কোণে
একান্তে গোপনে।"

['তাহাদের সবার সমান', শিবরাম চক্র, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯২৮]

'আত্মশক্তি'র ২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যায় শ্রীভারতকুমার বসুর 'মজুর' নামে একটি সাধারণ গল্প ছাপা হয়। গল্পটি অসাধারণ নয় কিন্তু কুলী-মজুর শ্রেণীকে যে একদল বাঙালী কবি-লেখক সাহিত্যের চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গল্পটি সংক্ষেপে এই—একটি বৃদ্ধ মুসলমান মজুর বয়সের ভারে শ্লথ হয়ে যাওয়ায় তার মজুরের চাকরীটি যায়। তার বৌ ও একটি ছোট মেয়ে ছিলো। মেয়েটি ক্ষুধায় কাঁদে। বাবা আবদুল মিঞা হাহাকার করে। হঠাৎ একদিন তারই আবার চাকরী জুটে যায়। ক্লান্ত দেহে সুখ স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে যখন মাথায় চূণ সুরকির কড়া নিয়ে উঁচু নির্মিয়মান বাড়িতে ভারা বেয়ে উঠছিলো তখন সে পা ফসকে নিচে পড়ে মারা যায়। ওদিকে বাড়িতে তার বৌ মেয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

নবশক্তি ঃ সম্পাদক—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (১৯২৯-   )

'আত্মশক্তি'র পথ ধরে এসেছিলো সুভাষচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকা। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যাই হোক তাঁর প্রগতিশীল মন রুশ-বিপ্লবকে দেখেছিলো স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি মানুষের সহজাত ঘৃণার আগুনের আলোয়। "ইংরেজ আমার শত্রু—আমার সেই ঘৃণ্য শত্রু যে বিপ্লবের বিরোধিতা করছে সেই বিপ্লব স্বভাবতই আমার সহায়ক হবার সম্ভাবনা—এই সহজ লজিক সেদিন রুশ-বিপ্লবের পক্ষে শিক্ষিত বাঙালীর মন কেড়ে নিয়েছিল।"[৩]

তাই 'নবশক্তি' পত্রিকায় বারবার রুশ-বিপ্লব প্রসঙ্গ এসেছে। এই জাতীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত আলোচনা, সমালোচনা ও নিবন্ধগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিংশ শতাব্দীর কুড়ি ও ত্রিশের দশকে রুশ-বিপ্লব সমর্থকদের রুশ-বিপ্লবের প্রশস্তি ও ভারতবর্ষে তার ফলকে আবাহন করে আনার যে আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছিলো সেই প্রবণতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করার লোকেরও অভাব ছিলো না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী, পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুপ্ত, অনুরূপা দেবী এমনকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সে সুরে গলা

মিলিয়েছিলেন। তবে এঁদের বক্তব্যকে দৃঢ় যুক্তিতে চ্যালেঞ্জ করারও লোকের অভাব ছিলো না। এই দুই পক্ষের বাদানুবাদকে অবলম্বন করে সেদিন যে দ্বৈরথ যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিলো তাতে নিরপেক্ষ পাঠকের লাভ হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি। তাদের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর তারা পেয়ে গিয়েছিলেন সেই বিতর্ক থেকে।

১৯২৯ সালের কোনো এক সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে 'বিপ্লব তত্ত্ব' সম্বন্ধে কিছু উপদেশাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। 'নবশক্তির' ৯ম সংখ্যায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিপ্লব ও বিদ্রোহ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন "...এ কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়, কোথাও দেখেছ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে Class War, বিপ্লবের মাঝে আছে Civil War; আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।" [নবশক্তি, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৯২৯]

যে কোনো ইতিহাস-সচেতন, রাজনৈতিক মানুষ শরৎচন্দ্রের এই বিশ্লেষণে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হবেন প্রাথমিকভাবে, কিন্তু প্রতিবাদে গর্জে উঠবেন পরমুহূর্তেই। সেই প্রতিবাদের গর্জন শোনা গিয়েছিলো উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ সমালোচনায়। তিনি লিখেছিলেন—

"...শরৎবাবু আপাততঃ বিপ্লবকে পাশ কাটাতে চান। তাঁর যেন ধারণা যে ঐক্য না হলে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয় না। আমার কিন্তু মনে হয় যে Civil War, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অভদ্র জিনিসগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যেই গজায় তা নয়, খাঁটি বিদ্রোহের মধ্যেও তার অভাব হয় না। আমেরিকা যখন স্বাধীন হবার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন আমেরিকার অর্ধেক লোক ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে। জর্জ ওয়াসিংটন শুধু ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেই রেহাই পাননি, স্বদেশী লোকের বিরুদ্ধেও তাঁকে বেশ যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল...তা সত্ত্বেও 'দেশের চরম শত্রু'কে পরাভূত করতে পেরেছিলেন।...স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপ্লবই হোক বা বিদ্রোহই হোক Civil War আর গৃহবিচ্ছেদ দেখা দেবেই দেবে। পরাধীন দেশের সমস্ত লোক ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে দেশকে স্বাধীন করে ফেল্লে অথচ Civil War বা আত্মকলহের নামগন্ধ দেখা দিলে না —ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে?" [নবশক্তি, ঐ, ঐ]

শরৎচন্দ্রের এই চিঠি নিয়ে পরবর্তীকালে 'নবশক্তি'তে ঝড় বয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, তার অধিকাংশই ছিল শরৎচন্দ্রের অনৈতিহাসিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে।

১৯৩০ সালে 'নবশক্তি' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'কাবলী-ওয়ালা' ও তার উত্তরে শিবরাম চক্রবর্তীর 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান' প্রবন্ধটি নিয়ে দুই লেখকের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। যে শিবরাম চক্রবর্তীকে আমরা পরবর্তীকালে তাঁরই উচ্চারণে 'শিব্রাম চকোত্তি' বলে জেনেছি, তাঁর লেখায় যমক ও শ্লেষ ব্যবহারের দক্ষতা দেখে বিস্ময় মেনেছি। মূলতঃ হাসির গল্পের লেখক বলে যাঁকে ধরে নিয়েছি—ভাবতে বিস্ময় লাগে বিংশ শতাব্দীর ২০-৩০ এর দশকে সেই শিবরাম চক্রবর্তী মার্কসবাদের সপক্ষে, রুশ-বিপ্লবের সপক্ষে, লেনিনের সপক্ষে রুখে দাঁড়িয়ে অভ্রান্ত বিশ্লেষণে বিরোধী-সমালোচকদের সমালোচনাকে থান্ থান্ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেই যুগে শিবরাম চক্রবর্তী অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাঙলাদেশে মার্কস-বাদের তাত্বিক-যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'নবশক্তি' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রবন্ধের প্রতিবাদী প্রবন্ধে শিবরাম চক্রবর্তীর বক্তব্য আমাদের সম্ভ্রম জাগ্রত করে। "··· ক্ষুধিত মুখ মানুষকে কিছুতেই অনন্তের দিকে উন্মুখ করানো যায় না। এই জন্যই, মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তাঁর আর্থিক প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন, তার মূলে কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই একথা সত্য, কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না।··· রবীন্দ্রনাথ না এলে আমাদের সমাজ কতটা অসম্পূর্ণ থাকত তা আমরা কল্পনা করতে পারি এবং কল্পনা করে ভীত হই। কিন্তু সমাজের বিরাট অসম্পূর্ণতার তুলনায় এ ভয় সামান্যই। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতই সম্পূর্ণতার অধিকারী এমন শতকোটি মানুষ আজ অপ্রকাশ হয়ে রয়েচে, যারা না এলে মানুষের সমাজ কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না।

বুদ্ধ থেকে অরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে ব্যর্থকাম হয়েছেন, কিন্তু লেনিন এইজন্যই কৃতার্থ যে তিনি জেনেছিলেন ও জিনিস কারু হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েচে। তিনি করে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, না খেয়ে শুকিয়ে মলেও ভেবনা, কেননা ওতে দেহই শুকোবে, তোমার আত্মার শুষ্কতা নেই। কিন্তু লেনিন প্রথম এসে বললেন, দেহই বা শুকোবে কেন? তারই আত্মস্থ হওয়ার সার্থকতা যে দেহী, যে বিদেহী তার নয়। এই জন্যই আত্মবাদী হয়ে সাম্যবাদী হতে আমার বাধে না। এই জন্যই, আত্মার ব্যাপারে, আত্মীয়তার ব্যাপারে ও আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে চরম individualist হয়েও Proletariat Dictatorship পর্যন্ত মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। কারণ আমি জানি সমানাধিকার বাদই মানুষকে মুক্ত করবে দেহের ক্ষুধা থেকে, আত্মার ক্ষুধার দিকে সমস্ত মানুষের

আত্মপ্রকাশ তখনই সহজ ও সত্য হবে। কেননা ক্ষুধার দাবীর কাছে যদি অনন্তের ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত না হয়, সুপারম্যানের ট্যাঁকে তার চাবি নেই।'

[সুপারম্যানের সুপারম্যানিয়া, নবশক্তি, ১ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, ১৯৩০]

ধূমকেতু ঃ সম্পাদক—নজরুল ইসলাম (১৯২২)

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র ৩ মাস ৪ দিন (১ম প্রকাশ ১৯২২ সালের ১১ই অগাস্ট, শুক্রবার, শেষ সংখ্যা ১৪ই নভেম্বর, মঙ্গলবার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)।

স্বল্পায়ু হলেও এই পত্রিকা অখণ্ড বাঙলা দেশে একদিন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে মসউদ আহমদ নামক চট্টগ্রাম-নিবাসী একজন 'হাফিজের' কাছ থেকে। যাঁদের পুরো কোরাণ মুখস্থ থাকে তাঁদের 'হাফিজ' বলা হয়। মসউদ আহমদ উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। এই মাদ্রাসায় ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হতো। সুতরাং বাঙলা ভাষায় এই নতুন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনায় কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো। তাই তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জনাব মুজফ্‌ফর আহ-মদের কাছে। কিন্তু মসউদ আহমদের স্বল্প-মূলধনের কথা শুনে মুজফ্‌ফর আহ-মদ পত্রিকা প্রকাশ করবার পরিকল্পনা বাতিল করে দেন।

কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম। 'ধূমকেতু' নাম নজরুলেরই দেওয়া। নজরুলের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই পত্রিকা অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকা-শিত হতে থাকলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নজরুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপনজনেরাও এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর কথা লিখেছেন। পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়, জনাব আজাহারুদ্দীন পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন। 'ধূমকেতু' কখনো অর্ধ-সাপ্তাহিক থেকে সাপ্তাহিক হয়নি। 'ধূমকেতু' প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার বেরিয়েছে (দু একটি সংখ্যা শনিবারেও বেরিয়েছে)। কোনোক্রমেই সোম ও বৃহস্পতিবার নয়।

নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' উঠে যাবার ১০ বছর পর 'নবপর্যায় সাপ্তাহিক ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩১ সালের ২২শে অগাস্ট শনিবারে। মনে রাখতে হবে, প্রথম 'ধূমকেতু'-র সঙ্গে পরবর্তী 'ধূমকেতু' পত্রিকার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। যদিও নবপর্যায়ের 'ধূম-কেতু'র উপরে লেখা থাকতো 'কাজী নজরুল ইসলাম প্রবর্তিত ও পরিচালিত'।

নব-পর্যায়ের 'ধূমকেতু'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৯৩১, ২২শে অগাস্ট, শনি-বার) নজরুল লিখেছিলেন 'ধূমকেতুর আদি উদয়স্মৃতি' নামক একটি প্রবন্ধ।

সেখানে তিনি লিখেছিলেন "তিমির ভালে অলক্ষণের তিলক রেখার মতই 'ধূমকেতু'র প্রথম উদয়। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক আবার ধূমকেতুকে আহ্বান করিতেছে।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে প্রথম-পর্বের ধূমকেতুর সঙ্গে দ্বিতীয়-পর্যায়ের 'ধূমকেতু'র কোনো সম্পর্ক ছিলো না। যদিও এই ধূমকেতুতে নজরুলের অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছিলো। নবপর্যায়ের 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিলো।

নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু'র জন্য একটি ছবিও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ছবিটি কার আঁকা জানা যায় না কিন্তু পত্রিকার নামের সঙ্গে ছবির বিষয়বস্তু সুন্দর খাপ খেয়েছিলো। একটি জ্বলন্ত ধাবমান ধূমকেতু ভীষণ বেগে ছুটে আসছে অসীম আকাশ বিদীর্ণ করে, যেন কাউকে প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য। পত্রিকার জন্য নজরুল অনেকের আশীর্বাণী পেয়েছিলেন। সবচেয়ে সুন্দর বাণীটি এসেছিলো রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তাঁর বাণীই হয়ে উঠেছিলো এই পত্রিকার আত্মা। বাণীটি এই—

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয়রে চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ, ১৩২৯ —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তখন একটা মন্থরতা এসেছিলো, কেমন একটা চুপচাপ ভাব সকল উন্মাদনা ও উত্তেজনাকে গ্রাস করতে চাইছিলো, কিন্তু দেশের অগণিত জনগণ সেটা চাইছিলেন না। হঠাৎ তাঁরা সবিস্ময়ে 'ধূমকেতু'র পৃষ্ঠায় অনুভব করলেন বহুযুগ সঞ্চিত সেই উত্তাল উত্তেজনা নির্গমনের বহির্মুখী বেগ। তাই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 'ধূমকেতু' তাঁদের হৃদয় জয় করে নিলো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন—"বিক্রিত সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দাদন দিয়ে চলে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে, দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়িতে কয়েক-মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম বক্তৃতা চলে।…জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি এমন করে ধাক্কা মেরে চলে 'ধূমকেতু' যে রাজশক্তি প্রমাদ গণে।"

এই আলোড়ন সৃষ্টি করার মূল কী? মূল ছিল অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয়, নিবন্ধাবলীর মধ্যে। গতানুগতিক সম্পাদকীয় নয় এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল যেন তাঁর লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করতেন। নজরুলের লেখা আগুন ঝরানো কবিতাবলী ছিলো এই পত্রিকার দ্বিতীয় আকর্ষণ।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'ত্রিশূল' ছদ্মনামে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আকর্ষণীয় নানা রাজনৈতিক লেখা লিখতেন। দেশের খবর, মুসলিম জাহান এবং পরদেশী পঞ্জী—এই তিন পর্যায়ে সংবাদকে ভাগ করা হত। মহিলাদের জন্য এই পত্রিকায় 'সন্ধ্যা প্রদীপ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলো। 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে কমিউনিস্ট নেতা জনাব মুজফ্‌ফর আহমেদের অনেক লেখা 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়েছিলো।

এই পত্রিকায় নজরুল ইসলামের লেখা সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও কবিতা সেই যুগে ধর্মান্ধ, গোঁড়া মুসলমান সমাজকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো। 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় 'লোকটা মুসলমান না শয়তান?' এই নামে মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদের একটা দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হয়েছিলো। তার কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য "…মুসলমানের ঔরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনার ন্যায় বর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং এ যুবক কোন্ ছার? ডাকাতের হাতে অস্ত্র, মর্কটের হাতে খন্তা আর অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতে কলম পড়িলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।…খাঁটি ইসলামী আমলাদারী থাকিলে ঐ ফেরাউন নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়ই। হতভাগা আরও লিখিয়াছে "কিন্তু সে দেখলে যে বাবা যত পেল্লায় দাড়ি রাখি, আর ওঠ বোস করে যতই পেটে খিল ধরাই ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হায়দরী হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্রষ্টার পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামী দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না।" সেইযুগে নিজে মুসলমান হয়ে গোঁড়া মুসলমান-দের ধর্মবোধ ও আচার অনুষ্ঠানকে ঐভাবে হায়দরী হাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে যে সাহস ও প্রগতিশীল বুদ্ধির ছাপ আছে তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ সুহৃদ কমিউনিস্ট-নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ চেয়েছিলেন নজরুল 'কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হোক। কিন্তু নজরুলকে দিয়ে সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি বলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—"সে যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে স্থির করেছিল তার সেই বিবেককে সে লাল পোষাক পরে, লাল কালিতে লিখে এবং মাঝে মাঝে লাল নিশানের কথা বলে ঠিক রাখছিল।"৪

মুজফ্ফর আহমদ একদা সেই ক্ষোভের কথা 'ধূমকেতু'তেই 'দ্বৈপায়নের পত্র' শিরোনামায় লিখেছিলেন। "...'ধূমকেতু' আমি রীতিমত পড়ছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে জিনিসটি চাইছি সেইটি ওতে আমি পরিস্ফুট রূপে পাচ্ছিনে।...কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনও ভেবেছো কি? একটা কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি, যদি তাদের কথা না ভাবতে শেখ তাহলে তোমাকে দিয়ে দেশের কোন সেবাই হবে না। প্রাণ দিলেও না। ওরাই দেশের শক্তি। তাদেরকে না জাগালে আত্মবোধ না শেখালে তোমার তথাকথিত ভদ্দর লোকেরা কিছুই করতে পারবে না, কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই, তারা জানে শুধু কৃষক শ্রমিকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে।"

নজরুল ইসলাম 'কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে' আত্মনিয়োগ করলে নিশ্চিতভাবে পার্টি শক্তিশালী হতো। কিন্তু নজরুল ইসলাম কেন সেই প্রত্যাশা পূরণ করেননি তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, নজরুলের চরিত্র, সাচ্চা কমিউনিস্ট হবার উপযোগী ছিলো না। তাঁর একান্ত বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নজরুলের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা' ও 'দারিদ্র্যজয়ী মুক্তপ্রাণের আনন্দ' ও 'বিরতিহীন সংগ্রাম'—ইচ্ছা যেমন ছিলো তেমনি সে ছিলো 'আত্মভোলা' ও 'দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম'-এর মূর্ত প্রতীক।[৫]

কমিউনিস্ট না হলেও তাঁর আগুন ঝরানো কলম অসাধ্যসাধন করেছিলো। "বাংলার ঘরে ঘরে ১৯২৮ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের ফুলকি ভরা নজরুল কবিতার 'সঞ্চিতা'।... নজরুল-রচনা পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ত্রিশের দশক জুড়ে গানের জোয়ার বাংলাকে মাতিয়ে রাখল।"[৬] নজরুলের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ও নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন "...কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুহৃৎ এই মহাভাগ অজস্র গান ছাড়াও লিখলেন উপন্যাস আর নাটক, যার মূল সুর বাজল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত অথচ অস্পষ্ট ধূমায়িত এক বিপ্লবের নকীবের বাঁশীতে।"[৭]

সোভিয়েট বিপ্লবের সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তি অর্জন করছিলো নজরুল ইসলাম তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও এই 'মহাভাগ' কমিউনিস্ট-আন্দোলনের একান্ত সুহৃৎ ছিলেন। তাঁকে বিপ্লবের 'নকীব' নিশ্চয়ই বলা যায়। সাচ্চা-কমিউনিস্টরা সাচ্চা থেকেও ভারতবর্ষে আজও 'বিপ্লব' সংগঠিত করতে পারেননি। নজরুল কমিউনিস্ট না হয়েও বিপ্লবের 'নকীব' হতে পেরেছিলেন এটা কিছু নিন্দনীয় হয়নি।

পরন্তু, একথা জনাব মুজফ্ফর আহমদও স্বীকার করেছিলেন যে, "১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী-আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান

ছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় করা হবে না।"[৮] আর আজ সবাই জানেন যে বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদী 'যুগান্তর দল' নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু'কেই তাঁদের মুখপত্র বলে প্রচার করেছিলো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুজফ্‌ফর আহমদের মতো সাচ্চা কমিউনিস্ট নেতা কেন নজরুল ইসলামকে কমিউনিস্ট হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং নজরুল তা না হওয়ায় কেন ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন? এর জবাব খুঁজতে হলে আমাদের অনেক পিছিয়ে যেতে হবে।

১৯১৮-১৯ সালে নজরুল ইসলাম ছিলেন করাচী সৈন্যনিবাসে। ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেণ্টের হাবিলদার। নজরুলের সামরিক ট্রেনিং-এর হাতে খড়ি হয়েছিলো পেশোয়ারের কাছে নৌশহরায়। এইখানেই কর্মরত থাকার সময় নজরুল 'ব্যথার দান' নামে একটি গল্প লিখে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সেটি মুদ্রিত হয়েছিলো ১৯২০ সালের ১৫ই জানুয়ারীর কাছাকাছি কোনো এক তারিখে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই গল্পের নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই লাল ফৌজে যোগদানের কথা ছিলো। এই গল্পের পটভূমিকায় ছিলো বালুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান, চমন প্রভৃতি এলাকার উল্লেখ। বালুচিস্তানের ঐ সব জায়গা থেকে সোভিয়েট দেশে পালিয়ে যাবার সম্ভাব্যতা বেশী ছিলো বলেই নজরুল তাঁর কাহিনীর স্থান নির্বাচন করেছিলেন ঐখানে।

গল্পটি আরো উল্লেখ্য এই কারণে যে মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবই ঐ গল্পের নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই যেখানে 'লালফৌজে' যোগদানের কথা ছিলো সেখানে 'লালফৌজ' কেটে 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' কথাগুলি বসিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো পুলিশের নজর এড়ানো।

এই সমস্ত কথা যে সত্য তা জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থে 'রুশ বিপ্লবী, লাল ফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক অধ্যায়ে স্বীকার করেছেন।[৯]

মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব নজরুলের বাঙালী পল্টনের জমাদার বন্ধু শম্ভু রায়ের চিঠির যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন (পৃঃ ২০৫-০৬) তা থেকে জানা যায় যে, নজরুল ইসলাম ঐ সময়ে কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে করাচী সৈন্যবাসে রুশ-বিপ্লব সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ সাহিত্য কিছু কিছু আমদানী করতেন ও তাই নিয়ে সোৎসাহে আলোচনা চালাতেন বন্ধু শম্ভু রায় ও আরো কিছু বিশ্বস্ত আপনজনের সঙ্গে।

নজরুলের জীবনের এই সমস্ত তথ্যাদি অবগত হবার পর সোভিয়েট-বিপ্লব সম্বন্ধে নজরুলের তীব্র আগ্রহের কথা অবগত হয়ে সঙ্গত কারণেই মুজফ্‌ফর আহমদ কাজীকে কমিউনিস্ট পার্টি ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এবং সে আশা নজরুল পূর্ণ করেননি বলেই তিনি ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। যখন রুশ দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ চলছে ঠিক সেই সময়ে নজরুল

ছিলেন রুশ দেশের এক সীমান্তের অত্যন্ত কাছে। ফলে বিপ্লবের নানা টাট্‌কা খবরের উত্তপ্ত আঁচ তাঁর মনকে নিশ্চিতভাবেই আশান্বিত করে তুলেছিলো যে বিপ্লবের পথে পরাধীন ভারতবর্ষের শোষণ মুক্তি কি একান্তই অসম্ভব? তাই কমিউনিস্ট হতে না পারলেও তাঁর কলম বিপ্লব-এর পক্ষেই ছিলো।

লাঙল, গণবাণী (১৯২৬-১৯২৮)—সম্পাদক : মুজফ্‌ফর আহমদ

১৯২৬ সালে অবিভক্ত বাঙলাদেশে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। সেই দলের নাম ছিলো 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। এই "কৃষক ও শ্রমিক দল ভারতের জনগণের দল। সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন কৃষক, কৃষিক্ষেত্রের মজুর, গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত মজুর, কারখানার মজুর, স্টিমার, নৌকা ও গাড়ি প্রভৃতি যানবাহনের কর্মী, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কেরানী, ছাত্র, স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতির সমবায়কেই আমরা জনগণ (Masses) নামে আখ্যাত করে থাকি। ভারতবর্ষে এই জনগণের সংখ্যা প্রায় শতকরা আটানব্বই জন।"[১০]

এই শতকরা আটানব্বই জন কৃষক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র ছিল প্রথমে 'লাঙল' পরে 'গণশক্তি' পত্রিকা।

১৯৩৬ সালে এই 'কৃষক ও শ্রমিক দল' (Workers and Peasant Party) 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' মতো আরো বড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়েছিলো বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়ের নামক স্থানে, ১৯৩৭ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে। সভাপতি পরিষদের সভ্য ছিলেন পাঁচজন : (১) বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, (২) ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) সৈয়দ আহমদ খান, (৪) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও (৫) মুজফ্‌ফর আহমদ।

'লাঙল' পত্রিকা ১৯২৬ সালে যাত্রা শুরু করে আর্থিক অচ্ছলতার জন্য এপ্রিলের পরে আর প্রকাশিত হতে পারেনি। ১২ই অগাস্ট ১৯২৬ তারিখে 'গণবাণী' প্রথম বেরিয়েছে, আর 'লাঙল', 'গণবাণীর' সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

বাঙলাদেশে এই দুটি পত্রিকা রুশ-বিপ্লবের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছিলো। এই দুটি পত্রিকা সাহিত্য-পত্রিকা না হলেও বাঙলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণাদায়ী হয়ে উঠেছিলো। বুদ্ধিজীবীদের স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছিলো তাঁরা সমাজে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের শ্রেণীশত্রু কে, কাদের কথা আগামী দিনের সাহিত্যে বড় করে তুলতে হবে, ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ সর্বনাশা ব্যাধির বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম চালু রাখতে হবে।

১৯২৬ সালের 'গণবাণী'তে লেখা হয়েছিলো "...রুশের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ে-

লিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি এখন আর নেই। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক বণিকদের হাত করে দেশের জনসাধারণকে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে। এই শোষণের হাত এড়াবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা।·· কংগ্রেস, ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়।···কংগ্রেসের মাথার ওপরে যাঁরা বসে আছেন তাদের সহিত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরো শোচনীয়। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংঘগুলো শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ···এই সকল কারণে একটা নতুন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল, আমরা এর নাম দিয়েছি 'কৃষক ও শ্রমিক দল'।

[গণবাণী : ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৬]

'লাঙল' ও 'গণবাণী' পত্রিকা দুটিই অবিভক্ত বাঙলাদেশের প্রথম যুগল-পত্রিকা যারা যথার্থ অর্থে কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলো। এই দুইটি পত্রিকার মধ্য দিয়েই অক্টোবর মহাবিপ্লব-এর রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বারবার ঘোষিত হয়েছিলো। দেশের শোষণমুক্তির প্রধান হাতিয়ার যে দেশের শ্রমিক কৃষকের মিলিত সংগ্রাম—একথাও এ পত্রিকা দুটি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো। তাই বাঙলাদেশে গড়ে ওঠা নতুন কমিউনিস্ট 'কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো প্রথমে 'লাঙল' ও পরে 'গণবাণী' পত্রিকা।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৬ সালের 'লাঙল' পত্রিকায় 'কোথায় প্রতিকার' নিবন্ধে তাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো "·· একটিমাত্র জিনিস, কমিউনিজম, আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কমিউনিস্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয়না। তারা ধনিকগণের লোভ লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করে কমিউনিস্টরা জগতে স্থায়ীশান্তি আনয়ন করবে।" [লাঙল : ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৬]

'লাঙল' পত্রিকা স্বল্পজীবী হলেও দূর বিদেশের কোথাও কোথাও এই পত্রিকা প্রেরিত হতো। বিখ্যাত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী প্রমথনাথ দত্ত ওরফে দাউদ আলী দত্তর সঙ্গে 'গণবাণী'র সম্পাদক জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ-এর পত্রালাপ থেকে জানা যায় যে 'লাঙল' পত্রিকা বিদেশে বাঙালী-বিপ্লবী ও বাঙলা-জানা অভারতীয়দের মধ্যেও বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলো।

একটি চিঠিতে প্রমথনাথ দত্ত 'লাঙল'-এর সম্পাদককে লিখেছিলেন, " এ

কাগজে প্রকাশিত হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসমূহ পাঠ করে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি।…লেনিনগ্রাডে আমার ঠিকানায় দুখানা 'লাঙল' ইতিপূর্বে আপনারা পাঠিয়েছেন,…আমার ছাত্ররা আমার বিনানুমতিতে সেই দুখানা 'লাঙল' পড়তে নিয়ে গিয়েছিল। যাক, আমার মনে হয় লাঙল যে শ্রেণীর কাগজ, সে শ্রেণীতে ভারতবর্ষে 'লাঙল'ই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে—অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে ভারতের আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের (Proletariat) জাগরণশীল শ্রেণী-চৈতন্যের 'লাঙল'ই প্রথম মুখপত্র…"[১১] [ইয়ালটা, দাউদ আলী দত্ত, ১০ই অগাস্ট, ১৯২৬]

এই চিঠির প্রত্যুত্তরে 'গণবাণী'র সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছিলেন, "…আমাদিগকে যেতে হচ্ছে চলতি ধারার বিপরীত দিকে, যাক, আমাদের কাজ যতদিন পারি আমরা করে যাব। তারপর যা হয় তা ভবিষ্যৎ দেখে নেবে।"[১২]

[সম্পাদক গণবাণী, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬]

সংহতি : সম্পাদক মুরলীধর বসু [১৯২৩ (বাংলা ১৩৩০), বৈশাখ, ১৯২৪]

'লাঙল' পত্রিকার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্রতী হতে দেখে একদিন প্রবাসী-বিপ্লবী দাউদ আলী দত্ত 'লাঙল' পত্রিকাকে "ভারতের আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের (Proletariat) জাগরণশীল শ্রেণী-চৈতন্যের প্রথম মুখপত্র" বলে ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু প্রমথনাথ দত্ত (দাউদ আলী দত্ত) জানতেন না যে 'লাঙল'-এরও আগে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রথমতম মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো 'সংহতি' পত্রিকা। দাউদ আলীর কাছে 'সংহতি' পৌঁছলে লাঙলের সম্মান তিনি 'সংহতি'-কেই দিতেন।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'কল্লোলযুগের' অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন "ভাবতে আশ্চর্য লাগে, দুটি মাসিক পত্রই (কল্লোল ও সংহতি) একই বছরে একই মাসে একসঙ্গে জন্ম নেয়। ১৩৩০, বৈশাখ। 'কল্লোল' চলে প্রায় সাত বছর, আর 'সংহতি' উঠে যায় দু'বছর না পুরতেই।…'সংহতি' কি ? সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সংঘ, সমূহ, গণগোষ্ঠী। যে গুণের জন্য পরমাণু সমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি। আশ্চর্য সেই নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।

আজকের দিনে অনেকেই হয়তো জানেন না, সেই 'সংহতি'ই বাঙলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথমতম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। সেই ক্ষীণকায় স্বল্পায়ু কাগজটিই গণ জয়যাত্রার প্রথম মশালদার। 'লাঙল', 'গণবাণী', 'গণশক্তি'—এরা এসেছিল অনেক পরে। 'সংহতি'ই অগ্রনায়ক।[১৩]

মুরলীধর বসু এই পত্রিকার সম্পাদক হলেও এর প্রাণপুরুষ ছিলেন জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' এক প্রেসকর্মী যিনি পঞ্চাশ বছরেই

ছাপাখানার বিষাক্ত টাইপ আর কদর্য কালি ঘেঁটে ঘেঁটে কঠিন ব্যাধি কবলিত হয়ে নিজের জীর্ণ বাড়ির একটি ছোট্ট ঘরকেই 'সংহতি' পত্রিকার দপ্তরে পরিণত করেন অদম্য উৎসাহে। শ্রমজীবীদের সুখী ভবিষ্যতে বিশ্বাসী এই রোগাক্রান্ত স্বপ্নাভিলাষী মানুষটির কথা আমাদের আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

এই জীতেন্দ্রবাবু একদিন চলে আসেন বিপিন পালের বাড়িতে। তাঁর ছেলে জ্ঞানাঞ্জন পালের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে।

বিপিন পাল বললেন, 'কি চাই ?'

'শ্রমজীবীদের জন্য বাঙলায় একটা মাসিকপত্র বের করতে চাই।' এমন প্রস্তাব শুনবেন বিপিনচন্দ্র যেন প্রত্যাশা করেন নি, তিনি মেতে উঠলেন। তিনি বলে উঠলেন : নিশ্চয়ই। দণ্ডে বের করুন, আর কাগজের নাম দিন 'সংহতি'।

·· প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কামিনী রায়ের কবিতা 'নিদ্রিত দেবতা জাগো'। সেই সঙ্গে বিপিন পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। জ্ঞানাঞ্জন লিখলেন 'সংহতির'র আদর্শ নিয়ে।···আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে আশীর্বাণী পাঠালেন, তার বাঙলা অনুবাদ ছাপা হলো পত্রিকার প্রচ্ছদে। আর রবীন্দ্রনাথ ? এক পরমাশ্চর্য সন্ধ্যায় পরম অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর এক অপূর্ব প্রবন্ধ এসে পৌঁছলো। সেই প্রবন্ধ ছাপা হলো জ্যৈষ্ঠর সংখ্যাতে।···নারায়ণ ভট্টাচার্য গল্প পাঠালেন, 'দিন মজুর'। শৈলজা (শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) তার মুক্তোর অক্ষর সাজিয়ে লিখে পাঠান গল্প। নাম 'খুনিয়ারা'।···'বাঙালী ভাইয়া' নাম দিয়ে শৈলজার···উপন্যাস বেরুতে লাগল 'সংহতি'তে।[১৪]

৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে সোভিয়েট-বিপ্লব ঘটার পর থেকেই সারা বিশ্বে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলো। ভারতবর্ষে ও সেই সঙ্গে অবিভক্ত বাঙলাদেশে বিভিন্ন স্তরে সে প্রভাবের মোটামুটি একটি ঐতিহাসিক ও তথ্যভিত্তিক বিবরণ দাখিল করার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। সে বিবরণ নানা কারণেই কৌতুহল উদ্দীপক, প্রেরণাপ্রদক ও ইতিহাসে নথীবদ্ধ হবার যোগ্য।

যদিও প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন নানা দমনাস্ত্রের জ্বালায় সে সময়ে সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র পত্রিকাগুলি ছিলো বিশেষ সাবধান। সোভিয়েট-বিপ্লব সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ সাংবাদিক বা রাজনৈতিকদের পক্ষেও সহজসাধ্য ছিল না। তবু বাঙালির ইতিহাস সচেতনতা, সাংবাদিক সততা ও দুঃসাহস নানা সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করে অক্টোবর-বিপ্লব, লেনিন ও বলশেভিকবাদের যথার্থ মূল্যায়ন করার ঐকান্তিক ও অনলস প্রচেষ্টা চালু রেখেছিলো।

বলাই বাহুল্য তাদের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। নবজাগ্রত সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে বাঙলাদেশের জনগণের মধ্যে কৌতুহল ও আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিলো। এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

"কিন্তু ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে যাদের সে বিপ্লবে সর্বাধিক আকৃষ্ট হবার কথা তারা কারা এবং কোথায় ছিল? বলা যেতে পারে তারা মুখ্যতঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী দল, আর তাদের নেতা ও কর্মীরা অধিকাংশই তখন হয় কারারুদ্ধ নয় অন্তরায়িত বন্দী, কেউ কেউ পুলিশের তাড়নায় অজ্ঞাতবাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন, অথবা সুদূর বিদেশে নির্বাসনে প্রায় বিচ্ছিন্ন। এক বাংলাদেশেই

সে সময়ে প্রায় ৪ হাজার যুবক রাজবন্দী, তাদের বৈপ্লবিক আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে, তারাও তাই বিপর্যস্ত. স্পষ্টরূপে সোভিয়েত বিপ্লবকে জানবার, বুঝবার সুযোগ থেকে তারাই সর্বাধিক বঞ্চিত।···সোভিয়েত বিপ্লবে উৎসাহিত হবার কথা শ্রমিক শ্রেণীর ও কৃষকদের। কিন্তু ভারতে তখনো শ্রমশিল্পের শৈশবাবস্থা, শ্রমিক-শ্রেণী অসংগঠিত, আর শোষিত বিক্ষুব্ধ কৃষক সাধারণ প্রায় বহির্জগতের সংবাদ বঞ্চিত।··

বোঝা প্রয়োজন, শাসকপক্ষের বাধা ছাড়াও এদেশের বিপ্লবীদের নিজেদেরও আভ্যন্তরীণ বাধা ছিল--বৈদেশিক শক্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা স্বাভাবিক, উৎকট জাতীয়তাবাদ সোভিয়েত আন্তর্জাতিকতায় সন্দিহান হবার কথা, আর ভারতের বিপ্লবীদের গীতা ও ধর্মনীতিতে অত্যধিক আগ্রহ সোভিয়েত নিরীশ্বরতাবাদ ও সহজ নীতিবোধের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হত। এই সব বাধা সত্ত্বেও তারাই যুগাবর্তনের উদ্গাতা হবার কথা, বিপ্লবী গণসংগঠনের প্রয়োজনও তাদেরই অনুভব করবার কথা। সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে অনিবার্য।

১৯১৮ থেকে ১৯৩৯, বিশ বছরের মধ্যে বাংলার বিপ্লবী চেতনায় ও আন্দোলনে এ পরিবর্তনই ঘটে। গুপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী চক্র থেকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এই শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণতিলাভ বিংশ শতাব্দীর ভারতের ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়।"[১]

বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের এ বিশ্লেষণ যে কতখানি অভ্রান্ত ও ঐতিহাসিক তা এই গ্রন্থের পূর্বাপূর্ব অধ্যায়গুলিতে তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূব পর্যন্ত অক্টোবর-মহাবিপ্লবের প্রভাব বাঙলা-সাহিত্যের বুদ্ধিজীবী মহলকে কতটা অনুপ্রাণিত করে বাঙলা সাহিত্যে তার ছায়াপাত ঘটাতে কৃতকার্য হয়েছিলো। বলাবাহুল্য যে প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়নি।

কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে রেডিও মারফত জানা গেল যে "সেইদিনই ভোর রাতে অতর্কিতে হিটলার বাহিনী অভূতপূর্ব অস্ত্রসমাবেশ নিয়ে সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করেছে আর আচমকা আঘাতে লালফৌজকে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি এবং পশ্চাদপসরণের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। এই আকস্মিক ও পরাক্রান্ত ফ্যাশিস্ট তাণ্ডবের সংবাদ জগৎকে স্তম্ভিত করেছিল, আর আমাদের মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েট ভূমি সম্বন্ধে নূতন এবং একান্ত আত্মীয় এক অনুভূতি। মনে আছে খবর শুনেই যোগাযোগ করি আমার তখনকার দুই নিকটতম বন্ধু ও কমরেডের সঙ্গে—স্নেহাংশু আচার্য ও জ্যোতি বসু। স্থির করি সেদিনই সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি (Friends of the Soviet Union, F.S.U.) নামে সংস্থা গড়ার জন্য কমিটি খাড়া করা যাবে, আর চেষ্টা

করা হবে অবিলম্বে সোভিয়েটভূমি বিষয়ে গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা প্রকাশ, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে। সর্বজনপ্রিয় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন সভাপতি, স্নেহাংশু এবং আমি সম্পাদকের ভার নিলাম, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেইদিনই বৈঠক বসল।"[২]

সোভিয়েট ভূমির উপর হিটলারের ফ্যাশিস্ট বাহিনীর আক্রমণ বিদ্যুৎগতিতে ইতিহাসের চাকাকে সুদর্শন-চক্রের মতো ঘুরিয়ে দিলো। সমগ্র ভারতবর্ষ তো বটেই সমগ্র বিশ্বের বিবেক চারপাশ থেকে বজ্রের মতো গর্জে উঠলো। অমিত মনোবলের অধিকারী লাল ফৌজ-এর আসল পরিচয় তখন আমরা জানতাম না, ফ্যাশিস্ট হিটলারও জানতেন না। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের অমৃত স্বাদ যে রুশ-জনগণকে অজেয় করে গড়ে তুলেছিলো বিপ্লবোত্তর এই কয়েকটি বছরে, তা অবশ্য জানা গেলো কিছুদিন পরেই, যখন লাল-ফৌজের পাল্টা মারে ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর নাভিঃশ্বাস উঠলো। আর ঠিক তখন থেকেই বিশ্বজুড়ে গবেষণা শুরু হলো কিভাবে এত দ্রুত এক বিপ্লব-জাত নবজাতক রাষ্ট্র পৃথিবীর হিংস্রতম শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে। তখনই রুশ-বিপ্লব, মার্কসবাদ, সমাজবাদ, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে সবকিছু জানবার আগ্রহ সবার মনে জাগ্রত হলো। বাঙলা সাহিত্যেও, এই পর্যায়ে, এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটলো।

কিন্তু সোভিয়েট-ভূমির উপর হিটলারের আক্রমণ যে সেদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষাদের ভয়ংকরভাবে বিচলিত করেছিলো তার অজস্র প্রমাণ আছে। সোভিয়েট প্রীতি থেকে নয়—মানবতা, সভ্যতা বিপন্ন বলেই সেদিন তাঁরা রুশের পক্ষে এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছিলেন। কিছু উদাহরণ দেবো।

কলকাতায় সদ্য স্থাপিত 'সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির' পক্ষ থেকে "সুরেশ গোস্বামী তখন গেলেন শান্তিনিকেতনে—রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশী। কবি রাজী হলেন সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে, তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে ইংরেজ নিজেদের স্বার্থে সোভিয়েটকে সাহায্য করবে বলছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস কোর না ওদের, তোমরা কমুনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা ঢিলা দিয়ো না। ...সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার পর ছয় সাত সপ্তাহের বেশি তিনি বাঁচেন নি। শেষ রচনাগুলিতে (যেমন Eleanor Rathbone-কে লেখা চিঠি) সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাঁর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল, আর সবাই তো জানি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কেবল জানতে চাইতেন যুদ্ধের খবর, বলতেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ-এর মতো অন্তরঙ্গ সহচরকে যে সোভিয়েট কখনো হার মানবে না।"[৩]

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক রোমাঁ রোলাঁর কথাই প্রথমে বলা উচিত। তিনিই বাইরের জগতের সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম রুশ-বিপ্লবের বন্দনা গেয়েছিলেন। বিপ্লবের বহু পরেও যখন দেশে দেশে বুদ্ধিজীবীদের মুখ

আর কলম থেকে কটূক্তি বর্ষিত হচ্ছে—সোভিয়েট-পরিকল্পনার কল্পিত অনাচার ও বার্বতা নিয়ে যখন নানাদিকে বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের ঝড় উঠেছে, রোলাঁ সেই মূঢ় কোলাহলে তাঁর কণ্ঠ মেলাতে পারেন নি। রোলাঁ বলেছিলেন, "One must live, first of all. Live at any cost. One can restore afterwards the reasons for living. The eternal values···This new order is entirely blood-stained, entirely soiled, like the human fruit that is torn from the womb of its mother. In spite of the disgust.···I go to the infant, I pick up the new born, he is the only hope, the wretched hope of humanity. It is yours.···"[৪]

সোভিয়েটকে দুর্বল করার জন্য যখন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছিলো এবং যাতে অনেক লেখক সাংবাদিকও ঢুকে পড়েছিলেন তখন শঙ্কিত রোঁলা লেখক-সমাজকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন "Throughout the world an insolent mobilisation of public opinion against revolutionary Russia, under the daily excitation of a Press attached to international commerce,···is frantically endeavouring to blow out the inconvenient torch of the Russian Revolution···. As for me, here is my hand. If the U.S.S.R. is threatened, whoever her enimies may be, I range myself by her side. Europe, if you start that monstrous struggle I will march against you, against your despotism, and your rapacity, for my breathren of India, of Indo-China of China and of every oppressed and exploited nation."[৫]

আমরা সবাই জানি সোভিয়েট-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কয়েক বছর ধরে যে দুর্দিন চলেছিলো তাকে পরাজিত করার রসদ সোভিয়েট পেয়েছিলো নানা দেশের জনতার সমর্থন থেকে। "সোভিয়েটের স্বকীয়-শক্তি ইতিহাসকে দীপান্বিত করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আগ্রহ হল সোভিয়েটের অক্ষয় সম্পদ। সেদিনের বিপন্ন সোভিয়েট ভূমি আত্মবিশ্বাস হারায়নি, এই ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব আর অজানা ছিল না বলে।"[৬]

জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আশ্বাস চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বজ্রের মতো গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হয়েছিলো।

আমরা তো রবীন্দ্রনাথ ও রোঁলার কথা শুনেছি, এবার শুনি দক্ষিণ আফ্রিকার এক আত্ত-বিপ্লবী ও South African Congress of Democrats-

এর সেক্রেটারী—Ben Turok-এর মন্তব্য। তিনি বলছেন "...If the Soviet Union had not existed, if there were no struggle of the masses of the people against their reactionary rulers in the United States, Britain, France, Germany, Italy, Japan and other capitalist countries, if not for all these in combination, the international reactionary forces bearing down upon us would certainly be many times greater than now."[৭]

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে যখন সমস্ত বিশ্বের শোষিত ও পরাধীন দেশসমূহের কোটি কোটি মানুষ সোভিয়েট ভূমিতে এক অসম লড়াই দেখেছিলো আর ভেবেছিলো যে এই যুদ্ধে যদি সোভিয়েটের পরাজয় ঘটে তাহলে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির আশা সুদূরে মিলিয়ে যাবে। তাই তখন পৃথিবীর যে কোনো সুস্থ বুদ্ধিজীবী সচেতন মানুষ এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন "সোভিয়েট আমারও দেশ। হ্যাঁ, একথা আবার বলি, যদিও মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি ভারতীয়, ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি, আমার দেশের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে আমি ভালোবাসি, ভারতবর্ষের মুক্তির চেয়ে বড়ো কোনো কামনা আমার নেই, তবুও আমি বলব যে সোভিয়েট-ও হল আমার দেশ।"[৮]

এই ছিলো দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতবর্ষ ও অবিভক্ত বাঙলা দেশের বহু মানুষেরই মনের কথা। বিশেষভাবে গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বহু মানুষ ও তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির। এই পর্বে কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের '৪৬ নং' বাড়িটি 'ইতিহাসে' পরিণত হয়েছিলো। মহান্ অক্টোবর-বিপ্লব, একটি নবজাতক, অভিনব সমাজবাদী-রাষ্ট্র ও তার কোটি কোটি মানুষের করায়ত্ব স্বর্গভূমি যেন ফ্যাসিস্ট দানবের হাতে নিশ্চিহ্ন না হয় সেজন্য সেদিন ভারতবর্ষে এবং সেই সঙ্গে অবিভক্ত বাঙলাদেশের সচেতন মানুষ, বিশেষ করে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা, দলমত নির্বিশেষে ফ্যাসী-বিরোধী নানা সংগঠনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়ালেও তা হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ছিলো নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে, প্রশ্নে, সংশয়ে কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু, মূলত প্রশস্তি-সূচক। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হবার পর এবং 'লালফৌজ' ও সাধারণ রুশ নরনারীর মরণপণ লড়াই-এর সংবাদ জেনে বিশ্বমানবের চমক লেগেছিলো। সদ্যোজাত একটি সমাজবাদী দেশ যখন গৃহযুদ্ধ, দারিদ্র্য ও হাজারো সমস্যার বেড়াজাল কেটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মুখে তখনই শিকড়শুদ্ধ তাকে উপড়ে ফেলার ফ্যাসিস্ট-চেষ্টাকে কী অদমনীয় মনোবল নিয়ে রুখছিলো তা বিশ্বকে

স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। অথচও বাঙলাদেশের সচেতন মানুষেরা সেদিন একথা বুঝতে ভুল করেন নি যে এই 'শক্তি' একটি জাতির অন্তরে সঞ্চারিত করেছিলো ঐ ১৯১৭-র বিপ্লব। তাই যথার্থ অর্থে বাঙালী-জীবনের বৃহত্তর অংশে সেদিন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো। আমরা রুশবিপ্লব, বিপ্লবোত্তর রুশ-সাহিত্য এবং রুশ-সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের বোধের গভীরেও সেদিন নীরবে আরো একটি 'বিপ্লব' সংঘটিত হয়ে গিয়েছিলো। সেদিনের ফ্যাসী-বিরোধী যে কোনো সংগ্রাম ও সাহিত্য-প্রচেষ্টা আসলে ছিলো রুশ-বিপ্লব-বন্দনা। এই পর্বে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব কিভাবে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রাম ও সাহিত্য-সাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিলো তার একটি প্রামাণ্য ও ঐতিহাসিক দলিল এখানে উদ্ধৃত করছি—

"ছেচল্লিশ অর্থাৎ ৪৬নং, ধর্মতলা ষ্ট্রীটের চারতলার ছোটবড় গুটি চারেক ঘর। 'আন্তর্জাতিক'-এর পাঠক ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহলীরা জানেন ঐ পত্রিকা তথা 'আন্তর্জাতিক' যার মুখপত্র যে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের ঠিকানা ওটি।···আসলে ষোলো সতেরো বছর ধরে···৪৬ নং এমন সব ভাবনা ও প্রয়াসের আধার হিসেবে সক্রিয় যার অন্তত কিছুটা ছাপ পড়েছে সমকালীন বাঙালী মনের ওপরে—আমার বিশ্বাস এ দাবি মোটেই অসঙ্গত নয়।

···বৃত্তান্ত শুরু করা যেতে পারে Y.C.I. বা ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট-এর কাহিনী দিয়ে। ১৯৪১ সনের গোড়ার দিকে মিশন রো থেকে উঠে এসে এঁরা আস্তানা গাড়েন ৪৬ নং এ।···নামে প্রকাশ Y.C.I. ছিল তরুণদের সংস্কৃতি সংঘ।·· উদ্যোক্তরা তরুণ হলেও যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিভীষিকা এবং ঐ দুই-এর নাড়ির যোগ সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন অথচ ঐ সব ভয়াবহতা সত্ত্বেও তাঁরা মানব প্রগতির সম্ভাবনায় আস্থা হারাননি।···উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কিছু কৃতী ছাত্র থাকায় তাঁদের মারফৎ প্রগতিশীল ভাবধারা সাধারণ ছাত্র সমাজ ও তরুণ মহলে ছড়িয়ে যেত অনেকখানি।

Y.C.I -এর একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদের দিয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডিরিক লেভি, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, অধ্যাপক শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। বিতর্ক সভাগুলিও বিশেষভাবেই জমে উঠতো। কারণ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, জন কেলাস, হুমায়ুন কবীর, নির্মলকুমার বসু, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা এতে যোগ দিতেন সোৎসাহে।

···ঐ বছরের (১৯৪১) ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলার-বাহিনীর তড়িৎ অভিযান ও তার প্রায় ছ'মাস পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানী-

দের অতর্কিত আক্রমণ দুনিয়ার ঘোরালো অবস্থাকে জটিলতর করে তোলে। ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনায় এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অধিকাংশ মানুষ। সে উদ্বেগ যে ভারতবর্ষের তথা সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবিধা-অসুবিধা বিচারের নিরিখেই তা বলাই বাহুল্য। তবু দেশের বুকে ব্রিটিশ আধিপত্যের নিদারুণ জগদ্দল পাষাণ চেপে থাকায় আমাদের দেশবাসীর আশ্চর্য সুস্থ অনাবিল জাতীয় চেতনাও যে সেদিন পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় দিগভ্রান্ত হয়েছিল অনেকখানি, এমনকি ফ্যাসি-জমের বিপদকেও ছোট করে দেখার ঝোঁকও যে দেখা গিয়েছিল কিছুটা একথা অস্বীকার করার যো নেই। সেই জটিল পরিস্থিতিতে বিভ্রান্তি অপসারণ ও সুস্থ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় প্রথমে (১৯৪১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে) 'সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি' ও পরে (১৯৪২ সালের ২৯শে মার্চ) 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'…১৯৪৫-এর পর সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'।

…সোবিয়েত সভ্যতা, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাঙলা দেশের মানু-ষের তখনও পর্যন্ত পরিচয় ছিল যৎসামান্য। Sea Customs—আইনের সতর্ক প্রহরা পেরিয়ে আসল খবর খুব অল্পই পৌঁছত এ দেশে। সাধারণ পাঠকের উপ-যোগী মালমশলার একান্ত অভাব ছিল। সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এড়িয়ে যে দু'চারটি বই বা পুস্তিকা এদেশে প্রকাশিত হত তাতে খবর থাকত সামান্যই হাজারো বিরুদ্ধতা ও কুৎসার তোড়ে তার ভেসে যেত অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তেই বোধ হয় সাধারণ বাঙালী সর্বপ্রথম সোবিয়েত সভ্যতার একটি দরদী ছবি দেখলেন আর তারও প্রায় এক দশক পরে হাতে এল সুরেন ঠাকুরের 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'।

একে এক বিপুল অপরিচয়, তার ওপর তখনকার যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়ার মুখে সেদিন 'সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি' বাঙলা দেশের মানুষের কাছে সোবিয়েতের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে। এই কাজের গুরুত্বের অনুপাতে ঠিক কতটা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেদিন তার নির্ভুল হিসেব কষা আমার সাধ্য নয়। তবু অসংশয়ে বলতে পারি যে ছোটখাটো ঘরোয়া বৈঠক থেকে শুরু করে বড় বড় জনসভায় সোবিয়েত প্রসঙ্গ অবতারণা, গ্রন্থপুস্তিকা, নানারকম সংকলন ও পত্রিকাদি প্রকাশ, সোবিয়েত জীবন বিষয়ক পোস্টার বা ফিল্ম প্রদর্শনী প্রভৃতির মারফৎ সমিতি সেদিন নির্ভীক পথিকৃতের কাজ চালায়।… সেদিনকার জটিল অবস্থাতেও সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছিল তার কারণ একদিকে ভারতবাসীর গভীর গণ-তান্ত্রিক চেতনা ও অন্যদিকে কিছু মহাপ্রাণ নেতা ও কর্মীর অশ্রান্ত, আন্তরিক প্রচেষ্টা। এঁদের মধ্যে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রথমেই স্মরণ করি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়েদের নাম।...ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বার্ধক্যের পিছুটান হেলায় উপেক্ষা করে তখন শুধু জনসভায় নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন ফ্যাসিজম বিরোধী ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাণী নিয়ে। জলন্ত দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা ও সোবিয়েত সৌহার্দ্যের পরম মিলন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সেদিনকার তৎপরতায়।"...৯

এই 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' সেদিন অবিভক্ত বাঙলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঝড়ের উন্মত্ততা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। সমাজের সর্বস্তরে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিলো সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি তাদের আনুগত্যকে এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁদের ফিরতে হয়েছিলো বারবার রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসের মধ্যে, রসদ আহরণ করতে হয়েছিলো কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ, লেনিনের দূরদৃষ্টি ও সাংগঠনিক দক্ষতা ও সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শ থেকে।

তার পরিণামে Y.C.I. "একেবারে শেষের দিকে নিজেদের লেখা দু' একটি গান গাওয়াও শুরু হয়েছিলো। কিন্তু সর্বসাধারণের সামনে জনসভার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে স্বরচিত দেশাত্মবোধক ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন করে সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি।...সেই আগুন (সুরের) ছড়িয়ে গেল সবখানে। শুধু জনসভায় নয়, শুরু হল পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে (আর তারও পরে পল্লী অঞ্চলের বাজার হাটেও) গান গাওয়ার পালা। সম্বল সুভাষের (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) 'বজ্রকণ্ঠে তোলে আওয়াজ' ও আরো দু'-চারটি কারো হাতে লেখা গান।...আর বিনয় রায় বা দেবব্রত বা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র থাকলে ব্যস্ত পথচারীরাও ভীড় করে আসতেন মনে পড়ে। পরে গান ও অভিনয়ের ভার প্রথমে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ' এবং তারপর 'গণনাট্য' সংঘের ওপর বর্তায়।"১০

"ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘে''র জন্ম ১৯৪২ সালে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখা ছিল বাঙলাদেশে।...কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল একেবারেই। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটল সেটি হচ্ছে দেশী ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের হাতে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের অপমৃত্যু (৮ই মার্চ, ১৯৪২)। ঐ মৃত্যু সেদিন গভীরভাবেই নাড়া দিয়েছিল বাঙালী লেখকদের। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ২৮শে মার্চ তারিখে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তাতে যোগ দিয়ে বাঙালী লেখক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। আর যাঁরা এতে যোগ দেন তার মধ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রী বিষ্ণু দে, জনাব আবু সইদ আইয়ুব প্রভৃতির নাম মনে পড়ছে। আর গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখো-

পাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রভৃতি যাঁরা এর আগের থেকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তারা 'ত ছিলেনই সম্মেলনে। এই সম্মেলন থেকেই জন্ম হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের…"।[১১]

এই 'সংঘ' সেই সময় আয়োজন করেছিলেন নিয়মিত সাহিত্য-বৈঠকের। নিয়মিত প্রতি বুধবারে এই বৈঠক বসতো বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল, 'বুধবারের বৈঠক'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, "লেখক সংঘের খুঁটিনাটি কাজ, এমনকি হিসেবপত্রের মত নীরস ব্যাপারে তারাশঙ্করবাবুর কাছ থেকে তখন সৎ পরামর্শ আসত অজস্র…কিন্তু এক মানিকবাবু বাদে তারাশঙ্করবাবুর মত সক্রিয় সভাপতি আর আমাদের কপালে জোটেনি। তবে স্বভাবতই ওঁদের সত্যিকার পরিচয় মিলত সাহিত্য সভাগুলিতেই।…সত্যই জমজমাট হত তখনকার আলোচনা সভা।… এসবের ফলে নিশ্চয়ই আরো পরিণত হয়েছে তরুণ লেখকদের সাহিত্যবোধ। কবিতায় বা আরো সাধারণভাবে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সামাজিক বক্তব্য কিভাবে প্রকাশ পায়, এর বিচারে যান্ত্রিকতার বিপদ কতখানি ও কোথায়, কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ কি, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য কিনা বা কেন, সাহিত্যে বা শিল্পে মতাদর্শের বিশেষ করে মার্কসবাদী মতাদর্শের স্থান কোথায়, সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে কোন পার্টি নির্দিষ্ট 'লাইন' থাকা সম্ভব বা উচিত কিনা, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব কোন পথে—এই সব মৌল ও জরুরী প্রশ্নই সেদিন ভাবিত করেছিল লেখক সংঘের কার্যালয় ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটকে। আর এসবের আলোচনা হয়েছিল বাংলাদেশ বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপটেই।"[১২]

লক্ষ্যণীয়, এই 'আলোচনা' সভাগুলিতে সোচ্চার হয়েছিলো এই সমস্যাগুলি

(১) সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সামাজিক বস্তু কিভাবে প্রকাশিত হবে?

(২) যান্ত্রিকতার বিপদ কতখানি?

(৩) সাহিত্যে ও শিল্পে মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রয়োজন কতটুকু?

(৪) সাহিত্যে কোনো পার্টি নির্দিষ্ট 'লাইন' থাকা উচিত কিনা?

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রুশ-মহাবিপ্লবের পরে সোভিয়েট-দেশে সমাজবাদী সাহিত্য রচনার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছিলো ও সমাজবাদী সাহিত্যের একটি কাঠামোর কথা ঘোষিত হয়েছিলো, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিলো—তার প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে পড়েছিলো। অবিভক্ত বাঙলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই সেদিন বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমন্বয়ে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের' আয়োজিত সাহিত্য সভাগুলিতে এই মৌল প্রশ্নগুলির মীমাংসার প্রয়োজন ভয়ংকর ভাবে অনুভূত হয়েছিলো।

আমাদের মনে রাখতে হবে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু 'ফ্যাসিজম্'কে রুখতে বাঙলাদেশের প্রায় সমস্ত লেখক কবিরাই 'সংঘের' পতাকা তুলে সমবেত হয়েছিলেন বলেই একথা ধরে নেওয়া সঙ্গত নয় যে এঁরা সবাই মার্কসবাদে বা কোনো মার্কসবাদী 'পার্টির' বশম্বদ অনুচর ছিলেন। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী কোনো দলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার চেয়ে তাঁরা মানুষ ও মনুষ্যত্বের কাছে বেশি দায়বদ্ধ ছিলেন—একথা বলা বোধ হয় সত্যের বেশি কাছাকাছি। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের' প্রতিষ্ঠাতারা বিশেষ একটি রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের কাছে দায়বদ্ধ এটা জেনেও সেদিন বাঙলাদেশের অ-মার্কসবাদী লেখক-কুল এই 'সংঘ'-এর পতাকার নিচে সমবেত হয়েছিলেন শুধু এই কথা ভেবে যে 'সংঘ'-এর রাজনৈতিক দায় যাই হোক না কেন তাদের প্রাথমিক দায় মানুষ ও মানুষের সভ্যতাকে রক্ষা করাও বটে। এতে অ-মার্কসবাদী বাঙালী লেখক সমাজের গৌরবই বেড়েছে, মর্যাদার কোনো হানি হয়নি।

পরন্তু, সংঘের আয়োজিত 'আলোচনা সভা'গুলিতে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একথা প্রমাণ করে যে, যে কোনো প্রগতিশীল ও প্রয়োজনীয় সাহিত্য-ভাবনায় অংশ নিতে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে 'নিখিলবঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে' পঠিত, সভাপতি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণটি বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য। এই অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন "...১৯৩০ সালের অব্যবহিত পূর্বে থেকে আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ। রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যের সীমান্তে পা বাড়িয়েছিলাম। মনে একটা ক্ষোভ ছিল বাঙলার শক্তিমান সাহিত্যিকের দল দেশের প্রাণশক্তির এতবড় একটি রূপময় প্রকাশকে দেখেও দেখলেন না। [বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যুদ্ধ প্রভৃতিকেই বোধ হয় তারাশঙ্কর বোঝাতে চেয়েছেন—লেখক]... গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি—আমাদের দেশের যাদের বলে নিম্নতম জাতি তাদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে বাস করতে হয়েছে দিনের পর দিন। তারই ফলে এক অকল্পিত সত্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম। দেখলাম ঘরের মধ্যে মানুষ পরের মতো বাস করছে, তাদের শতচ্ছিন্ন জীর্ণ গায়ের র‍্যাপার সত্যকার কঙ্কালসার বুভুক্ষু দেহকে ঢেকে রেখেছে তেমনি ভাবেই সামাজিক নৈতিক বিধিব্যবস্থার আবরণ ঢেকে রেখেছে তাদের স্বকাম ও অহমিকা সর্বস্ব ক্রুর ঘৃণা জর্জ্জর মন। তারপর ধীরে ধীরে দেখলাম সর্বত্র এই ব্যাধিগ্রস্ত মন, সমাজের সর্বস্তরে, সর্বত্র। মুক্তির জন্য মানুষের আত্মাকে হাহাকার করতে দেখলাম। তদানীন্তন সাহিত্যে তারই প্রতিফলন হয়েছিল। তবু তাকে আমি পূর্ণ সত্য বলতে পারব না। কারণ তাতে মাত্র উপসর্গের সত্যই আছে—মূল সত্যোপলব্ধি নেই। ঘর, মানুষের চিরকাম্য নীড়, কবরে পরিণত হল। যে ভিত ধ্বংস হয়ে সে ভীত হয়ে সে ধ্বংসের কথা নেই। তাতে ঘর থেকে বেরিয়ে

মুক্ত আকাশের নিচে আসার আহ্বান নেই, বরং ঘর কবরে পরিণত হয়েছে বলে মাটির গর্ত কেটে তার মধ্যে বাসের উন্মত্ত আকুলতা আছে। সমস্ত বস্তুর প্রতি একটা ঘৃণা জর্জ্জর মনের আত্মপ্রকাশ আছে—সুস্থ সবল মনের মুক্ত বায়ু ও উষ্ণ মধুর আলোকের প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি নেই।…১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও ঝাঁপ দিলাম। ভাবলাম এই এরই মধ্যে আছে আমাদের কায়মনের মুক্তির উপায়। কিন্তু জেলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘাতে আবার সমস্যায় পড়লাম।…তবে এইটুকু বলব যে, দেখলাম আমাদের একশো বছরের সংস্কার আন্দোলন প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেছে।…মনেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছিল, এই উপলব্ধি এবং দৃষ্টির এই নূতন শক্তির আনন্দে জীবনে এল সেই আনন্দ প্রকাশের কামনা। রাজনীতিকে গৌণ করে সাহিত্যকে করলাম মুখ্য। তারপর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখলাম পুরাতনকে এক অভিনব রূপে।…দেখলাম ঘর কবরে পরিণত হয়েছে—সে এক অনিবার্য পরিণতি। সে অনিবার্যতা নিয়তি নয়, ঘরের ভিত গাঁথার দোষ। সমাজে দেখলাম আদিমতম কৃষি সভ্যতার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য—সভ্যতার সংঘাতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন পদ্ধতির সংঘাতে, পৃথিবীর বর্ণিত সভ্যতার শোষণে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।‥ অন্তরাত্মা আকুল হয়ে উঠল আমাদের কল্যাণের জন্য, আমাদের প্রতিবেশীর কল্যাণের জন্য, আমার গ্রামবাসীর কল্যাণের জন্য, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য সমস্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

দেখলাম সর্ব্বত্রই এক অবস্থা, কম আর বেশী। শুধু রাশিয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন। পূর্ণ না হলেও এক অসম্পূর্ণ অভিনব শান্তির ব্যবস্থা সেখানে গড়ে উঠেছে। অবশ্য ১৯৩০-এর পূর্ব থেকেই রাশিয়ার বিপ্লব এবং নূতন ব্যবস্থা সাম্যবাদ আমার মনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা মোহময় প্রভাব। সম্পূর্ণ রূপেই সে রোমান্টিক। কিন্তু সে প্রভাব স্থায়ী হয়নি। পরে এই নূতন উপলব্ধির ফলে মানুষের পক্ষে বৃহত্তম কল্যাণের আকর বলেই আমি রাশিয়ার ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম শ্রদ্ধা দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছি।‥ আমি দীক্ষিত সাম্যবাদী নই, আজও আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিধা আছে, আপনা থেকে উপলব্ধি ভিন্ন সে দ্বিধা দূর হবে না। মানব কল্যাণের দিক থেকেই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি। আজও পর্যন্ত যতকিছু ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এই ব্যবস্থাই সর্বোত্তম।"

[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিভাষণ, পুনর্মুদ্রিত, 'অরণি',
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪২]

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'-এর উদ্যোগে "সাহিত্য বাদে, ভাষ তত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত-বিদ্যা বিষয়ক আলোচনাও ৪৬নং-এ যথেষ্ট হয়েছে।"[১৩] বক্তা ও আলোচকদের মধ্যে…ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ মহম্মদ আস্রফ যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন রাজনীতি নিস্পৃহ অধ্যাপক সুকুমার সেন, সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মানুষেরাও।[১৪]

বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রের কিছু কিছু মহারথীকে কখনো ৪৬নং কাছে টানতে পারেনি। পারা সম্ভব ছিলো না। বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁদের ছিলো অনপনেয় অনাত্মীয়তা। এঁরা হলেন শরৎচন্দ্র, 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ও মোহিতলাল মজুমদার। নানা কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কাছে টানা যায়নি কিম্বা বলা চলতে পারে কাছে টানা সম্ভব ছিলো না। আরো এক-জন, কবি জীবনানন্দ দাশকেও এই 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের' সদস্য বা সমর্থক করা যায় নি।[১৫]

নইলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সুকান্ত ভট্টাচার্য ও আরো তরুণতর লেখক কবিদের এই 'সংঘ' নিজেদের সমর্থনে আনতে পেরেছিলেন। এঁরা সকলে যে একে সর্বদা স্বাগত জানিয়েছেন তা নয়, কিন্তু পূর্ণ প্রত্যাখ্যান কখনো করেননি, মাঝে মাঝে সখ্য বন্ধনে নিজেদের বাঁধতেও কুণ্ঠিত হননি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রথিতযশা কবি ও পত্রিকা-সম্পাদক কোনো কালেই কমিউনিজমকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তিনিও ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভা-পতি মণ্ডলীতে বসতে কুণ্ঠিত হননি এবং সেই সভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণটিকে সংঘ-এর পত্রিকায় ছাপতে দিতেও বাধা দেননি। কমিউনিজমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, বৈরীভাবে হলেও অভিবাদনে কুণ্ঠিত হতেন না।[১৬]

প্রথমে, 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও পরে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ' অবি-ভক্ত বাঙলাদেশে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক লড়াই ও প্রচারে নেমেছিলো তার ফলে শহরে তো বটেই সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষও অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলো (অস্পষ্টভাবে হলেও) যে ফ্যাসিস্টরা মানবতার শত্রু এবং এই মান-বতার শত্রুদের সঙ্গেই সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণ এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত। ফলে রুশের প্রতি, রুশ জনগণের প্রতি একটি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব জেগে উঠে-ছিলো বাঙলাদেশে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এই ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যে বাধা দেওয়া দরকার একথাটিও তাদের অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এবং এই লড়াই-এ যে বিশ্বের সমস্ত সুস্থ মানুষদের সমর্থন আছে এ সত্যও প্রমা-ণিত হতে শুরু করেছিলো। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে মস্ত মিছিলে কলকাতার পথঘাট কাঁপিয়েছিলো, সে মিছিলের একেবারে সামনে রক্ত পতাকা স্কন্ধে নিয়ে চলে-ছিলেন দুই ভিন্ন প্রকৃতির বিদ্বান রাহুল সংকৃত্যায়ন ও অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়।[১৭]

তাছাড়াও "৪৬নং এ তখন আসত নানা দেশের কম্যুনিস্ট—শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা নয়, আসত অন্য বহুদেশ থেকে, আসত নিগ্রো আর গ্রীক আর জাপানী আমেরিকান—তারা কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ চিকিৎসক, কেউ সাধারণ শ্রমজীবী—তাদের একসূত্রে বেঁধেছিল সাম্যবাদ, আর তাই অতি সহজে

ছাদের মেঝেতে আসনপিড়ি হয়ে বসার চেষ্টা করে তারা বাংলা আর হিন্দী আর উর্দু ইণ্টারন্যাশনাল"[১৮] গাইতেন।

বলা বাহুল্য, এই উদ্দীপনার জন্ম হয়েছিলো অক্টোবর-মহাবিপ্লবের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভাবের জন্য। বিপ্লব-প্রসূত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জন্য আন্তরিক ভালবাসা ও সেই সোভিয়েট ভূমিকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের মুখোমুখী দেখে সেদিন দলমত নির্বিশেষে (কিছু মানুষ বাদে) প্রায় সব সচেতন বুদ্ধিজীবী চরম শত্রুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলো।

ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি যে 'বিশ্বযুদ্ধের' সূচনা করেছিলো তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছিলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। "সেই দেশব্যাপী বিভীষিকার দুর্দিনে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে তার সমগ্র শক্তি একাগ্র করে ৪৬নং সেদিন সত্যিই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছিল তার ইতিবৃত্তে। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে নিশ্চেষ্টতা ও অবসাদ দূর করার সেই প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর'[১৯] এবং তাঁর ও মানিকবাবুর অসংখ্য অনন্ত গল্প, বিষ্ণুবাবু, সুভাষ, সুকান্ত, অবন্তী সান্যালের বহু কবিতা, গোপালবাবুর সুবৃহৎ তিনখণ্ড উপন্যাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সোমনাথ লাহিড়ীর বহু তীক্ষ্ণ গল্পের পিছনে তখনকার প্রচণ্ড ভয়াবহ বাস্তবের পরেই অন্য যে শক্তিটি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে ঐ দুঃসহ বাস্তবের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর নির্ভীক সংগ্রামের প্রেরণা। তেমনি আবার জয়নাল আবেদীন, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীর তুলিতে এবং সুনীল জানার মত আলোচিত্রশিল্পীর ক্যামেরায় সেদিনের ভয়ঙ্কর রূপ চিরকালের মত ধরা পড়ে গেছে তার পেছনে ছিল ঐ একই প্রভাব।...৪৬নং এ তখন বহু তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে উপস্থিত থেকে তরুণদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন শ্রীযামিনী রায়, শ্রীঅতুল বসুর মত প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীরা।"[২০]

"...যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্বে নানা দেশের বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাধারণ মানুষ যে নিভীক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তার টাটকা খবর পৌছতে লাগল ৪৬নং-এ। চীন থেকে ফেরার পথে সমাজতান্ত্রিক মহাচীনের আসন্ন অভ্যুদয়ের কথা ঘোষণা করে গেলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নীডহাম, সাংবাদিক জগতে স্টুয়ার্ট গেলডার এবং চীনের আজন্ম সুহৃদ এপস্টাইন। মালয় থেকে, বার্মা থেকে জাপবিরোধী গেরিলা বীরেরা আনলেন এশিয়ার নবজাগরণের বাণী।...বিখ্যাত ব্রিটিশ সাম্যবাদী নেতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত 'লেবার মান্থলী' পত্রিকার সম্পাদক রজনীপাম দত্ত ১৯৪৬ সালে এইখানেই সাংবাদিক সম্মেলনে শোনালেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিপুল ভারসাম্য পরিবর্তনের এবং নতুন দুনিয়ায় ভারতবর্ষেরও আশু স্বাধীনতা লাভের অনিবার্য-

তার কথা। সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমাদের সৌভ্রাত্রবন্ধন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল সেদিন এখবরের মাধ্যমে।

গণনাট্য সংঘ :

'অক্টোবর বিপ্লব' থেকে জাত সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট রুশিয়া, প্রগতির দিকে তার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি, সর্বশেষে সেই রাষ্ট্রের প্রতি ফ্যাসিস্ট আক্রমণ বিশ্ববাসীর কাছে প্রথমে বিস্ময়, পরে গভীর সন্তোষ ও শেষে শোষিত মানুষের শেষ আশার দীপটি নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় অবিভক্ত বাঙলা দেশে রুশ বিপ্লবের প্রভাবকে নানা স্তরে ছড়িয়ে যেতে দেখি।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সৃষ্ট ভয়াবহ মন্বন্তরে যখন বাঙলাদেশের কয়েক লক্ষ প্রাণ বিনস্ট, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখন ভয়ংকরভাবে বিপন্ন তখন ঐ ৪৩ নং-এর প্রাণপাত সংগ্রামের যে দিকটি সেদিন দেশের লোকের মন সব থেকে বেশি টানে সেটি হচ্ছে গণনাট্য সংঘের কাজ।...তার সত্যিকারের স্ফূরণ হয় এই পর্বে মন্বন্তরের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। ধ্বংসকারীতার দিক থেকে বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেই যার তুলনা তার নাচ গান অভিনয়ের লড়াই হয়ত মেশিনগানের সামনে যুঁই ফুলের গান গাইবার প্রস্তাবের সামিল মনে হতে পারে।"[২১] কিন্তু রুশ-বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্দীপিত 'কমিউনিস্ট পার্টি' সেদিন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেশিনগানের বিরুদ্ধে যুঁই ফুলের লড়াইকেই মর্যাদার লড়াই-এ পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যুঁই ফুল দিয়েই মেশিনগানের আগুনে গোলাকে সময় বিশেষে রুখে দেওয়া যায়।

"...কম্যুনিস্ট পার্টি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিল। পার্টি-সম্পাদক পুরণচন্দ্র যোশীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। Who lives if Bengal dies ? বলে মর্মস্পর্শী পুস্তিকা সে তখন লিখল, গণনাট্য সংঘের এক সমুজ্জ্বল দল ভারত পরিক্রমা যখন করেছিল। বাঙলার যন্ত্রণা আর জীবন প্রতিভাকে একই সঙ্গে সারা দেশে পৌঁছে দিয়ে অগণিত ভারতবাসীর প্রাণকে আকুল করেছিল"।[২২] "দেশের নেতারা যখন কারান্তরালে, হতাশার পাঁকে পড়ে দেশবাসীর অবসাদ যখন চরমে তখন সমাজের বিবেককে জাগ্রত করে, মানুষকে যথাসাধ্য কাজে নামানোর চেষ্টার মূল্য ছিলো অপরিসীম। গণনাট্য সংঘ সেই দেশপ্রেমিক কাজেই কোমর বেঁধেছিলেন নির্ভীকভাবে। তাদের কাজের ফলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে এই সহজ অথচ প্রবল অনুভূতি সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিলো প্রত্যেকটি কর্মীকে। তাই তাঁরা অজস্র গান বেঁধেছেন, পালা লিখেছেন আর তাই নিয়ে জলকাদা ভেঙে যৎসামান্য সাজসরঞ্জাম ঘাড়ে করে দেশের লোককে গান শুনিয়েছেন, নাচ ও অভিনয় দেখিয়েছেন মাঠে মাঠে, পথে ঘাটে, হাটে বাজারে...তাদের বক্তব্য ছিল সহজ অথচ

প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। তাই সে আবেদন স্পর্শ করেছে মানুষের মনকে, গণনাট্য সংঘকে ও তার কর্মীদের তাঁরা স্থান দিয়েছেন অন্তরে। আর ছোট বড় শিল্পীরাও মানবতা ও গণ-সংস্কৃতির এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন নি—তাঁরাও সেদিন গণনাট্য সংঘের দিকে ঝুঁকেছেন দলে দলে।…মন্বন্তর পর্বে গণনাট্য সংঘের যে কীর্তি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল মানুষের মনে [বিশেষ করে কলকাতা ও পরে কিছু মফঃস্বল শহরেও] সেটি হল 'নবান্ন' অভিনয়।…এক-জন শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে শম্ভু মিত্রের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রাতা-রাতি। স্বয়ং শিশিরকুমারের প্রশংসা অর্জন করেছিল 'নবান্নে'র 'Team Work'। মূল ভূমিকাগুলিতে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র (তখনও ভাদুড়ী), চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু ও সুধী প্রধানের অভিনয় ভুলবার নয়।"[২৩]

"গণনাট্যের ডাকে সাড়া দিলেন তুলসী লাহিড়ীর মতো সুলেখক ও সজ্জন, 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি মঞ্চস্থ করে যিনি বোধ করি সর্বপ্রথম ব্যাপক নাট্যামোদী সাধারণের সামনে তুলে ধরলেন নতুন জিনিস, আর অকুণ্ঠ সাহায্য করতে থাক-লেন সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে। '৪৬নং'-এ এলেন ইতিমধ্যে নাট্যজগতে স্বীকৃত দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দল বেঁধে নাটক করার উন্মাদনায় অংশীদারী করে আজীবন স্বেচ্ছা-বন্দী হলেন সেই প্রয়াসে…। আর প্রধানত শান্তি-আন্দোলনের সুবাদে কিছু পরে এলেন নাট্য ও সাংবাদিকতার জগতে প্রতিভাধর শচীন সেনগুপ্তের মতো ব্যক্তি।"[২৪]

'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের'—'বুধবারের বৈঠক'

কলকাতা ধর্মতলা স্ট্রীটের '৪৬ নং'-এ অধিষ্ঠিত 'সোবিয়েত সুহৃৎ সমিতি', 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ', 'গণনাট্য সংঘ' ও 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর থেকে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিলো। আমরা কিছু পূর্বে তাদের কর্মানু-ষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলেও মোটামুটি একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। তাতে প্রমাণ করা সহজ হয়েছে যে অবিভক্ত পরাধীন বাঙলাদেশে রুশ-বিপ্লবের পরে ও তার প্রভাবে শুধু বুদ্ধিজীবী সমাজ নয়, সমাজের সর্বস্তরের সর্ব-বৃত্তির মানুষকে কিভাবে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের জোয়ার তোলার চেষ্টা হয়েছিলো। এই আহ্বানে বাঙলাদেশের হৃদয় যে বহুলাংশেই জাগ্রত হয়েছিলো তাতে সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ কম।

এবার আসি ৪৬নং-এর বিভিন্ন সংগঠনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায়। 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ' সেইসময় 'বুধবারের বৈঠক' নাম দিয়ে 'সাহিত্য বৈঠক' বসাতেন। এই সভা নিয়মিত প্রতি বুধবারে বসতো বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুধবারের বৈঠক'।

বাঙলাদেশের শ্রুতকীর্তি লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এই 'বৈঠকে' পড়ে শোনান তাঁর অসাধারণ ছোটগল্প 'হারানের নাত জামাই'। সবাই সেদিন এই নতুন স্বাদের গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলেন আর রক্তের গভীরে অনুভব করেছিলেন বাঙলা-সাহিত্যের ধীর-অচঞ্চল স্রোতে অনুপ্রবিষ্ট সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের।

এই 'আসরেই' সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সদ্য রচিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা কাঁপা কাঁপা নরম গলায় পড়েছিলেন—

এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি।
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি।

তখন সদ্য সে এসেছে আন্দোলনে। বেলেঘাটার কিশোর ছেলে, সকলের প্রিয়, শান্ত চেহারা, শিষ্টভাব কিন্তু ভিতরে আগুন। এই কিশোর কিছুদিন পরেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা'-য় ভার নিল 'রবিবাসরীয় কিশোর সভা'র। কিন্তু শোচনীয় মৃত্যু তাঁকে অল্পদিনের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সবার কাছ থেকে। এই বুধবারের বৈঠকেই ননী ভৌমিক, কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল প্রভৃতি অনেকে তাঁদের নতুন লেখা পড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

"প্রবীণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় থেকে শুরু করে বিমলচন্দ্র ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও নরেন মিত্রের মত মধ্যবয়সীরা এবং অমল দাশগুপ্ত, মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সিদ্ধেশ্বর সেনের মত তরুণেরা অনেকেই তখন যোগ দিতেন এই আসরে। আর বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও সুপরিচিত 'নবান্ন' নাটক এবং তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের তিনটি নাটকের প্রাথমিক খসড়া (যথাক্রমে 'দুঃখীর ইমান', 'মোকাবিলা' ও 'উলুখাগড়া') পড়া হয় ৪৬ নং-এই।

অন্যদেশের বা অন্য ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রতিও ৪৬নং নারাজ ছিল না মোটেই। গর্কি, রলাঁ, বারবুস, লু-সুন, প্রেমচন্দ, ইকবাল প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও তাঁদের রচনা পাঠ হয়েছে বহুবার।"[২৫]

৪৬ নং-এ এসেছিলেন Clive Branson-এর মতো মরমী লেখক, Alun Lewis-এর মতো কবি এবং রজনীপাম দত্তের মতো রাজনীতিবিদ্-সাংবাদিক। ১৯৪৫ সাল নাগাদ এসেছিলেন বহু বছর আমেরিকাবাসী চীনা অধ্যাপক চেন হাম সেং, আধুনিক চীনা-সাহিত্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছিলেন।"[২৬]

'পরিচয়' পত্রিকা :—(১৩৩৮, শ্রাবণ, ইং ১৯৩১)

প্রথম সম্পাদক : শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অকমিউনিস্ট কিন্তু কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল বিখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৪ সালে 'পরিচয়'-এর দায়িত্ব তুলে দেন কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

১৯৪৪ সালের জুলাই-অগাস্ট নাগাদ' 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর উঠে আসে এবং প্রায় বছর তিনেক '৪৬নং' থেকেই প্রকাশিত হয়।...এই নতুন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত 'পরিচয়' পরিচালনার নীতি পরিবর্তনের সূচনা করে "তবে পুরাতনের সঙ্গে যোগ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়নি এর ফলে।... যুদ্ধের সময়ে মাঝে মধ্যে কিছু বিদেশী বন্ধুরাও পরিচয়ের আড্ডায় আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই তখন ছিলেন সৈনিক যদিও যুদ্ধ পর্বের বেসামরিক জীবনে তাঁদের কেউ ছিলেন সাংবাদিক বা লেখক বা চিকিৎসক অথবা ঐ ধরণের অন্য কিছু। এইসব মার্কিন ও ইংরেজ বন্ধুদের মনে পড়ছে, হাওয়ার্ড ফাস্ট, ক্লাইভ ব্র্যানসন ও এডওয়ার্ড স্ট্রং-এর নাম।"[২৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও নানা সংকটের চোরাবালি থেকে সমস্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এবং কিছু অংশে বুঝি বৃহত্তর জনগণও খুঁজে পেয়েছিলেন জোয়ারের তীব্র স্পর্শ। বলা বাহুল্য সে জোয়ার এনে দিয়েছিলো রুশ-বিপ্লব ও পরবর্তীকালে হিংস্রতম ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধরত সোভিয়েত রুশিয়া। দেশে সর্বত্র যে কোনো মুখোসের অন্তরালবর্তী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর শপথই ঘোষিত হয়েছিলো বারবার।

আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে সেই লড়াই-এর একটি তথ্যভিত্তিক বিবরণ দেবার প্রয়াস পেয়েছি, এবং সেই বিবরণে কলকাতার ধর্ম্মতলা স্ট্রীটের ৪৬নং বাড়িটিকে ঘিরে যে তৎপরতা ও নানা সৃষ্টিশীল কর্মের সূত্রপাত হয়েছিলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ'-এর 'বুধবারের বৈঠকে' সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সামাজিক বস্তু কিভাবে প্রকাশিত হবে, যান্ত্রিকতার বিপদ কতখানি, সাহিত্যে ও শিল্পে মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রয়োজন কতটুকু, সাহিত্যে কোনো পার্টি নির্দিষ্ট 'লাইন' থাকা উচিত কিনা— এ সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদের সূচনা হয়েছিলো।

এই আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদের সূচনা অকারণে হয়নি। বাঙলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায়, অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাবে, যখন নতুন যুগের চিন্তা-ভাবনার উদয় হলো এবং সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তার প্রতিফলন ঘটতে থাকলো—তখন নানা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছিলো। যেহেতু সেই প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারীরা কম কেউকেটা ছিলেন না সেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা সংশয়, দ্বিধা ও প্রশ্ন জেগে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো এরকম আলোচনার। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যশালী পত্রিকা 'পরিচয়' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলো।

বাঙলা ১৩৩৫ সালেই (ইংরেজী ১৯২৮) প্রখ্যাত লেখক ও সবুজ পত্র-

সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 'কল্লোল' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন "আমি কেন নীরব ?"—এই নামে। প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি"…ইউরোপের বর্তমান সাহিত্যের ঘাড়ে নানারূপ-ism ভর করেছে তখন আমাদের সাহিত্যকেও -ism মুক্ত রাখা অতি কঠিন। প্রথমত আমাদের সঙ্গে কোন সাহিত্যের যদি পরিচয় থাকে ত সেই সাহিত্যই আমাদের আদর্শ। বিলেতি কাপড় পরে যেমন আমরা দেহের নগ্নতা লুকিয়ে রাখি—বিলেতি মতামত দিয়েও আমরা তেমনি মনের নগ্নতা ঢেকে রাখি। আমাদের পলিটিক্সের নব মতামত ত সব ম্যানচেষ্টারে বোনা আর সাহিত্যিক মতামত আমরা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া ও ল্যাপল্যাণ্ড থেকে আনদানী করি। এ দুজাতের মতামতের ভিতর এই যা প্রভেদ। তারপর-ism নিয়ে নাড়াচাড়া করা অতি সহজ। ওর জন্য কিঞ্চিত বিদ্যাবুদ্ধি ও মানুষের প্রতি কিঞ্চিত মায়া দয়াই যথেষ্ট। -ism-এর উপর কার্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবি প্রতিভার কোনই আবশ্যক নেই। আর Imperialism, অথবা Socialism, Militarism অথবা Pacifism, Feminism অথবা Leninism এসবের ভিতর কোন্‌টা জিওনকাঠি আর কোনটা মরণকাঠি এবং সেই হিসেবে কোন্‌টা গ্রাহ্য ও কোন্‌টা ত্যাজ্য, তা নির্ভর করে লোকের মেজাজের উপর…যে কোনো -ism-কে অবলম্বন করা যখন আমরা জীবন সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় মনে করি তখন আমরা তা প্রচার করতেও বাধ্য। -ism-এর যুগপৎ প্রধান গুণ এবং দোষ এই যে, তা জীবন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা। কলের পুতুলে দম দিয়ে দিলে সে যেমন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একদিকে সোজাভাবে তেড়ে চলে—তেমনি এক একটি -ism-এর বশবর্তী হলে আমরা ডাইনে বাঁয়ে না ফিরে একটা পথ ধরে সোজা তেড়ে চলতে পারি এই হচ্ছে ism-এর মহাগুণ। অপরপক্ষে ism-এর বশবর্তী হলে আমরা কলের পুতুল হয়ে পড়ি, তখন আর মানুষ থাকিনে, এই হচ্ছে ism-এর প্রধান দোষ।

আর সাহিত্যের কারবার মানুষ নিয়ে, কলের পুতুল নিয়ে নয়। সুতরাং বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব আমাদের উপর ভাল কিনা, সে বিষয়েও আমার মনে সন্দেহ আছে। লোকে বলে আমরা মানুষ নই।…এ দেশের লোক ও তাই হতে চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় মানুষ না হতেই কলের পুতুল হয়ে পড়াটি কি দুঃখের বিষয় নয় ? আমার বিশ্বাস মানুষকে মানুষ করে তোলবার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যের কলের চাপ থেকে আমরা তখনই বেরিয়ে যাব যখন আমরা ধরতে পারব যে সাহিত্যের কোন অংশ Poetry এবং কোন অংশ No-Poetry। সে বিচার এখন ইউরোপই করছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকেই তা আমরা শিখতে পারব।…মনোজগতে ইউরোপের ছাড়া কাপড় পরাই আমাদের কপালের লেখা।"

[কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃঃ ৫৭-৬১]

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের এই শ্লেষ ও বিদ্রূপে ভরা প্রবন্ধর স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত এবং বহুলাংশেই একদেশদর্শী। তবুও প্রবন্ধের সর্বত্র ফুটে উঠেছে তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শটি। কোনো ism-কে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে রাজি নন, রাজি নন কলের পুতুল হতে এবং স্বীকার করতে রাজী নন যে ism-এর উপর কাব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবি প্রতিভার কোনো প্রয়োজন আছে বলে। এ থেকেই বোঝা যায় প্রগতি, পরিচয় ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি ও লেখনীর উপর প্রমথ চৌধুরীর বিন্দুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না। আজ ইতিহাসই বিচার করেছে কিম্বা করছে যাঁদের তিনি ism-এর দম দেওয়া পুতুল বলে তুচ্ছ করেছিলেন, কবি প্রতিভাহীন বলে ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নিজেদের সম্মানের স্থানটি খুঁজে পেয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী এ ক্ষেত্রে একা ছিলেন না। তাঁর সাময়িককালে অনুরূপা দেবী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, এবং কিছু অংশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বাঙলা-সাহিত্যে নবাগত এই বিপ্লবী চিন্তাধারাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। আর নিস্পৃহদের দলে ছিলেন 'বনফুল' বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের মতো প্রতিভাধর সাহিত্যসেবীর দল।

সর্বোপরি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে যখন জার্মানী সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকে নির্মূল করার জন্য লড়ছিলো অন্যদিকে তেমনি ফ্যাসিস্ট জাপান ভারতের পূর্বপ্রান্তে হানা দিয়েছিলো। কলকাতায় জাপানী বিমান থেকে বোমাও বর্ষিত হয়েছিলো। সেই সময়ে ঘরে-বাইরে বাঙালি জাতির শত্রুর অভাব ছিলো না। এদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে সে যুগের একজন সাহিত্যসেবী সুনীল কুমার বসু লিখেছিলেন, "...ইহারা প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। অথচ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ আজ পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিতেছেন ও ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতির কথা গোপন করিতেছেন না। মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের ফ্যাসী বিরোধীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া নিতান্ত উপেক্ষা করিবার মত নহে।... অনেকেই ফ্যাসিস্ট জয়ে মনে মনে উল্লসিত। কত রঙ্গীণ কাহিনী মুখে মুখে ফিরিতেছে।...কেহ বা ভাবিতেছেন সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী বসু জাপানে প্রস্তুত স্বাধীনতা সঙ্গে লইয়া একদিন কলিকাতায় এরোপ্লেন হইতে অবতরণ করিবেন। কাহারও গায়ে আচটি লাগিবে না, ইংরেজেরাও চলিয়া যাইবে, জাপানীরাও আমাদের সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য যে কয়দিন প্রয়োজন তাহার বেশী একদিনও থাকিবে না।"

['অরণি' : 'ইহারা কাহারা' ? সুনীলকুমার বসু, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪২]

বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে পণ্ডিচেরীর

পণ্ডিতরা একসময়ে সোচ্চার ছিলেন। ১৯২৯ সালে পণ্ডিচেরীর পণ্ডিতদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর তীব্র মতবিরোধ হয়। পণ্ডিচেরীর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সুভাষচন্দ্রের পণ্ডিচেরী-সম্বন্ধীয় মন্তব্যের [" ··It is the passivism, not philosophic but actual, inculcated by these schools of thought against which I protest···'আত্মশক্তি', ৩য় বর্ষ, ৪২ সংখ্যা] প্রতিবাদ করেন। তাঁর উত্তরে 'আত্মশক্তি, পত্রিকায় 'তোমার সাহিত্যিক বন্ধু' ছদ্মনামে কেউ প্রত্যুত্তরে লেখেন, "·· মুসোলিনী সম্বন্ধে দেখছি তোমার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। কেননা লেনিনের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তুমি তার নাম করেছ। মুসোলিনী লেনিনের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পারে এ বিশ্বাস কিন্তু আমার নয়। লেনিন হচ্ছে ইতিহাসে একজন epoch-maker—যুগ সন্ধিক্ষণের মানুষ—আর মুসোলিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছে বিংশ শতাব্দীর নেপোলিয়ন হতে।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল বামপন্থী, উদারপন্থী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘ-এর যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগে বাধা এসেছে নানা দিক থেকে। সন্দেহ, সংশয়ে বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে মানুষের মন। তাই বাঙলা দেশের দুইটি বামপন্থী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী পত্রিকা 'পরিচয়' ও 'অরণি' তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এসেছিলো। মার্কসবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্র-এর স্বপক্ষে সেদিন এই পত্রিকা দুটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলো।

বৈশাখ ১৯৪১ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্, সুলেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফরিদপুরের সাহিত্য সম্মিলনীর সাহিত্যশাখার অভিভাষণে ধূর্জটিপ্রসাদ যা বলেছিলেন—'অথ কাব্য জিজ্ঞাসা' নাম দিয়ে তা 'পরিচয়' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিলো। এই প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পড়লেই বোঝা যায় বাঙলা সাহিত্য-সেবীদের চিন্তাজগতে সবচেয়ে সঙ্কটময় দোলাচল অবস্থায় ধূর্জটিপ্রসাদের এই প্রবন্ধটির কত প্রয়োজন ছিলো।

শ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন "আজ আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই বলছি সব সাহিত্যিককে—আবহাওয়ার মতন এই সমাজসত্তাকে স্বীকার করুন, নইলে মাঝদরিয়া পর্যন্ত যেতে হবে না—কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে। তখন সেলুনে বসে নাচগান ও ককটেল টানলে, ফষ্টিনষ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাসের থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ সত্তাকে অবহেলা করেই সব সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়াড়ী চুড়ির ব্যবসা, বড়ই ঠুন্‌কো, বড়ই হাল্‌কা, বড়ই ফাঁকা, যদিও রঙবাহার। এই বিপদ আমাদের আরো বেশী, কারণ পুরনো কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে। সে সমাজ আজ ভেঙে গিয়েছে। সে সামাজিক সত্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সমাজ ভেঙে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুকরো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই সব, অন্য টুকরো শুনতেই পাচ্ছে না এই দাবী, যারা পাচ্ছে তারা মানছে না। সমাজ যখন নেই, অথচ একটিমাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই শ্রেণীর সত্তাকে সমগ্র সমাজ সত্তা বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ত চিরকাল থাকবে না, অন্য শ্রেণী মাথা তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ। সে বিরোধের অবস্থা কারুর কারুর কাছে অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিরোধ কিন্তু চিরন্তন নয়। শ্রেণী বিরোধ ইতিমধ্যের ইতিহাস। শ্রেণী সত্তা ভাঙছে গড়ছে, তার শেষ নতুন সমাজে। শ্রেণী সত্তাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোনো ব্যক্তি এই শ্রেণীর আবহাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোনো সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় কিছু লিখতেই পারে না। খণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু বড় আর্টিস্ট এক একটি বৃকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্যদেশে রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে···

এখন সাহিত্যে সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কারা? যাঁরা ঐ একমাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্তত পক্ষে ষোলগুণ সংখ্যায় বেশী, যাঁরা উকীল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার চাকুরে নন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কার করে নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে চান। যারা তরুণ অথচ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক। বিশেষ করে যাঁরা জমির সংস্রব ছাড়েন নি, কেননা জমিই হল আমার সমাজ সত্তার প্রকৃত স্বত্ব। আমি শুনেছি পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁদের বেশীর ভাগই মুসলমান। ভালকথা, অতএব মুসলমান সাহিত্যিকের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে বেশী। তাঁরা যদি কেবল আরবী, ফারসী, উর্দু জবান আমদানী করে বাংলা সাহিত্য বড় করতে চান, তাহলে তাঁদের চেষ্টা সফল নাও হতে পারে, কেননা হিন্দুরা আপত্তি করবে। কিন্তু তাঁরা যদি নতুন শ্রেণী গঠনের ভার নিয়ে সমাজসত্তাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে সত্যিই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের··· কারণ হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়। ভাল করে বাঁচবার ব্যগ্রতায় তাঁরা এক, তাঁদের গোষ্ঠীজীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে তাঁরা এক। তাঁদের চিন্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক সংস্কারে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তার মূল কারণ এই মাটির সংশ্রবে ও গ্রামে থাকার দরুণ তাঁরা হিন্দুদের মতন অবাস্তব হয়ে পড়েন নি। এখনও সত্তার সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে।···

তাঁদের ঐতিহ্যে ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারেনি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কম, জাতি বিভাগ কম, তাঁদের ধর্মে সামাজিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত হয়েছে। আজ পূর্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব। চাকরীও তাঁরা কম করেন,

সহরে বাস করতেও তাঁরা চান না। এত সুবিধা তাঁদেরই। অতএব তাঁদের কাছেই আমার প্রত্যাশা বেশী তাঁরা ইচ্ছা করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন।···সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু তাঁরাও এই কাজ গ্রহণ করুন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নতুন সমাজে থাকবে না। ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে বললে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হলে হিন্দু মুসলমানের যে প্রকৃত মিলন ঘটবে তারই ফলে হবে সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেমন নতুন কাজ না পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজসত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন।" [পরিচয়, বৈশাখ ১৯৪১]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ একদিকে প্রমথ চৌধুরী মশাই-এর মন্তব্যের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ অন্যদিকে নতুন যুগের সমাজ সচেতন লেখকদের কাছে ভবিষ্যৎ বাঙলা সাহিত্যের সম্ভাব্যরূপের ঘোষণাপত্র স্বরূপ।

অক্টোবর-মহাবিপ্লবের পর লেনিন ও All Union Congress of Soviet Writers-এর অধিবেশনে বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে, শুধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নন, বাঙলার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতের মিল আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

সমাজসত্তাকে অবহেলা করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে এবং যে সাহিত্যের গৌরব অহংবাদী লেখকরা করে থাকেন তাঁদের মূঢ়তাকে প্রচণ্ড আঘাতে ছত্রনছ করে দিতে চেয়েছিলেন বলেই ক্রুদ্ধস্বরে লেনিন বলেছিলেন—"Down with non-party writers! Down with literary superman! Literature must become a part of the proletarian cause as a whole, part and parcel of a single whole, of the entire social mechanism set in motion by the whole conscious vanguard of the entire working class. Literature must become an integral part of an organised, planned, united social—democrative party work". [Lenin : 'Party Organisation and Party Literature' Essay, 1905]

লেনিনের এই মন্তব্যটির অনেকেই অপব্যাখ্যা করেছেন নিজেদের সুবিধামতো। আসলে ১৯০৫ সালে রুশিয়ায় স্তোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বলশেভিকদের তরফ থেকে যে সংবাদপত্র ও অন্যান্য নানাধরণের বিশ্লেষণ-ধর্মী সাহিত্য প্রকাশিত হত তাতে যাতে যথেচ্ছাচারের কোন সুযোগ না থাকে এবং সেখানে যেন নির্দিষ্ট দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা মেনে সব কিছু প্রকাশিত হয়, দলভুক্ত কোন

লেখক দলের কাগজে নিজের সাহিত্যিক কৌলীন্যের দাবীতে যা খুশী লেখার স্বাধীনতা বা সাহস যেন না পান সেজন্যই এই কঠোর বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। উদ্ধৃতিটির প্রথম দুই ও শেষ একটি বাক্য বাদ দিলেই লেনিনের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে বোধকরি কোন মার্কস্ বা সমাজবাদী-সাহিত্যিক দ্বিমত হবেন না। পার্টি-বহির্ভূত সাহিত্যিকদের উপর মার্কস্ বা লেনিনের কোনো ঘৃণা ছিলো এমন কথা প্রমাণ করতে যাওয়া হঠকারিতার সমতুল্য [এমন হঠকারী কাজ চল্লিশের দশকে আবু সৈয়দ আইয়ুবের একটি বিতর্কিত প্রবন্ধের সমালোচনা করতে গিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের মতো বিদগ্ধ মানুষেরাও করে বসেছিলেন]।

লেনিন, ভবিষ্যৎ রুশ-সাহিত্যের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর পার্টির মতামতকেই তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ-সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান লেখকদের যথার্থ মূল্যায়ন করতেও দ্বিধা করেননি। টলস্টয়, রুশ স্যোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টি বা বলশেভিক পার্টির লোক না হওয়া সত্বেও তাঁর মহত্ব ও বিপ্লবের কাজে তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা-দায়ী প্রভাবকে লেনিন স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এবার আলোকপাত করা যাক সদ্যোবিপ্লবোত্তর রুশিয়ায় সাহিত্য ও শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মতামত গড়ে উঠছিলো সেইদিকে। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের পর স্বভাবতই মানুষের মনে এ প্রত্যাশা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে দেশ থেকে ধনতন্ত্র সমূলে উৎখাত হয়েছে সে দেশে সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়েছে ধনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে রচিত 'ক্যাপিটালিস্ট আর্টের' আদর্শ এবং সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৃষ্টিশীল বাস্তবতার (Creative realities) পরিমণ্ডল।

নতুন সমাজতান্ত্রিক-রুশিয়ায় সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে সে নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। ১৯৩৪ সালে All Union Congress of Soviet Writers-এর অধিবেশন বসেছিলো। সেই অধিবেশনে তদানীন্তন রুশিয়ার অত্যন্ত প্রভাবশালী সমালোচক Karl Radek—বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার লেখকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন :—

"The search of Soviet art for its own creative methods has been a long one, for it has had to overcome the old traditions in art to explore a new trail, leading to the 'portrayal of our life as it is'. This trail has been found. The methods of Soviet art have been found, and they are commensurate with the tasks which revolutionary literature sets itself···Realism means giving a picture not only of the decay of capitalism and the withering away of its culture,

but also of the birth of that class, of that force, which is capable of creating a new society and a new culture. Realism does not mean the embellishment or arbitrary selection of revolutionary phenomena; it means reflecting reality as it is, in all its complexity, in all its contrariety, and not only capitalist reality, but also that other, new reality—the reality of socialism."[২৮]

বঙ্গানুবাদ :

[সোভিয়েট শিল্পের একটি নিজস্ব সৃষ্টিশীল মাধ্যমের অন্বেষণ দীর্ঘকাল থেকেই চলছিলো। কেননা এই প্রচেষ্টাকে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নতুন ধারার আবিষ্কারের কাজটি করতে হয়েছে যা 'জীবন যেমন তেমন আঁকো' ধারণার অনুকূল। অবশেষে সেই সূত্রটি পাওয়া গেলো, সোভিয়েট শিল্প নিজস্ব-মাধ্যম পাওয়া মাত্র। তা সমপরিমাণে 'বিপ্লবী সাহিত্যচর্চার' ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে তুললো।...বাস্তবতাবাদ কথাটির অর্থ (সাহিত্যে) শুধু ধনবাদের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করা নয় শুধু ধনবাদী সমাজ-সংস্কৃতির অবলুপ্তির চিত্রাঙ্কণও নয়, সেই সঙ্গে আঁকা নতুন প্রজন্মের মানুষ, তাদের শক্তির ছবি—যে শক্তি নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম। বাস্তবতাবাদ বলতে শুধু বিপ্লবী তৎপরতার বাহ্যমূর্তির যথেচ্ছ সংগ্রহ বোঝায় না, বোঝায় যে বাস্তবতা তার সমস্ত জটিলতা বৈপরীত্য নিয়ে সত্য, তার প্রতিফলন কেবলমাত্র ধনবাদী সমাজের বাস্তবতা নয়, নতুন বাস্তবতা বা সমাজবাদী বাস্তবতারও প্রতিফলন।]

প্রখ্যাত কলা-সমালোচক হার্বার্ট রীডের সোশালিস্ট সাহিত্য-বিষয়ক মন্তব্য নবজাত রুশিয়ার সাহিত্য-ভাবনাকেই যেন আরো পরিপুষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন ;

"Socialist realism means not only knowing reality as it is, but knowing whither it is moving. It is moving towards socialism, it is moving towards the victory of the international proletariat. And a work of art created by a socialist realist is one which shows whither that conflict of contradictions is leading which the artist has seen in life and reflected in his work.

We do not photograph life. In the totality of phenomena we seek out the main phenomenon. Giving everything without discrimination is not realism. That would be the most vulgar kind of naturalism. We should select

phenomena. Realism means that we make a selection from the point of view of what is essential, from the point of view of guiding principles. And as for what is essential—the very name of socialism tells us this. Select all phenomena which show how system of capitalism is being smashed, how socialism is growing, not embellishing socialism but showing that it is growing in battle, in hard toil in sweat. Show how it is growing in deeds, in human beings."[২৯]

[সোভিয়েট বাস্তবতা মানে কেবল 'যেমন আছে তেমন'কে জানা নয় বরং বাস্তবতা কোন দিকে যাচ্ছে তাকে জানা। এই 'বাস্তবতা' অবশ্যই যাচ্ছে সমাজবাদের দিকে এবং অবধারিতভাবে যাচ্ছে বিশ্বজননীন সর্বহারাদের বিজয়ের দিকে। এবং একজন সমাজবাদী আর্টিস্টকে দেখাতে হবে কোন্ কোন্ পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বসমূহ তাঁর জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্পে প্রক্ষিপ্ত করছে।

আমরা জীবনের ক্যামেরায় তোলা ছবি আঁকিনা। পরিমণ্ডলের সমগ্রতার মধ্যে আমরা অন্বেষণ করি প্রধান ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে। গুণাগুণ না বিচার করে সবকিছুকে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে গুঁজে দেওয়াকে 'বাস্তবতা' বা Realism বলে না। যদি করি তবে সেটা হবে স্থূল 'স্বভাববাদ'। সেইজন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ বস্তুকে সঠিকভাবে খুঁজে নিতে হবে। 'বাস্তবতা' বলতে সেই জিনিষকেই বোঝাতে হবে যা আমরা একান্ত আবশ্যক বলেই গ্রহণ করেছি, এবং যা সমাজবাদ প্রচারের নিয়ন্ত্রক নীতি বলে গণ্য হতে পারে। জীবনে ও সমাজে কোনটি অত্যাবশ্যক 'সমাজতন্ত্র' কথাটিই তা বলে দেবে—সেই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর কথা লেখ যা ধনতন্ত্রের প্রথাসমূহকে চূর্ণ করছে, কিভাবে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। সমাজতন্ত্রকে অলংকারে ভূষিত না করে দেখ কোথায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, কঠোর শ্রমের ভিতর দিয়ে, ঘর্মের অবিশ্রাম ঝরে পড়ার মধ্যে সমাজতন্ত্র বেড়ে উঠছে। দেখাও কি করে এই শক্তি মানুষের ভিতরে ও কীর্তির মধ্যে জেগে উঠছে।"]

হার্বার্ট রীড আরো বলেছেন,

"Art must be regarded as a necessity like bread and water ; but like bread and water, it must be accepted as a matter of course ; it must be an integral part of our daily life, and must not be made a fuss of. It should be treated, not as a guest, not even as a paying guest, but as one of the family." [Herbert Read, Art in Transition, Art And Society, p. 113]

তবু একটি জায়গায় হার্বার্ট রীডের মতো সমালোচক রুশো'র সমাজবাদী সাহিত্যের একটি প্রবণতাকে প্রশংসা করতে পারেননি, তিনি দেখেছিলেন সমাজবাদী সাহিত্য, বিশেষ করে সোভিয়েট রুশিয়ায়—"had not been allowed to evolve organically, as a dialectical synthesis of imagination and reality···but in actual practice the most fatal of procedures has been adopted : The imposition of an intellectually predetermined conception of what art should be in a socialist community."

[Herbert Read, Socialist Realism, Art and Society, p. 129]

হার্বার্ট রীডের মতো সমালোচক মনে করেছেন যে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রুশিয়ায় সাহিত্যকে কল্পনার অস্তি নাস্তি বোধের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি, পরন্তু কতকগুলি পূর্ব থেকে গৃহীত ধারণা সাহিত্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলে দেওয়া হয়েছে সমাজতান্ত্রিক-সমাজে সাহিত্যকে কেমন হতে হবে।

এ ধারণা কেবল হার্বার্ট রীডের নয় পৃথিবীর বহু দেশে বহু সাহিত্যপ্রেমী ছোটবড় মানুষের। এ তর্কের নান্দনিক মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ হাজার হাজার বছর ধরে যে সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছে তার মূলে রয়েছে এমন একটি দর্শন যাতে সাহিত্যে মানুষের বা সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য : ···"We in the west had dvveloped institutions based on ideas in which the individual liberty of the citizen was the key stone. It had taken us centuries to develop this". (M. Philips Price, Moscow, Russia Forty Years on, 1st ed. 1961, p. 55)]

কিন্তু সোভিয়েট দেশের এই বিতর্কিত সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার সম্পর্কে আমাদের সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ M. Philips Price তাঁর Russia Forty Years on-গ্রন্থের এক জায়গায় সোভিয়েটের কিছু বুদ্ধিজীবীর তিনি সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তিনি লিখছেন—"We all agreed that the Russian Soviet form of government was something well suited to Russia because the country was vast and unwiedly that there has always been a tendency among Russians to be disorderly. A strong central government has been a histo-

rical necessity for the country since the time of the Mongol invasion in the thirteenth century and Ivan the Terrible was the first man to realise this and to unify the hitherto chaotic community of the Eastern Slavs.

We also discussed the necessity for strong measures to pull Russia out of her backwardness. We agreed that Russia had not passed through the kind of experience that we and France had in the coming of the Renaissance in art and literature in the sixteenth century and in the Reformation of the Church. All this made Russian history different from ours and its growth more spasmodic than in the West. Communism had performed the necessary function of forcing a backward people out of its lethargy when democratic methods might have not succeed." [M. Philips Price, Moscow, Russia Forty Years on, p. 56]

M. Philips Price ও সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ বলে আমাদের ধরে নেওয়াই সঙ্গত। রুশের মতো একটি অতি বিস্তৃত দেশকে প্রশাসনিক দিক থেকে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ করতে যেমন সোভিয়েট ধরণের সরকারই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিলো, ঠিক তেমনি অসংবদ্ধ, পশ্চাৎপদ, রেনেশাঁ বা রিফরমেশনের প্রভাবশূন্য এক বিচিত্র 'পিছিয়ে পড়া' জাতিকে অতি দ্রুত প্রগতির পথে চালিত করতে এক কমিউনিজমই পেরেছিলো। ফলে, সঙ্গত কারণেই বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট-সাহিত্য যেন যথেচ্ছ আচরণ না করতে পারে সেজন্য সেদেশের নেতৃবৃন্দকে সচেতন থাকতে হয়েছিলো। কারণ সাহিত্যিকদের সেই স্বাধীনতা দিলে তাঁদের কলমের যদৃচ্ছ লেখনী মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে, ঘরে-তোলা বিপ্লবের ফসলকে নষ্ট করে দিতে পারে বলে তাঁরা আশংকা করেছিলেন। দেশের সংহতিকে রক্ষার জন্যই সেজন্য লেনিনকে ঐ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিলো [Down with non-Party Writers : Down with literary superman !]

কিন্তু ১৯৩৫ সাল নাগাদ 'কমিনটার্ণ'-এর বিশ্ববরেণ্য নেতা জর্জি ডিমিট্রিয়ফ স্বদেশ-বিদেশের লেখকদের উদ্দেশ্যে এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, "Help us, help the party of the working class, the commintern give us a keen weapon in artistic form in poetry, novels and short stories to use in this struggle."

এই মহৎ আবেদনে সাড়া দিয়েছেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ ও

আমেরিকার বহু শক্তিমান সাহিত্যিক ও শিল্পী। সে সাড়ার ঢেউ আমাদের দেশেও এসে লেগেছিলো। ফলে, বাঙলা সাহিত্য নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে ছিলো, বেগবান হয়েছিলো।

আবার বাঙলা সাহিত্যের এই পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংশয়, সংকট ও বিতর্কেরও স্থচনা হয়েছিলো। বিপ্লবোত্তর একটি দেশের রাষ্ট্রশক্তির দেশীয় সাহিত্যকে নতুন পথে পরিচালনা করা যতটা সহজ হয়ে ওঠে সেই কাজই কিন্তু ভারতবর্ষের মতো পররাষ্ট্র-শাসিত একটি পরাধীন দেশে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অবিভক্ত বাঙলাদেশে তাই বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার সাহিত্যাদর্শ কমিউনিস্ট-পার্টি, পার্টির মুখপত্রসমূহ, পার্টি-সদস্য লেখকগোষ্ঠী ও বামপন্থায়-বিশ্বাসী লেখক সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো। আরো স্থখের বিষয়, বহু অকমিউনিস্ট অথচ প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্ ও লেখকবৃন্দও এই প্রভাবের আওতায় এসে পড়েছিলেন। তাঁদের পরিশীলিত মন বুঝতে পেরেছিলো সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিস্ট দানবদের হাত থেকে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের সঙ্গেই চলতে হবে। তাই বাঙলাদেশে আমরা দেখেছি 'প্রগতি লেখক সংঘ', 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ', 'গণনাট্য' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংঘ ও সংস্থার পতাকাতলে বাঙলাদেশের প্রায় সমস্ত সমাজ সচেতন লেখক শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বরূপ দুটি সাহিত্য-পত্রিকার কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি। তাদের একটি 'পরিচয়' পত্রিকা, অপরটি 'অরণি'।

'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ'-এর হাতে অর্পিত হবার পর (১৯৪৪) থেকে সেই পত্রিকা তার প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, পুস্তক সমালোচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়েই পাঠক সমাজের কাছে নতুন যুগের বার্তা পৌছে দেবার কাজে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ-এর 'বুধবারের বৈঠক'-এ যে সমস্যাগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিলো সেই সমস্যাগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের রচনার মধ্যে দিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। সাহিত্যে ও শিল্পে, মার্কসবাদী মতাদর্শ-এর প্রয়োজন কতটুকু, সাহিত্যে কোনো পার্টি নির্দিষ্ট 'লাইন' থাকা উচিত কিনা? এসব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া তখন জরুরী হয়ে উঠেছিলো—প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিলো। 'পরিচয়' পত্রিকা তখন এই সুস্থ বিতর্কের মধ্যমণি হয়েছিলো।

বাঙলা সন ১৩৫৪-তে পরিচয়ের পৌষ-সংখ্যায় বিদগ্ধ সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বিতর্কিত প্রবন্ধ 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' ঝড় ওঠাতে

সাহায্য করেছিলো। আইয়ুব সাহেব তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে 'আর্থিক সাম্য আদর্শ সমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য হলেও সেটাকেই চরম আদর্শ বলে মেনে নিতে আমাদের শ্রেয় বোধ রাজী নয়।"

"মার্কসবাদীদের···ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে·· চিন্তা এত কৃপন এবং দেউলে কেন তার হদিস মেলে না।" "ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে সেটাকে যেন ব্যাহত হতে না দিই। তারজন্য বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, ডেকেডেণ্ট—যত গালাগালি দেওয়া হোক সমস্ত সহ্য করবার মতো মহৎ বেহায়াপনা যেন আমাদের থাকে।" [পৃঃ ৫২৭-৫৩৬]

বলাবাহুল্য, আইয়ুব সাহেব, সেই প্রত্যাশিত গালিগালাজের প্রতিবাদী তিক্ত স্বাদ লাভ করেছিলেন মার্কসবাদী-তাত্ত্বিক অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, শীতাংশু মৈত্র ও নীরেন্দ্র রায়ের প্রতিবাদী প্রবন্ধগুলি থেকে। এই উত্তপ্ত বাদানুবাদ থেকে সেদিন এই কথাটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে রুশ-বিপ্লব যে নতুন সোভিয়েট-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলো—যে সাহিত্যাদর্শকে জগৎ জুড়ে চালাতে চেষ্টা করেছিলো তার স্বপক্ষে লড়াই করবার জন্য অবিভক্ত বাঙলাদেশে বহু সাহিত্যিক-যোদ্ধা বর্মে অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন যেভাবে তাঁরা আইয়ুব সাহেবের সাহিত্যিক আদর্শকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন তা আজ আমাদের পুলকিত করে। রুশের পক্ষে, সমাজবাদের পক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা অতি উৎসাহে মার্কস, লেনিন-এর বহু উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা নিজেদের তৎকালীন ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যা আদৌ সঠিক ছিলো না। তবে অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র তাঁর প্রবন্ধের শেষে অবশ্য একথাটি স্বীকার করেছিলেন যে, "বহু মার্কসিস্ট সাহিত্যিকের একাগ্র শিল্প সাধনার অভাব আছে। অনেকেই সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চান। টেক্‌নিক ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা অনেকেই করেন না। বস্তু জগত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীল অভিজ্ঞতাও অনেকের নেই। অপরের চৈতন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁরা অনেকেই অর্জন করেননি। সুতরাং আইয়ুব সাহেবের প্রবন্ধটিকে একটা হুঁশিয়ারি হিসাবেও নিতে হবে।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৯৫]

'পরিচয়' পত্রিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধটিকে নিয়ে যখন ঝড় উঠেছে এবং সেই ঝড়ে যখন অমৃতের সঙ্গে অনেক হলাহলও উঠেছে তখন বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ত্রিদিব চৌধুরী 'ক্রান্তি' পত্রিকার ১ম বর্ষের, দ্বাদশ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৫৫) একটি অত্যন্ত সংহত প্রবন্ধ লেখেন—"সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদ" নামে। সেই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আইয়ুবের মতামতকে যেমন খণ্ডিত করেছেন তেমনি ভাবে সচেতন করে দিয়েছিলেন মার্কসবাদী আলোচকদের যে

তাঁদের আক্রমণের যুক্তিতেও অনেক ফাঁক ফোকর আছে। উদ্দীপক, কিন্তু অযথার্থ যুক্তি দিয়ে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না একথা সেদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঐ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছিলেন "…মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার যে অসামঞ্জস্য সমাজ-বিপ্লবকে অপরিহার্য করে তোলে, শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-সংঘর্ষে পরিণত করে, মানুষের জীবনকে স্বীকার করতে গেলে তাকেও স্বীকার না করে উপায় থাকে না, তাকে অতিক্রম করে বা তাকে এড়িয়ে গিয়ে মানবিক অনুভূতিতে স্পন্দন জাগানো যায় না, তাকে সংবেদনশীল করে তোলা যায় না। সেইজন্যেই লেনিনের কথায়, মহাকবি মাত্রেই বিপ্লবের মুকুর, দর্পণ বা mirror হিসেবে জীবনের যেই অন্তর্লীন সংঘর্ষকে নিজের কাব্যের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত করেন। কিন্তু বিপ্লবের দর্পণ হিসেবেও যেখানে কবি সাহিত্যিক কাজ করবেন যেখানেও তাঁকে আত্মেতর জনের মানস সংবেদনশীলতার কাছে আবেদন করতে হবে প্রথমত। তা না করে খালি বিপ্লবের বা বিপ্লবী দলের bally-boo গানের তারস্বরেই তিনি সার্থক সাহিত্য স্রষ্টা মহাকবি হয়ে উঠতে পারবেন না।

"Making man's senses human as well as creating human senses corresponding to the vast richness of human and natural life."

কল্পনার মায়াকাঠি ছুঁইয়ে যিনি যত সার্থকভাবে এ কাজ করতে পারবেন তিনি তত বড় কুশলী কবি হিসেবে পরিগণিত হবেন। নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে সেই কুশলতাই হবে সাহিত্যের চরম মূল্য।…My property is form, it is my spiritual individuality. The style is the man—সাহিত্যশৈলী সম্পর্কে এ উক্তি মার্কস-এরই।…আইয়ুব মার্কসীয় দর্শনে মানবিক বা পরম মানবিক শ্রেয়বোধের কোনোই প্রতিমান খুঁজে পাননি।…কিন্তু আইয়ুবের সাহিত্য বিচারের প্রতিমানও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক শ্রেয়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।… ক্রান্তির যুগে শিল্পী এবং সাহিত্যিকের কাছে মার্কসবাদীর আবেদন তাই যে—তোমার অখণ্ড মানবতাবোধ এবং মানব-সংবেদন নিয়ে তুমি নূতন জগৎ গড়ে তোলার কাজে অংশ গ্রহণ করো। জীবন শিল্পী তুমি। তোমার মানবতাবোধ এবং মানব সংবেদনের সততাই তোমাকে নূতন জগৎ সৃষ্টির বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম করবে। তোমার সাহিত্যের চরম মূল্যই তোমাকে সমাজ বিপ্লব সচেতন করবে। তোমার সাহিত্যিক এবং শিল্পীমন আমাদেরকেও বিপ্লব সচেতন করবে।"

সাহিত্য-বিতর্কের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে যখন এই দুই মতাদর্শের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে তখন ত্রিদিব চৌধুরীর এই অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ যেন ক্লান্ত পাঠককে সঠিক ইতিহাস-বিশ্লেষণ ও সঠিক সাহিত্যাদর্শের আদর্শ পথটিকেই আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছিলো। আমাদেরও দ্বিধা মুক্তি ঘটে গিয়েছিলো।

অরণি : (১৯৪১ প্রথম প্রকাশ, ২২শে অগাষ্ট শুক্রবার)
সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

"রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক সাপ্তাহিক"

এই অতি বিখ্যাত বামপন্থী পত্রিকাটির জন্ম হয়েছিলো রুশ-বিপ্লব ও নবজাত সোভিয়েট দেশের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের এই ঈষৎ পরিবর্তিত গীতাবাক্যটি দিয়ে—

"যত্র স্তালিন মহাজ্ঞানী / যত্র রক্তো চ বাহিনী।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতি / ধ্রুবা নীতি মতির্মম॥"

যে পক্ষে (যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণের স্থানে) মহাজ্ঞানী স্তালিন এবং (মহাভুজ পার্থের স্থানে) লাল ফৌজ, সে পক্ষের বিজয় তো অবধারিত।

অরণির প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় 'রবীন্দ্রনাথ'। কারণ এই পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন আগেই বিশ্বের প্রথম সারির ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিলো। তাই সংগত কারণেই 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো "রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার কাব্য ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বাঙলাদেশ অকাল মৃত্যুর দেশ।… নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, / …ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। হে কবিগুরু। তোমার এই সর্ব্বশেষ আশ্বাস সম্বল করিয়া আমরা পূর্ব্ব দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি।…"

প্রথম সংখ্যায় বিনয় ঘোষের "শিল্পী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ থেকে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিনি লেখেন, "আজ তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশেষের নয়, পৃথিবীর সাম্যবাদীদেরও ও দৈনন্দিন সংগ্রামে ক্লিষ্ট মানুষের প্রেরণার উৎস, এবং একমাত্র সাম্যবাদীরাই রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রাবীন্দ্রিক কল্যাণদর্শের শ্রেষ্ঠ পূজারী।"

'অগ্রণী' নামে প্রগতিশীল পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার পর কমিউনিস্ট পার্টির তেমন কোনো মুখপত্র না থাকায় সেই স্থান পূর্ণ করে 'অরণি'। 'অরণি' ছিলো একটি অঙ্গীকারবদ্ধ (কমিটেড) পত্রিকা। ৩য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যার প্রধান সম্পাদকীয় 'কাগজ নিয়ন্ত্রণ'-এ পত্রিকাটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়। "গত চার বৎসর পূর্ব্বে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা 'অরণি' প্রকাশ করি। প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদের দিক হইতে জাপ-জার্ম্মান ফ্যাসিস্ত বর্ব্বরতার প্রতিবাদ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং সমাজতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকার আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। ভীরু দুর্বল মানুষের মন যখন ফাসিস্ত ডিক্টেটরীর দাপটে অভিভূত ও আচ্ছন্ন, সেই সময় সমষ্টি মানুষের কল্যাণের দিক হইতে দেশের বুদ্ধিমান যুবক সম্প্রদায়কে চিন্তা করিবার জন্য আমরা আহ্বান

করিয়াছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা প্রগতিশীল ভাবধারা বহন করিয়াছি।"

শুধু ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মতাদর্শকে রক্ষা করা নয়, ফ্যাসিবাদকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য 'জনযুদ্ধ'কে জনপ্রিয় ও তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব 'অরণি' স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলো। মনে রাখতে হবে যে 'অরণি' যখন এসব কাজ করছে তখনও পাক্ষিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' প্রকাশের অপেক্ষায় এবং 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এ ধরণের লেখার যোগ্য বাহন ছিল 'অরণি'। যে পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁকে ঘিরে অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি মনোজ্ঞ এক চক্র গঠন করেছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গৌরবদিনের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা হয়েও তিনি রাজনৈতিক সৎসাহসের মূল্য দিয়েছিলেন সেই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ, সমীক্ষা, পুস্তক-সমালোচনা, নাটক, কবিতা, অনুবাদ ও গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের রক্তের কত গভীরে যে রুশ বিপ্লবের মর্মবাণী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলো তার নির্ভুল প্রমাণ মেলে।

'অরণি'র ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সংখ্যায় কবি বিষ্ণু দে'র 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে কবি সমালোচক সমর সেন লিখেছিলেন "...সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩০-এর আন্দোলনের পর থেকে বামপন্থী ভাবধারা বাংলায় বিস্তার লাভ করে। বামপন্থী সমালোচনা কতদূর সার্থক হয়েছে জানিনা, কিন্তু অন্তত এটা বামপন্থীরা বোঝাতে পেরেছেন যে সংকীর্ণ-কেন্দ্রে আসীন হয়ে সাহিত্যচর্চা করলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। ঐতিহ্যের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না সাম্প্রতিক জনজীবনের সঙ্গে কোনো রকম সংযোগ থাকে, উপরন্তু লোকায়তে নিজেকে বাঁধলে লোকোত্তরের সন্ধান মিলতে পারে। [তুলনীয় "Literature must become a part of the proletarian cause as a whole..." Lenin—লেখক]। বামপন্থী চিন্তাধারা আত্মম্ভরিতার হাত থেকে অনেককেই বাঁচিয়েছে (পৃঃ ৪০)।" অরণিতে 'মহাযুদ্ধের গতি' নামে একটি সমীক্ষা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছিলো। ১৯৪২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখা হয়েছিলো "স্টালিনগ্রাড হইতে চিকিয়াং পর্যন্ত রণক্ষেত্রে আজ যে জীবন মরণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহা কাহারও একার সংগ্রাম নহে, এবং কাহারও একার ভবিষ্যৎ তাহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না। জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের ভবিষ্যৎ আজ পরস্পর সংলগ্ন নিজের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, এই বিশ্বসংগ্রামের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, স্বাধীনতা রক্ষার দিন আর নাই। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর স্টীম রোলার আজ এই সীমারেখা

একটির পর একটি চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে।...এইখানে প্রতিরুদ্ধ না হইলে তাহারা ককেশাস পার হইয়া ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে। আরেক দিকে আফ্রিকার ফ্যাসিস্ট বাহিনী লিবিয়া পার হইয়া মিশর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং মিশর হইতে সুয়েজখাল পর্যন্ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। দুই দিকের ফ্যাসিস্ট অভিযান সফল হইলে জার্মানী স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষকে পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এদিকেও চীনের নূতন প্রতি আক্রমণ যদি ব্যর্থ হয়, নিউগিনিতে জাপানের আক্রমণ যদি সফল হয়, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ঘাটি দৃঢ় করিয়া আমেরিকা যদি আক্রমণ না করিতে পারে, এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন জনসাধারণ প্রবল-আন্দোলনের চাপে যদি ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার অজুহাতে অপসারিত করিতে না পারে, তাহা হইলে দুই দিক হইতে নিশ্চিন্তে জার্মানী ও জাপান ভারতবর্ষের দিকে আগামী শীতকালের মধ্যে অভিযান করিবে, কারণ ইউরোপের যুদ্ধ শীতাগমে স্থগিত থাকিলেও এদিকের যুদ্ধ শুরু করিবার সময় ঠিক তখনই আসিবে। আমাদের দুর্দিন খুব দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।" [পৃঃ ৪৭]

এই নিবন্ধটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি সচেতন মানুষেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে রোখার জন্য রুশিয়া চীনে ও আফ্রিকায় যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে যদি অশুভ ফ্যাসিস্ট শক্তি জয়ী হয় তাহলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না—এ সিদ্ধান্তে স্বতঃ-সিদ্ধভাবেই এসে পৌছেছিলেন। তাই তাঁদের লেখনী বারবার ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সচেতন ও হুঁশিয়ার থাকতে আহ্বান জানিয়েছে।

৭ই অক্টোবর ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো 'অরণি'র পূজা সংখ্যা। এই সংখ্যায় প্রখ্যাত কবি গোলাম কুদ্দুসের লেনিনের উপর লেখা একটি কবিতা ছাপা হয়েছিলো। লেনিনকে হত্যা করার চেষ্টা এবং তার ফলে লেনিনের অসুস্থতা ও মৃত্যু জগতের সমস্ত আশাবাদী মানুষকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিলো। কিন্তু লেনিনকে মেরে যে 'লেনিনবাদ'কে হত্যা করা যায় না—সে প্রত্যয়ে এই বাঙালি কবি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি লিখছেন—

আমাদের সব্যসাচী ভ্রাতৃহত্যা প্রতিশোধ নিতে
রক্তে মাংসে দেখা দিলো পৃথিবীর অন্তপ্রান্তে এসে
কেমন আশ্চর্য লাগে। ধর্মদীর্ণ এই ধরণীতে
শোষণের যূপকাষ্ঠে কত যে ভ্রাতারা কত দেশে
প্রত্যহ শোণিত ঢালে, সে কথা কে মনে করে রাখে!
অনির্বাণ হিংসা কিন্তু লেনিনের অবিস্মৃত বুকে
লালিত হয়েছে যত্নে, তারপর আপন জ্বালাকে
ধীরে ধীরে ঢেলে দিলো বৃহত্তম জ্বালার সম্মুখে।

এই ভ্রাতা লক্ষ হল, এক রক্ত লক্ষ ধমণীতে,
একের পথের দাবী লক্ষ মানুষের সঙ্গ ধরে।
এক প্রতিহিংসা জ্বালা লক্ষ প্রতিহিংসার ভঙ্গিতে
অকস্মাৎ প্রেম হয়। সেই প্রেম আমাদের ঘরে
অসীম বিশ্বাসে জ্বালি ভারতের এ ক্ষুব্ধ রাত্রিতে,
পথ যাতে স্পষ্ট দেখি আলেয়ায় না ঘুরি প্রান্তরে।

['সব্যসাচী', গোলাম কুদ্দুস, 'অরণি', ১৯৪২]

২০শে নভেম্বর সংখ্যায় গোলাম কুদ্দুসেরই '৭ই নভেম্বর' নামক একটি কবিতা ছাপা হয়। রুশ বিপ্লব ও লেনিন যে সেদিন বাঙালির অন্তরে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিলো—এই কবিতাটি তার প্রমাণ।

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
যেখানে জুয়াড়ী স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধ্নুর ভিড়ে মাতে,
মানুষ যেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়ি কেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।
স্বাধীকার মুক্তি আজ, ন্যায় যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন।
এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা—সাধনা, শ্রেণীহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিক জনের
সাগর সঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ।
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন।

বিজন ভট্টাচার্যের যে 'নবান্ন' নাটক একদিন বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো সেই জনপ্রিয় নাটকটি প্রকাশিত হয় 'অরণি' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৩৭ সংখ্যা থেকে ৪৩ সংখ্যা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে।

১৯৪৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা "ভারতবর্ষ"।

মাঝে মাঝে তন্দ্রা ভেঙে যায়,
নিদ্রালস স্নায়ু মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায় দোলা
দূরাগত সমুদ্র-গর্জন।
ক্লান্ত আঁখি পুনরায় নিভে আসে নির্জীব ব্যথায়।
দিক প্রান্তে ঝড়ের ইশারা।

…ডানা মেলি সামুদ্রিক চিল
কথনো অশুভ ডাকে চারিদিক সচকিত করে
দ্রুততর উড়ে চলে নীল জলে ফেলি নিজ ছায়া
ভারতের গাঢ় নীল জল।
যেথানে অনেক স্রোত চীনের প্রাচীর আর রাশিয়ার হিম পার হয়ে
অনেক উত্তাপ নিয়ে মিশে আছে সকলের সচেতন মনের আড়ালে।
…সহসা স্তব্ধতা ভাঙি কোনো এক কবোষ্ণ সন্ধ্যায়
মেঘচুম্বী বিটপীর সারা দেহে আলো এসে পড়ে,
পশ্চিমের আকাশে আগুন।…
নিদ্রাতুর আঁথি হতে বহুক্ষণ নেশা গেছে ছুটে,
সমুদ্র-গর্জন মাঝে মৃত্যুর সঙ্গীত বেজে ওঠে,
উত্তরে কাশ্মীর হতে সুদূর দক্ষিণে কুমারিকা।
অতি ধীর, গতির আমেজ।
অগ্নির ইশারা পেয়ে জঙ্গম হয়েছে অজগর।

১৯৪২ সালের ২৪শে এপ্রিল 'অরণিতে' প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে'র একটি কবিতা "অজেয়"।

কতবার এল কত না দস্যু! কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি থেল কত ধান
কতো মা গাইল বর্গীর গান
তবু বেঁচে থাকে অক্ষয় প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি
অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন জ্ঞান
দীর্ঘকালের ধারা জলে জলে
চেতনার পলি সোনালি ফসলে
এ দেশে, বন্ধু, কতকাল ফলে।
মাটির টান।
দিকে দিকে জলে, পুড়ে' ছারথার তানাকাসান।
হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তির দ্বার
দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতার ছার
এই যে প্রবীণ হিন্দুস্তান
কত সভ্যতা আকণ্ঠে পান

কত দুর্গম লক্ষ্যে প্রয়াণ
কত না বার
করেছে, আজকে ধরেছে চেতনা খর কুঠার ॥

১লা মে সংখ্যাতেও 'গান' নামে বিষ্ণু দে'র একটি কবিতা 'অরণি'তে মুদ্রিত হয়।

বিশ্বের মুক্তির শুনি আজ আহ্বান,
সেই জয়গানে ডাকে সারা হিন্দুস্তান।
কাঁটা পথ, ঝরে স্বেদ,
আছে ভয় ভেদাভেদ,
তবু চলে পল্টন, মজুর কৃষাণ,
জানি আজ দুর্দিন,
তবু আছে রুশ, চীন,
ইংরেজ, মার্কিন দেশে জাগে জনগণ।
ফ্যাসিস্ট বর্বর,
অতিষ্ট জর্জর,
আপন মরণবাণে হয়ে যায় খান্ খান্।

১৫ই মে বিষ্ণু দে'র আরেকটি কবিতা মুদ্রিত হয় 'অরণি'তে। নাম "তোমরাই মহাকাল"—

আলগা মাটির হালকা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানস লোকের বাসিন্দা যতো তন্দ্রহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির কমলকাননে ঢোকে যে হাতীর পাল,
অর্থগৃধ্নু অস্ত্রগৃধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।
বানপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজীর পিছে,
কোটাল পিটায় নিজের কপাল কোথা কোটালের বান
মুষিক বিবর খোঁজে সদাগর, চোখ ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কানা করে যতো পুরসুন্দরী চলে যান।
দুর্দিনে আসে লেলিহ রসনা পাগলা হাতীর পাল
ছুটেছে অর্থ গৃধ্নু অস্ত্র মাতালের অঙ্কুশে।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে খায় বুঝি আলগা মাটির কাল
নব-জীবনের বীজবপনের মরণান্তিক ক্রুশে।
ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা ধরেছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রী মুখর তোমারই মহাকাল।

সভ্যতার চরম দুর্দিনে যে বিপ্লবী-শক্তি মানুষের তিল তিল করে গড়া সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী কৃষক-শ্রমিক সমাজকে কবি দেশের হাল ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন। সোভিয়েট-রুশিয়ায় এই শ্রেণীই একদিন বিপ্লব-সংঘঠন করে ইতিহাসের ধারাকেই যে পাল্টে দিয়েছিলো এ ঐতিহাসিক সত্যে বিশ্বাস না করলে এই ধরণের কবিতার জন্ম সম্ভব ছিলো না।

এই একই প্রত্যয় ও বিশ্বাস থেকে সম্প্রতি মস্কো-নিবাসী প্রখ্যাত কবি উপন্যাসিক ননী ভৌমিক একদা 'অরণি'তে লিখেছিলেন কবিতা—নাম "গরিলা"

ভাঙা ইঁটে, বন বাদাড়ে ছায়ারা ফেরে
ধূসর বাতাসে শত্রুর ঘ্রাণ টেনে।
মশালের লালে শপথ নিয়েছি পড়ে :
রুখবো গাঁয়ের, ফসলিয়া মাঠ, ঘর ;
মৃতদেহ আর হাহাকার চিনে চিনে
আজ অভিজ্ঞ, রাইফেল লটকাই
টুকরো শেলের সঙ্কেতে অম্লান—
শূর্য প্রণাম এখানেই রেখে যাই,
পাহাড়িয়া পথ ঢালু আর উৎরাই
শোনে, স্পন্দিত অমাবস্যার গান।

রুশ-দেশে যে সশস্ত্র-সংগ্রাম বিপ্লবকে প্রতিক্রিয়াশীলদের রক্তাক্ত প্রতিহিংসার প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলো—কবি সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য 'গেরিলা' সাজতে চেয়েছেন। রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? [কবিতাটির নাম 'গরিলা' সম্ভবত কোনো ভ্রান্তির বশে হয়েছিলো]

'অরণি' ১ম বর্ষের ২৬শে জুন সংখ্যা, ১৯৪২ 'সোভিয়েট সংখ্যা' নামে প্রকাশিত হয় [মনে রাখতে হবে ঐ বছরেরই ২২শে জুন ফ্যাসিস্ট জার্মানী রুশ-দেশ আক্রমণ করেছিলো]। জার্মানদের রুশ-দেশ আক্রমণের ৪ দিনের ভিতরে একটি আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকার 'সোভিয়েট সংখ্যা' প্রকাশ করার সঙ্কল্প ঘোষণা নানা কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রুশ-ভূমি, সেই দেশের সংঘটিত হয়ে যাওয়া 'বিপ্লব' ও নবজাত 'সমাজবাদ'-এর প্রভাব ও তার প্রতি সমর্থন ও বিশ্বাস কত গভীর হলে মস্কো থেকে কয়েক সহস্র মাইল দূরে কলকাতাতেও তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

বাঙলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর খুব কম পত্রিকাই সেই সময়ে সোভিয়েট দেশকে নিয়ে 'বিশেষ-সংখ্যা' প্রকাশ করার কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, এইরকম একটি বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের যে আগ্রহ 'অরণি' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ছিলো তার চেয়েও বেশি উন্মুখ ছিলো বাঙলা

দেশের জনগণ। সেইজন্য ঐ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছিলেন এই বলে—"চাহিদা অনুযায়ী সকলকেই যাহাতে এই সংখ্যা সরবরাহ করিতে পারা যায় তজ্জন্য 'অরণি'র এজেন্টগণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, এই সংখ্যা তাহারা যত কপি অধিক লইবেন, আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে 'ম্যানেজারের' নিকট তাহারা পত্র লিখিয়া পাঠান"…ইত্যাদি।

এই বিশেষ সংখ্যার লেখক সূচীতে ছিলেন যথাক্রমে—

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার; শ্রী সজনীকান্ত দাস; শ্রী সমর সেন; শ্রী বিষ্ণু দে; শ্রী অরুণ মিত্র; শ্রী অবন্তী সান্যাল; শ্রী নবেন্দু রায়; শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়; শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়ন; শ্রী গোপাল হালদার; শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রী ধরণী গোস্বামী; শ্রী আবদুল হালিম; শ্রী মনিকুন্তলা সেন; শ্রী সুধী প্রধান; শ্রী বিনয় ঘোষ; শ্রী অতুল দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এই সংখ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছে। শেষের একটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

…জাগ্রত চল্লিশ কোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙ্গীণ দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর,
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে, তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার—
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার॥

রুশ-বিপ্লব ও নবজাত সমাজবাদ বিশ্বের সমস্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষ ও পরাধীন দেশগুলির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারই ফলে বিশ্বজুড়ে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, লেখক কবি, রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষক সমাজ সংঘবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছিলো।

এ ছাড়াও 'অরণি' পত্রিকাতে যুদ্ধ ও যুদ্ধের গতি প্রকৃতি, নানাধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষা, লেনিন, গোর্কী ডিমিট্রিয়ভ, রোমাঁ রোলাঁর মতো মানুষদের নানা তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি, ইণ্টারভিউর বিবরণ ছাপা হতো। বামপন্থীদের নানারকম আত্মসমালোচনাও থাকতো।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামে 'অরণি'তে নিয়মিত লিখতেন। ২০শে নভেম্বর ১৯৪২ সংখ্যাতে ভারতবর্ষের মতো দেশে 'সাম্যবাদী' হওয়া যে কত কঠিন তার পর্যালোচনা করেছেন—"‥পুজিতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বাস করে আমরা সমাজতান্ত্রিক যতখানি চিন্তাধারায়, ততখানি বাস্তব জীবনযাত্রায় নই। তবু এরই মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে মনের আর বাইরের জীবনকে যথাসাধ্য আদর্শের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করতে হয়। এই কারণেই রাতারাতি সাম্য-

বাদী হওয়াও যেমন যায় না—তেমনি সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রারম্ভটাও এক-দিন আকাশ থেকে আপনা থেকে টুক করে খসে পড়ে না। তার জন্য আগে থেকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়—মনেও, জীবনেও। সমাজ বিপ্লবের সৈনিক হওয়ার আগে ব্যক্তিগত জীবনের ছোটোখাটো বিদ্রোহের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাকা পোক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন আছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বাস্তবে না হলেও, অন্ততঃ সচেতন মনে সব সময়ে খাঁটি হতে হবে পুরোপুরি।''

প্রবন্ধ লেখক এমন এক কট্টর সাম্যবাদী নায়কের দেখা পেয়েছিলেন যিনি লুকিয়ে পৈতে ধারণ করেন। সেটা লেখকের কাছে গুরুতর কোনো অপরাধ নয়, কেননা তিনিই বলছেন "···গলা থেকে উপবীত ফেলে দিলেই রাতারাতি একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটছে না, কিম্বা পৈতা গলায় থাকলেই প্রবাহটা অবরুদ্ধ হয়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকবে না।''

আসলে ঐ সময়ে 'সাম্যবাদ' কথাটি এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবীর কাছে 'বিলাস' হয়ে উঠেছিলো। তাদের আক্রমণ করেই প্রাবন্ধিক লিখছেন "···সাম্যবাদ তাঁর কাছে একটা নিছক চিন্তা বিলাস। যা কিছু নতুন, যা কিছু অনাগত তারই আলোচনায় গবেষণায় তার মগজের ক্রিয়া চাড় খায়, চাঙ্গা থাকে।

Art for Arts Sake-এর মতো তাঁর কাছে "সাম্যবাদের জন্য সাম্যবাদ" অতএব সাম্যবাদ তাঁর মগজে থাকলেই যথেষ্ট স্বভাবে বা সংস্কারে আসার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ উচ্চ মঞ্চে বসে তিনি জীবনকে যথাসম্ভব এড়িয়ে জীবনের আদর্শকে প্রচার করতে চান। একেবারে বৈষ্ণবী প্রেম।"

যথাসময়ে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী ও অভ্রান্ত পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে 'পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের' মধ্যে বাস করে সেই যুগে একজন সাম্যবাদীর বিপ্লব-চিন্তা ও বিপ্লব-সাধনা কতটা শ্লোগানধর্মী ও অন্তঃসারশূন্য হবার সম্ভাবনা ছিলো। সমাজ, পরিবেশ ও বাস্তব সত্যকে মনে না রেখে শুধু চোখ বুজে 'কমিউনিস্ট' হলে এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠায় 'বিপ্লব' চাইলেও যে তা করায়ত্ত করা যায় না এ সহজ সত্যটি সেই যুগে অনেক কমিউনিস্ট ও বামপন্থী বুঝতে চাইতেন না। তাঁরা বুঝতে চাইতেন না যে "সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রারম্ভটাও একদিন আকাশ থেকে টুক করে খসে পড়ে না। তার জন্য আগে থেকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়—মনেও জীবনেও।"

সুখের কথা অবিভক্ত বাঙলাদেশে সেই কাঠখড় পোড়ানোর কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। এবং তার অনিবার্য প্রভাব বাঙালী-কমিউনিস্ট ও সাম্যবাদীদের অনেকের মনে ও জীবনে পড়তে আরম্ভ করেছিলো। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো কিছু প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা ও তার সঙ্গে জড়িত নানা প্রগতিশীল কবি লেখক ও সাংবাদিকরা। বলাবাহুল্য, এঁদের মধ্যে

অনেকেই কমিউনিস্ট-পার্টির সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। এই সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা ইতিহাস ও তার সঠিক বিশ্লেষণ, মার্কসবাদের উপর লিখিত নানা মূল্যবান প্রবন্ধ, নানা তর্ক বিতর্ক, রুশ-বিপ্লবের খুঁটিনাটি, লেনিন, গোর্কী, ডিমিট্রিয়ভ, স্টালিনের নানা রচনা, চিঠিপত্র, মন্তব্য, নির্দেশ বাঙালী-সাম্যবাদীদের মনকে সমৃদ্ধ, ইতিহাস ও পরিবেশ সচেতন, সতর্ক ও সঠিক কর্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে সাহায্য করেছিলো।

এদের মধ্যে 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' ও 'পরিচয়' পত্রিকা বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছিলো। আমরা সংক্ষেপে এই পত্রিকা ও এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনাবলীর একটি পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিবিধ পত্র-পত্রিকার বিস্তৃত আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে তারাও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় রুশ-দেশ, রুশ-বিপ্লব ও রুশ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার জনগণের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হয়ে থাক না কেন এই শতাব্দির সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারী ঘটনা যে রুশ-বিপ্লব সে বিষয়ে তাঁদের কোনো সংশয় ছিলো না। বাঙালী জাতির চিত্তকে নতুন বোধে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলো। তাই আমাদের এই ইতিহাস বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা ইতিপূর্বে 'পরিচয়' ও 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত নানাবিধ রচনার উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছি বাঙলাদেশের সেই উদ্দীপক দিনগুলিতে এই পত্রিকাত্রয় কিভাবে নানা বিভ্রান্তি, বিতর্ক ও কুজ্ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষকে ইতিহাস ও বাস্তব সচেতন এবং অতি ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ কালে ঘটাতেই হবে এমন এক বিপ্লব-এর স্বপ্নে বাঙালিকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলো। বলাবাহুল্য, এই সব উদ্যোগেরই জন্ম হয়েছিলো রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের আগুন থেকেই। এবার 'জনযুদ্ধ' নামক পাক্ষিক পত্রিকার আলোচনা করে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

জনযুদ্ধ : (১ম প্রকাশ, ১লা এপ্রিল, ১৯৪২)
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি, এম.এল.এ.

এই পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে। এক আনা দামের এই পত্রিকাটির প্রথম পাতাতেই লেখা থাকতো 'জনসাধারণের রাজনৈতিক পাক্ষিক পত্রিকা"—এই ঘোষণাটি। 'জনযুদ্ধ'-র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'কোন্‌দিকে' এই শিরোনামায় দুটি ছোট লেখা ছিলো—'সোভিয়েট রুশ অপরাজেয়' এবং 'ঐক্যবদ্ধ চীনের ভূমিকা'। প্রথম পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে সোমেন চন্দের একটি ছবি ছিলো। ছবির ক্যাপশান : "ঢাকায় ফ্যাসিস্ট গুণ্ডা কর্তৃক নিহত শ্রমিক

কর্মী ও সুসাহিত্যিক সোমেনচন্দ্র চন্দ্র।" দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছিলো 'সম্পাদকীয়'—'স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও'।

এই সংখ্যার অন্যান্য লেখা হ'লো—

'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে'—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
'চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ—বিনয় ঘোষ
'বন্দীদের মুক্তি চাই'—সুধী প্রধান
'মুনাফা না দেশ রক্ষা'—গোপাল হালদার
'সোভিয়েটের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ'—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

তৃতীয় সংখ্যা থেকে 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এবং এই সংখ্যাটি ঘোষিত হয় 'মে দিবস সংখ্যা' হিসেবে। এই সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' 'পহেলা মে' ও কিছু রাজনৈতিক সংবাদ ছাড়া যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

"সোভিয়েট দেশে যুদ্ধ ব্যবস্থা"—সিরাজুল ইসলাম
"জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে পোড়ামাটির কৌশল''—গোপাল হালদার
"বন্দীমুক্তি''—সুধী প্রধান
"এ-আর-পি / বাংলাকে রেঙ্গুন হইতে দিব না''—জ্যোতি বসু
"একতা আগে, হাতিয়ার পরে''—বিনয় ঘোষ প্রভৃতি।

প্রথমবর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা (২ সেপ্টেম্বর ১৯৪২) থেকে 'জনযুদ্ধ'কে 'কমিউনিস্ট পার্টি'র বাঙলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বলাবাহুল্য 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রকাশ কালে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নিষিদ্ধ হয়েছিলো এবং বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী হয় বন্দী না হয় পলাতক ছিলেন।

বাঙলা-সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'জনযুদ্ধ' বহু ঐতিহ্যের স্রষ্টা। সংবাদপত্রে নিয়মিত 'রিপোর্টাজ' রচনার রেওয়াজ 'জনযুদ্ধ'ই প্রবর্তন করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনগুলিতে সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে তার সঙ্গে কিছুটা তুলনা চলতে পারে সোভিয়েট রুশিয়ায় অক্টোবর-বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বে লেনিন সম্পাদিত পত্রিকা 'ইস্‌করা'র সঙ্গে।

ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনেও 'জনযুদ্ধ' অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। চল্লিশের দশকে বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন—কমিউনিস্ট পার্টি ও জনযুদ্ধ পত্রিকা সেই প্রচেষ্টাকে জননীর স্নেহে ও সতর্কতায় লালন করেছিলো। সমাজমানসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এই পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিংবদন্তীতে পরিণত এই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার একটি সমগ্র ইতিহাস আজও রচিত হলো না—এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই গ্রন্থে যেহেতু সেই অনালোচিত

ইতিহাস রচনার সুযোগ নেই সেইহেতু এ চেষ্টা থেকে আপাতত বিরত থাকতে হলো।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ থেকে একটা সত্য প্রমাণ করা সহজ হবে যে, চল্লিশের দশকে সোভিয়েটের উপর ফ্যাসিস্ট বর্বরদের অতর্কিত আক্রমণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি ছিলো? একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ ও অপরদিকে নবজাত সমাজ-তন্ত্র—এর মধ্যে কার দিকে পৃথিবীর নানাদেশের 'জনযুদ্ধ'-এর নায়ক ও সৈনিকেরা ঝুঁকবে? সেদিন কিন্তু এই সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া আজকের মতো সহজ ছিলো না। মানুষের মধ্যে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সংকটের ছায়া তখন এতো ঘন ছিলো যে 'সত্য'কে সনাক্ত করা সহজ কাজ ছিলো না।

বাঙলা দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সত্যান্বেষণে সাহায্য করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো ইতিহাসের সুপণ্ডিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো প্রগতিশীল সম্পাদক ও চিন্মোহন সেহানবীশের মতো ইতিহাস ও বিপ্লবের নিষ্ঠাবান গবেষক তখন 'সভ্যতা'র প্রয়োজনে তাঁদের কলম ধরেছিলেন 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায়। এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রবন্ধের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রভাবের মূল্যায়ন করবো।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রুশ-বিপ্লবের পর দুনিয়া জোড়া "আসন্ন বিপ্লবের আশংকায় দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ···ফ্যাসিজমের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এসেছে। এশিয়ায় জাপানকে, আফ্রিকায় ইতালিকে, ইয়োরোপে জার্মানিকে, ইংরেজ-ফরাসী-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহ দিয়েছে, সাহায্য করেছে··· ; সাম্রাজ্যবাদের ভরসা ছিল ফ্যাসিস্টরা প্রথমে আক্রমণ করবে দুনিয়ার মালিকদের চক্ষুশূল সোভিয়েত ভূমিকে।···আর সোভিয়েত ভূমিকে বিধ্বস্ত করতে পারলে, একবার পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে অধিকার বিস্তার করতে পারলে, সোভিয়েত দেশের বিপুল ঐশ্বর্য করায়ত্ত করতে পারলে তাদের শক্তি লালসা চরিতার্থ হবে। প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠ সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে ফ্যাসিজম আর লড়তে চাইবে না।···

···সাম্রাজ্যবাদের এই আশা ছলনামাত্র বলে প্রমাণ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে ইতিহাস ব্যর্থ করে দিয়েছে।···ফ্যাসিজমের প্রবল প্রতাপের সামনে ফ্রান্স মাথা নিচু করেছে, সারা ইয়োরোপ একটা গোলামখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।···

·· যখন হিটলার তার পঙ্গপালকে সোভিয়েত আক্রমণ করার হুকুম দিল, তখন ইংরেজ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর পরিত্রাণের আশা করতে পারল

না, হিটলারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত আক্রমণে যোগ দিতে পারল না। ইতিহাসের চাকা এমনভাবে ঘুরে গেছিল, সোভিয়েত-মৈত্রী দেশে দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছিল যে, ফ্যাসিজম বিরোধী গণশক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলল না। যা মাত্র কিছুকাল আগে ছিল একেবারে অভাবনীয়, সে-ই ঘটল। ইংরেজ আর আমেরিকান সরকার সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি করল, নামজাদা সোভিয়েত বিরোধীরা সোভিয়েত প্রীতি প্রচার করতে বাধ্য হল।

গণশক্তির একটি বিরাট সুযোগ এল—যুদ্ধ চালিয়ে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করে নতুন দুনিয়া গড়ার সুযোগ এল। জাপান যখন লড়াইয়ে নামল তখন সর্বদেশের গণ আন্দোলনের কর্তব্য আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের দেশের দরজায় যুদ্ধ এসে পৌঁছেছে—আমরা চাই বা না চাই, আমাদের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করার ভূমিকা আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য আর সম্ভব রইল না। জাগ্রত চীনের বীর জনসাধারণের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম যুক্ত হয়ে গেল। সাম্যবাদী সোভিয়েত আর বিপ্লবী চীন হল সর্বদেশের জনসাধারণের পুরোধা। জনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু সবাই বুঝল না, কত বড় একটা পরিবর্তন যে ঘটে গেল, তা সবাই ধরতে পারল না। কেউ কেউ বলল যে ফ্যাসিজম আর সাম্রাজ্যবাদের লড়াই আমাদের তাতে কি? আমাদের কাছে দুইই সমান, আর হয়তো ফ্যাসিস্টরা আমাদের প্রভুদের তাড়িয়ে দিলে আমাদেরই স্বাধীন হবার রাস্তা খুলে যাবে। আরও শোনা গেল যে ফ্যাসিস্টরা···বলছে যে আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো ঝগড়া নেই, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা চায়, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদেরই বরং আমাদেরই সাহায্য করা উচিত।

এই অলীক মোহ যদি আমাদের আচ্ছন্ন করে থাকে তো সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।···দেশের উপকার করছি ভেবে ফ্যাসিস্ট কুমীরকে লোভ দেখিয়ে আনা হচ্ছে আত্মহত্যারই নামান্তর।···

ফ্যাসিস্টরা শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করেছে, সাম্যবাদের তারা চিরশত্রু, স্বাধীন চিন্তা তারা উৎপাটিত করেছে, সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্বর অভিযান তারা সর্বত্র চালিয়েছে···ফ্যাসিস্টরা আমাদের স্বাধীন করে দেবে ভাবার মতো বাতুলতা আর নেই।"

এই মূল্যবান প্রবন্ধটি পড়ে সেই যুগে সাধারণ মানুষদের অনেকেই হয়তো তাদের উৎকট ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি দূর করতে পেরেছিলেন—যা অনিবার্যভাবে সাহায্য করেছিলো বাঙলার প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। এই-রকম আরেকটি মূল্যবান প্রবন্ধের রচয়িতা বাঙলার প্রগতিশীল সাংবাদিকতার 'পিতামহ' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা যখনই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণ চালি-

য়েছে তখনই সত্যেন্দ্রনাথের শাণিত কলম কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে ঝল্‌সে উঠেছে।

পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম-বর্ষের প্রথম-সংখ্যাতেই আমরা তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সোভিয়েত যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' প্রকাশিত হতে দেখি। এই প্রবন্ধের কথাবস্তুতে নাৎসি তথা ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির আস্ফালন যে মানব সভ্যতার পক্ষে কত বিপজ্জনক এবং ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশিয়ার বিজয় যে কতটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য মণ্ডিত তা এই প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশ্লেষণ করেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখিয়েছেন। শেষে লিখেছেন, "···ফ্যাশিস্ত বিরোধী যুদ্ধ ভারতবর্ষেরও, এই বাস্তব সত্যের সহিত আমরা আজ মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি।···সোভিয়েতের রক্ত পতাকা নিপীড়িত মানবের মুক্তি পতাকারূপে এখনও সগর্বে উড্ডীন থাকিয়া অবিশ্বাসী ও অন্ধ বিশ্বাসীর সংশয় মোচন করিতেছে। ভারতের জাতীয় পতাকাও ঐ রক্ত পতাকার গৌরব মর্যাদা অর্জন করিবে, যদি আজ আমরা সম্মিলিত হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধারণ করি এবং ঘোষণা করি যে সোভিয়েত যুদ্ধ ও আমাদের সংগ্রামের মধ্যে মূলত কোন ভেদ নেই।"

৯

রুশ-বিপ্লবোত্তর আঠাশ বছরের বাংলা-সাহিত্যের রূপরেখা

মহান্ রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কিভাবে বিশ্বের অসীম শক্তিধর অথচ শোষিত কোটি কোটি জনগণের মাতৃভূমি রক্ষার অসম লড়াই-এ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে, পৃথিবীর প্রথম সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েট-রুশিয়া কিভাবে ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়ার সর্বত্র সবরকম বিপ্লব প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিয়েছে, শুধু তাই নয়—পৃথিবীর সমস্ত মুক্তিকামী দেশের স্বার্থে নিজেকে এমন শক্তিশালী করে তুলেছে যে আজ সে দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একত্র-আক্রমণকেও চূর্ণ করে দেবার স্পর্ধা রাখে। সোভিয়েট রুশিয়া, যার জন্ম রুশ-বিপ্লবের আগুন থেকে, আজ বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি হিসেবে শোষিত মানুষের কাছে উপস্থিত। রুশ-বিপ্লবের প্রভাব-নির্ণয়ের আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব কথা যথাসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ঐতিহাসিক ক্রমকে রক্ষা করে বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি।

পরাধীন ভারতবর্ষে এই বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ ইতিহাসও যথাসাধ্য প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ভারতবর্ষীও রাজনীতিতে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে পড়া সত্ত্বেও এবং অনুকূল পরিস্থিতি রচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতবর্ষে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারল না তাও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সবশেষে আলোচিত হয়েছে অবিভক্ত বাঙলাদেশ, তার রাজনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব-নির্ণয়ের অত্যন্ত জরুরী প্রসঙ্গটি। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় এসেছে বাঙলা-সাহিত্যের উপর ঐ বিপ্লব-এর প্রভাব চিহ্নিত করণের বিষয়টি।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে ও সতর্ক থাকতে হয়েছে

তা হচ্ছে এই যে, অবিভক্ত বাঙলাদেশ ১৯৪৭-এর ১৪ই অগাষ্টের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী, চতুর এক সাম্রাজ্যবাদী দেশের পদানত বিরাট উপ-মহাদেশের একটি প্রদেশ মাত্র। ফলে ঐ প্রদেশের সমগ্র জনগণ যদি একটি সুসংগঠিত মার্কসবাদী দলের ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে 'বিপ্লব'-এর দারুণ দাবানল সৃষ্টি করতো তাহলে তার পরিণাম কি হতো বলা মুশকিল। ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস সহ অমার্কসবাদী অন্যান্য রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন ও সর্বোপরি ধর্মভীরু সাধারণ জনগণ সেই বৈপ্লবিক উত্থানে কতখানি সাড়া দিতো সে সম্বন্ধেও সংশয় ছিলো। বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় মার্কসবাদী ও নানা বৈপ্লবিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব যে সে চেষ্টা করেননি এমনও নয়। যে কারণেই হোক ভারতবর্ষে দেশজোড়া বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতীয় সর্বহারাদের শোষণমুক্তি ঘটানো সম্ভব হয়নি এটাই ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রাজ-নৈতিক 'সত্য' ছিলো।

অথচ অবিভক্ত বাঙলাদেশের মার্কসবাদী দল, প্রগতিশীল নানা শ্রেণী ও বৃত্তির বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বিপ্লব'-এর আকাঙ্ক্ষা যে তীব্র হয়ে উঠেছিলো এটাও অত্যন্ত সত্য ছিলো এবং এই আকাঙ্ক্ষা যে জাগিয়েছিলো মহান্ অক্টোবর-বিপ্লব তার অজস্র প্রমাণ আছে। স্বদেশ ও বিদেশ-প্রবাসী বহু বাঙালী, অবিভক্ত বাঙলার বহু বৈপ্লবিক সংগঠন ও তাদের তেজী নেতৃত্ব, সর্বোপরি বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-বিশ্বাসী কবি লেখক নাট্যকার সাংবাদিক অভিনেতাদের এক বৃহৎ অংশই তখন 'বিপ্লব'-এর স্বপ্ন দেখতেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির দানবীয় আত্মপ্রকাশ, ইংরেজের তৈরি করা মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রচণ্ডতা বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কলমকে বৈপ্লবিক শক্তি ও তৎপরতা প্রদান করেছিলো। বাঙলা-সাহিত্য ও বাঙালী-সাংবাদিকতা সেদিন রোমান্টিক স্বপ্ন-বিলাসের স্বর্গ থেকে সমাজ ও সংসারের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁরা সেদিন নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন ফ্যাসী-বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘ, মঞ্চ ও পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। [পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে তার মোটামুটি একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে]

বাঙালী জাতির একটি বৃহৎ অংশ ও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল মানুষদের কর্মে ও সৃষ্টিতে সেদিন এক উদ্দীপক চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো। বিপ্লব, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, লেনিন, গোর্কী, ডিমিট্রিয়ভ, কমিনটার্ণ, লালফৌজ, সর্বহারা প্রভৃতি শব্দগুলি তখন বাঙালী-মানসে গভীর-ভাবে গেঁথে বসেছিলো। বাঙলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ও প্রগতিশীল সমস্ত রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে তখন বারবার রুশিয়া, রুশিয়ার বিপ্লব, রুশিয়ার সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়ার এক আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বাঙালী জাতির অন্তর থেকে উঠে এসেছিলো। এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম যে রুশ-

বিপ্লবের সার্থকতায়, সর্বহারাদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপনে ও পরবর্তীকালে এই নবজাত রাষ্ট্র কর্তৃক ফ্যাসিস্ট দানবদের সমূল বিনষ্টির মহাশক্তির মধ্যে নিহিত ছিলো তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বলা বাহুল্য, রুশ-বিপ্লব ও পরবর্তীকালে তার অমিত শক্তি অর্জনের অবিশ্বাস্য কাহিনী বাঙলা-সাহিত্য নানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর যে যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার মধ্যে অনেক ফাঁক, ফাঁকী, উচ্ছ্বাস ও শ্লোগানধর্মীতাও ছিলো। পাশাপাশি অবশ্য এর উল্টো প্রবণতাও ছিলো। তবে একটি কথা সত্য যে রুশ-বিপ্লবের ফলে বাঙলা-সাহিত্যের নানা বিভাগে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-কৃষক, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা বাঙলা-সাহিত্যে ব্যাপকভাবে লিখিত হতে আরম্ভ হয়েছিলো। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটকের ভাষায় অভিনবত্ব এসেছিলো। বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডার নূতন নূতন শব্দের সঞ্চয়ে সমৃদ্ধশালী হচ্ছিলো। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের উপমা ও রূপকল্পের জগতেও বিপ্লব ঘটে যেতে আরম্ভ করেছিলো। নূতন উপমা ও রূপকল্পের চমকে বাঙলার সাহিত্য-জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছিলো। এমনকি মিছিলে, মিটিং-এ শ্লোগানের সম্বোধনের ভাষাও বদলে গিয়েছিলো দারুণভাবে।

তবু বলতে হয়, এই উদ্দীপনা দিয়ে রাষ্ট্র কাঠামো বা স্বৈরাচারী শোষকের নির্বিচার শাসন-শোষণের অবসান ঘটানো যে যায় না একথা যখন বাঙালী জাতি তাদের রাজনৈতিক সচেতনা দিয়ে উপলব্ধি করছিলো তখন সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে তাঁদের বিপ্লবী চেতনা যে অনেকটাই কেবলমাত্র ঢক্কা নিনাদে পর্যবসিত হয়েছিলো একথা সত্য।

আসলে সেই যুগে এমন একটি পরিবেশ ও মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিলো যে লেখক, কবি, নাট্যকার, গায়ক, অভিনেতা, রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবীদের বামপন্থী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পাশে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিলো না। তার একটি সুফল পরবর্তীকালে সমগ্র বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের এই ক্ষুদ্র প্রদেশটি প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চা ও রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের এই প্রদেশটির অধিকাংশ মানুষ ও রাজনীতির কাছে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও হিংসা আজও প্রশ্রয় পায় না। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধিকারও মার্কসবাদী গোষ্ঠীদের হাতে মূলত ন্যস্ত হয়েছে এই প্রদেশের জনগণের বিপুল সমর্থনে। তার ভিত্তি কিন্তু রচিত হয়েছিলো মহান্ অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাবেই। গোটা ভারতবর্ষের না হোক ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের জনগণের রক্তের গভীরে যে বিপ্লবের জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিলো ও আছে—বাঙলা দেশের গত ৬০।৬৫ বছরের ইতিহাস সে

কথাকেই প্রমাণ করে। ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্যে পতিত রুশ-বিপ্লবের প্রভাবই যে এই শুভফল প্রসব করেছে এ ব্যাপারে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তাই ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী বাঙলা-সাহিত্যের শূন্যগর্ভ বিপ্লবী শব্দোচ্চারণকে সমালোচনা করলেও ঐ প্রচেষ্টা যে বাঙালী গণ-মানুষের রক্তে নতুন প্রজন্মের তড়িৎ স্পন্দন আনতে সহায়ক হয়েছিলো এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা রুশ-বিপ্লব-এর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু, শব্দ, রূপক, উপমার জগৎ কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিলো তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো। কিন্তু, তার পূর্বে আরেকটি ঐতিহাসিক সত্যের কথাও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের সব সব কবি লেখক নাট্যকার ও সাংবাদিক রুশ-বিপ্লব-এর লাল আগুনে শরীর গরম রেখেছিলেন এ সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তই অনৈতিহাসিক।

অবিভক্ত বাঙলাদেশে বহু প্রতিভাধর সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা ও সাংবাদিক সুযোগ থাকা ও পাওয়া সত্ত্বেও, জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথে না গিয়ে কেবল অন্তরের তাগিদেই দীক্ষা নিয়েছিলেন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও বিপ্লবের মন্ত্রে—যে দীক্ষা তাঁদের জীবনে এনেছিলো অসহ্য দুঃখ, আঘাত, মৃত্যু, বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও হতাশা। আজ তাঁদের অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিপর্যস্ত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তাঁরা একদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে কমিউনিস্ট-পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন 'বিপ্লব'কে সম্ভব করে তুলতেই। তাঁরা পার্টি-সংগঠনের সর্ব নিম্নস্তর থেকে উচ্চতম স্তরে বিচরণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা সমাজ-সত্য, নানা সত্য-শপথ, নানা আত্মসমালোচনার পরিণামকেই তাঁদের শাণিত কলমে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের ঐ সাহিত্য-প্রচেষ্টায় অনেক ফাঁক থাকলেও কোনো ফাঁকী ছিলো না। বহুনাম এই তালিকায় লিপিবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু আমরা শুধু সেই নামগুলি-কেই বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই যাঁরা একাধারে সৎ ও একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট ও অন্যধারে সৎ সাহিত্যসেবী ছিলেন; যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন হাজরা, গোপাল হালদার, বিজন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিশেষভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সমস্ত কমিউনিস্ট-পার্টির সদস্য-লেখক ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখকেরা সোভিয়েট-বিপ্লবের পর থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত যে তিরিশ বছর সময় পেয়েছিলেন সে সময়টা যদি তাঁরা তাঁদের সাহিত্য-ব্রতে ও রাজনৈতিক মতাদর্শে একাত্ম থাকতে পারতেন তাহলে ভারতবর্ষে না হলেও অন্তত অবিভক্ত বাঙলা দেশে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য শক্তি

অর্জন করতে পারতো। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন আরো দানা বাঁধতো, হয়তো 'বিপ্লব'-এর অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যেত ভারতবর্ষ।

আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি। পরন্তু চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী প্রগতিশীল কবি ও লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে 'সাহিত্যাদর্শ' নিয়ে এমন বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিলো যে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল লেখকসমাজ স্পষ্টত দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিরোধ শেষে বিদ্বেষ এবং পরিণামে বন্ধু বিচ্ছেদের কাছে পৌঁছেছিলো। কমিউনিস্ট পার্টির 'সাহিত্যাদর্শ' নিয়ে বিবাদ বহু লেখক-কবির মানসিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে ক্ষান্ত হয়নি শুধু, তাঁদের সৃজন-প্রতিভার অবনয়নেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো। এই হতভাগ্য কবি লেখকদের মধ্যে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, আবু সৈয়দ আইয়ুব-এর মতো প্রতিভাবান মানুষেরা। আরো দুর্ভাগ্যের কথা, এই 'কুরুক্ষেত্র' যুদ্ধের সর্বশক্তিমান শিবিরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, সাহিত্য-স্রষ্টা নন। সেদিন পার্টিতে তাঁদের নির্দেশই ছিলো চূড়ান্ত এবং অবশ্য পালনীয়। এই অমোঘ নির্দেশের কাছে অনেক দ্বিধাগ্রস্থ লেখক সেদিন নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বাঙলাদেশে এই অবিরাম আত্মসমর্পণের জলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন সেইযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফল ভালো হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনী-শক্তি তারপর থেকেই অধঃগামী হয়েছিলো।

অবশ্য সেদিন 'কমিউনিস্ট পার্টির' নেতৃবৃন্দের কাছেও এই তৎপরতা ও নির্দেশ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় ছিলো না। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিকেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও নির্দেশ মেনে চলতে হতো কেননা তখন পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীর ও যে কোনো দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের কাছে সোভিয়েট-দেশ ছিল 'পিতৃভূমি'। তখন সোভিয়েট-পার্টির ঈষৎ কোনো পাশ পরিবর্তন, সোভিয়েট নেতৃবর্গের যে কোনো বক্তৃতা বিস্তার করতো সুদূরপ্রসারী প্রভাব—বিশেষভাবে সেই বক্তৃতা যদি হতো কমরেড স্টালিনের। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছেও তাই সেদিন স্টালিন ও তাঁর সরকারের ঘোষিত 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যাদর্শ'কে বাঙালী কমিউনিস্ট লেখকদের অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে দর্পিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো।

কমরেড লেনিন ১৯০৫ সালে 'Party Literature and Party Organisation' পুস্তিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা বিস্মৃত হয়ে লেনিনের বক্তব্যের আভিধানিক অর্থকে মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শ বলে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালানো হয়েছিলো। আসলে ১৯০৫ সালে রুশিয়ার ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বলশেভিকদের তরফ থেকে যে সংবাদপত্র ও অন্যান্য নানা ধরণের বিশ্লেষণ ধর্মী সাহিত্য প্রকাশিত হতো তাতে যাতে যথেচ্ছাচারের কোনো সুযোগ না থাকে

এবং সেখানে কেবল যেন নির্দিষ্ট দলীয় নীতি ও আদর্শ মেনে প্রকাশিত হয়, দলভুক্ত কোনো লেখক, দলের কাগজে নিজের সাহিত্যিক কৌলীন্যের দাবীতে যা খুশী লেখার স্বাধীনতা বা সাহস না পান সেজন্যই লেনিন ঐ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন [Down with non party-writers—এই প্রসঙ্গ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে]।

লেনিনের জীবিতকালে ও তাঁর মৃত্যুর দশকেও (কুড়ির দশকে) রুশ-সাহিত্য ও শিল্পকলায় সৃজনশীলতার এক আশ্চর্য উচ্ছ্বাস এসেছিলো তা আমরা লক্ষ্য করেছি। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশে পার্টির হস্তক্ষেপ সার্বভৌম হয়ে ওঠেনি। শিল্পীর আত্মবিকাশের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিলো। এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় লেনিন-পত্নী ক্রুপস্কয়ার একটি চিঠি থেকে, যে চিঠির কথা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৪ সালে Drushba Narodov পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, লেনিনের ঐ বহু আলোচিত প্রবন্ধটির বিবেচ্য বিষয় ছিলো 'পার্টি'-সাহিত্য, রম্য সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার ঐ প্রবন্ধের বিবেচ্য ছিল না। বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বে রুশ দেশের সমস্ত বলশেভিক লেখক, কর্মী যাতে দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং তাঁদের লেখনী যেন এক লক্ষ্যে স্থির থাকে এই অভিপ্রায়েই লেনিন Non-Party লেখকদের অবলুপ্তি কামনা করেছিলেন এবং সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ হুঁশিয়ারীর একান্ত প্রয়োজনও ছিলো।

কিন্তু স্টালিনের আমলে রুশিয়াতে লেখকদের ইউনিয়ন সংগঠিত হলো। ১৯৩৪ সালে ইউনিয়নের প্রথম-কংগ্রেসে জদানভের জবানীতে 'সোসালিস্ট রিয়ালিজম' রাষ্ট্রীয় সাহিত্যাদর্শের মর্যাদা অর্জন করলো। জদানভ বক্তৃতায় গর্ব করে ঘোষণা করলেন "Our Soviet literature is not afraid of the charge of being 'tendentious'.[১] Yes Soviet literature is 'tendentious' ". এই প্রসঙ্গে তিনি মার্গারেট হার্কনেস ও মিস কাউটস্কিকে লেখা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের চিঠি দুটির বক্তব্যেরও বিরোধীতা করলেন [চিঠির উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে]।

লেনিনের লেখার কৃত-ব্যাখ্যা ও এঙ্গেলসের সাহিত্য-বিষয়ক বক্তব্যের বিরোধিতা করে 'রুশ লেখক ইউনিয়ন' যে নতুন রাষ্ট্রীয়-সাহিত্যাদর্শ প্রচার করলেন তার ফল শুভ না অশুভ হবে তার বিচার ভবিষ্যৎ কালই করবে [সেই তর্ক আজ বিশ্ব জুড়ে সোচ্চার]।

কিন্তু স্টালিনের আমলের সাহিত্যের এই 'নববিধান' যে অবিভক্ত-বাঙলা দেশের পার্টি-লেখক ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী লেখক-সম্প্রদায়কে গভীর সংশয় ও বিতর্কে জড়িয়েছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রুশিয়ার 'লেখক ইউনিয়ন'-এর নির্ধারিত রাষ্ট্রীয়-সাহিত্যাদর্শকে রুশিয়ার

বহু খ্যাত-কীর্তি লেখক-কবিরা মেনে নিতে পারেননি, আজও পারছেন না, ফলে তাঁদের উপর নেমে এসেছে আসছে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দেশ দ্রোহিতার অভি-যোগ, কারাবাস ও নির্বাসন।

লক্ষ্য করবার মতো বিষয়, সোভিয়েটের এই সাহিত্যাদর্শকে সোভিয়েট রুশি-য়ার বাইরের বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক কবি শিল্পী মেনে নিতে পারেন নি। যেমন কমিউনিস্ট লেখক বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট, পাবলো পিকাসো। ব্রেখ্‌ট প্রতিবাদে লিখেছিলেন "No painter can paint when his hand trembles before the judgement of the functionary who may perhaps be politically well-informed and conscious of his political responsibility, but who is aesthetically badly trained and not fully aware of his responsibility to the artist."[২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্পেনের এ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পাবলো পিকাসোও ১৯৪৪ সালে তাঁদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পিকাসো রুশ কমিউনিস্ট-পার্টির এই সাহিত্য ও শিল্পাদর্শের Formulaকে মেনে নেননি। পরন্তু এই প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে বন্ধু ইলিয়া এরেনবুর্গকে বলে-ছিলেন, "You ought to rationalise the production of paint. At your factories they should manufacture mixed colours and level the tubes 'for the face', 'for hair', 'for military uniform'. That would be much more practical."[৩]

পিকাসোর সমস্ত শিল্পকলা স্ট্যালিন-জদানভ সমর্থিত 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর সোচ্চার প্রতিবাদ। এমনকি তাঁর 'গুয়ের্ণিকা' ছবি নিয়ে পার্টি নেতাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস সে ছবি সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম-এর ধার কাছ দিয়ে যায় না। তবু পিকাসোর বিরুদ্ধে তাঁর দেশের বা অন্য কোনো দেশের পার্টি-নেতৃত্বের শাসনতান্ত্রিক বা দলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাঁর বিরুদ্ধে কমিউ-নিস্ট-শিবির থেকে একটি প্রতিবাদী স্বরও উচ্চারিত হয় নি। এমন হবার কারণ পিকাসোর অসামান্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কমিউনিস্ট-পার্টির সাংস্কৃতিক নেতারা যেহেতু পিকাসোর খ্যাতিকে নিজেদের প্রচারের প্রয়োজনে অবিরাম ব্যবহারে অভ্যস্ত সেহেতু পিকাসোকে পার্টির সমালোচনা ও ভর্ৎসনা কখনো শুনতে হয়নি। কমিউনিস্ট হওয়া সত্বেও এলুয়ার বা পাবলো নেরুদাও দিয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য সৃজনী শক্তির পরিচয়।

দুর্ভাগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর সেই ব্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিলো না। তাই বাঙলা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় বিষ্ণু দে'র বিতর্কিত প্রবন্ধ 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা'কে নিয়ে যখন বাঙলাদেশে ঝড় উঠে-ছিলো আর পার্টির তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব যখন তীব্র আক্রমণে বিষ্ণু দে'র

প্রবন্ধের বিষয়কে ছিন্ন ভিন্ন করছিলেন তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিষ্ণু দে'র বক্তব্যের প্রতিবাদে কলম ধরতে হয়েছিলো। বিষ্ণু দে'র বক্তব্য ছিলো, আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট-পার্টির লাইন বলে কোনো লাইন নেই, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নান্দনিক দৃষ্টি নিয়ে সমালোচনার অধিকার আছে সমালোচকদের।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদী প্রবন্ধে বিষ্ণু দে'র 'তির্যক অবিনয়'কে নিন্দা করে জানিয়েছিলেন, 'বিষ্ণু বাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই''। কিন্তু মানিকবাবু বিষ্ণু বাবুকে নাকচ করলেন না, পরন্তু প্রবন্ধের শেষে স্বীকার করে নিলেন, সব লেখককেই মার্কসিস্ট হতে হবে এমন নিয়ম যখন নেই তখন আর "উপায় কি''। দুটো দল হয়ে গেছে। "ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি প্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।'' বিষ্ণু দে'র মতের বিরুদ্ধে সেই সময় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন নীহার দাশগুপ্ত, ভবানী সেন, প্রদ্যোৎ গুহ, নরহরি কবিরাজ। ভবানী সেন একটি প্রবন্ধে জানালেন "বিষ্ণু বাবু মার্কসিস্ট নন, মার্কসবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।'' নরহরি কবিরাজ তার প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন "মার্কসবাদী সাহিত্য সৃষ্টির নামে সাহিত্যিকের এই শ্রেণী নিরপেক্ষ জনগণ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।''

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু বাবুকে বরদাস্ত করেছিলেন বলে তাঁকেও পার্টির তীক্ষ্ণ সমালোচনা শুনতে হয়েছিলো।

এই সময়ে আবু সৈয়দ আইয়ুবের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত আরেকটি প্রবন্ধ প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো [এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে]।

'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রদ্যোৎ গুহ'র 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' প্রবন্ধটির বক্তব্য অনেক কমিউনিস্ট লেখক মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তী সংখ্যায় পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী তাত্ত্বিক-নেতা ভবানী সেন "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'' প্রবন্ধ লিখলেন। যাঁরা একদিন প্রদ্যোৎ গুহের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পার্টি নেতৃত্বের কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁরাও এবার পার্টি নির্দেশেই ভবানী সেনের বক্তব্যকে মেনে নিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মানলেন এবং ভবানী সেনের প্রবন্ধের স্বপক্ষে তাঁকেও প্রবন্ধ লিখতে হলো। ভবানীবাবু তাঁর প্রবন্ধে, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রগতি-বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার ঐতিহ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হলেও তাঁর মন এই সমালোচনায় সায় দেয়নি। তিনি প্রদ্যোৎবাবুর প্রবন্ধে যান্ত্রিকতার প্রভাব দেখেছিলেন। তিনি প্রদ্যোৎবাবুর ফতোয়া "লোককবির আঙ্গিকই কমিউনিস্ট কবিকে গ্রহণ করতে হবে''—বিষ্ণু দে সম্বন্ধে এই মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাননি। পরন্তু জানিয়ে-

ছিলেন বিষ্ণু দে'র কবিতার "আঙ্গিক মূলত পুরান ও পাঁচালীর আঙ্গিক—অতীতের সংগ্রামহীন শান্ত ও মন্থরগতি গ্রামাজীবনের আবেগ চেতনা রূপায়নের উপযোগী।" ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় আক্রান্ত হলেন এই প্রবন্ধের জন্য। এবারের আক্রমণকারী ছিলেন শীতাংশু মৈত্র। এমন আক্রমণ পরবর্তীকালে তাঁর উপর আরো এসেছে—সে ইতিহাস স্বতন্ত্র এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সময়সীমার (১৯৪৭) পরে। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আপাতত নীরব থাকছি।

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন অসামান্য সৃজনশীল লেখককে সামনে রেখে এই কথাটুকু প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে সোভিয়েট বিপ্লব সংঘটিত হবার পর সেই নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহিত্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ কি হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন? পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আছে এবং যে দেশে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' চলছে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে সে সে দেশের কমিউনিস্ট লেখকদের সাহিত্য ধর্ম কি হবে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ ছিল কি?

ইতিহাসের তথ্য প্রমাণ করছে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও লেনিন যা চেয়েছিলেন স্টালিন,-জদানভ নেতৃত্বে গঠিত 'সোভিয়েত লেখক সংঘ' তার সঠিক ব্যাখ্যা না করে এবং লেনিন-এঙ্গেলসের সাহিত্য-বিষয়ক অভিমতের বিরোধিতা করে যে নতুন 'সাহিত্যাদর্শের' পক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন তাকে সোভিয়েট দেশ সহ অন্যান্য বহু দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রগতিশীল অনেক লেখক কবিরা মেনে নিতে পারেননি।

তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের শিবির স্পষ্ট দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। একপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জদানভ ও লুই আরাগ, অপর পক্ষে ছিলেন ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি ও গারোদি'র মতো মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা।

গারোদি পন্থীদের বক্তব্য ছিলো—আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোনো লাইন নেই। সাহিত্যের নান্দনিক দিক, লেখকের স্বাধীনতা এগুলি সর্বদা বর্জনীয় হতে পারে না।

বিপরীতপন্থী আরাগঁর বক্তব্য ছিলো, নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (DIALECTIC MATERIALISM) মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে।

বিংশ-শতাব্দির বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রগতিশীল লেখক-গোষ্ঠী স্পষ্টতঃ আরাগ ও গারোদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। গারোদী-পন্থীদের মধ্যে ছিলেন কবি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, শান্তি বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবু সৈয়দ আইয়ুব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক কবিরা।

অপরপক্ষে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর বাইরেও আরেকটি শিবির ছিলো। সেই শিবিরে সমবেত হয়েছিলেন সেই সময়ের আরো কিছু শক্তিশালী লেখক যাঁরা কমিউনিস্ট বা বামপন্থী রাজনীতি না করলেও নানা প্রগতিশীল ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে, মন্বন্তরে, খরায় বন্যায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে এঁরা সেদিন সভ্যতা, মানবতা, শান্তি ও অহিংসার স্বার্থে প্রগতি লেখক-সংঘ ও ফ্যাসি বিরোধী লেখক-সংঘের পতাকার নীচে সমবেত হতে দ্বিধা বোধ করেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম-এর মতো সে যুগের খ্যাত-কীর্তি লেখক কবি প্রাবন্ধিকরা।

প্রবহমান ইতিহাসের শুভাশুভ নিয়ে, অনিবার্য ভবিষ্যতের অনিবার্যতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার অধিকার সব স্রষ্টারই আছে। কোনো পার্টির কাছে দায়বদ্ধ থাকা বা না থাকার উপর এই ভাবনা স্থির হয়ে থাকে না। তাই বিষ্ণু দে'র মতো 'মার্কসবাদী শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব', দ্বিধাগ্রস্থ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলাম, পার্টির বশম্বদ নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, ননী ভৌমিক ও অ-কমিউনিস্ট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিভিন্ন শিবিরের লেখকগোষ্ঠীর লেখার বিষয়বস্তুতে কিন্তু একই জীবন ও জীবন-সংগ্রামে ছবি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অঙ্কিত হতে থাকে।

সাহিত্যে 'সর্বহারা'র জীবন ও মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসকে চিত্রিত করার তাগিদ ইতিহাসের অনিবার্যতায় এবং ঐতিহাসিক সচেতনতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসতে থাকে। তাই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট হবার আগে লেখা হয়ে যায় 'পদ্মানদীর মাঝি'—তারাশঙ্করের হাতে জন্ম নেয় 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর' উপন্যাস। কমিটেড মনোরঞ্জন হাজরা লেখেন 'নব-জীবনের পথে', 'নোঙরহীন নৌকা', 'পলিমাটির ফসল' উপন্যাস—অপর দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেন 'উপনিবেশ' ও 'মহানন্দা' উপন্যাস। কমিটেড সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'পদাতিক' আর 'অপরিচ্ছন্ন' 'মার্কসিস্ট জ্ঞান' নিয়ে বিষ্ণু দে রচনা করেন 'সন্দীপের চর'।

মত-পথ ও তত্ত্বের লড়াই যেখানেই যাক তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, শৈলজানন্দ, মানিক, সুভাষ, সুকান্ত, নজরুল ও বিষ্ণু দে'র উপন্যাস, গল্প-কবিতা কিন্তু পাঠকের কাছে সমান বন্দিত হয়। বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কবিতা

ও কবিতার চরণ যে আজ 'প্রবাদে' ও আন্দোলনের 'হাতিয়ারে' পরিণত হয়েছে তাঁর রচয়িতাদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন বিষ্ণু দে, নজরুল ইসলাম অপর দিকে ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন-এর মতো কবিরা।

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের এই সাতাশ বছরের সৃষ্টিকর্মকে বিশ্লেষণ করলে সঙ্গত কারণেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অবিভক্ত বাঙলাদেশের অধিকাংশ লেখক কবি প্রবন্ধকার ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশকে ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন। এই ঠিক অনুধাবন-এর ব্যাপারটিকে প্রায় 'প্রত্যয়ে' পরিণত করেছিলো ১৯১৭ সালে ঘটে যাওয়া রুশ-মহাবিপ্লব-এর সার্থকতা ও ঐ প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ও শক্তি সঞ্চয়ের অকল্পনীয় সত্যতার মধ্যে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের প্রায় সব লেখক কবি, নানা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও জনগণের একটি বৃহৎ অংশ যে সেদিন রুশ-বিপ্লবের সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কমিউনিজমকে মানুন না মানুন একথা সবাই মেনেছিলেন যে পৃথিবী থেকে মুষ্টিমেয়ের শোষণ জুলুমকে শেষ করে দিতে হবে, মানুষ ও মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদকে সর্বসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাতে হবে। এই মন্তব্যের সত্যতা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক যে কোনো লেখক ও বুদ্ধিজীবীর রচনা থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যায়।

তাই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এই নব আশ্বাসের বাণীতে উদ্দীপ্ত ও সেই সঙ্গে বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী। ভারতবর্ষের আর কোনো প্রাদেশিক-সাহিত্য, ইতিহাসের একটি 'ঘটনা' থেকে এতো প্রেরণা লাভ করে এমন অভিনব ও সমৃদ্ধ হতে পারেনি। তাই অক্টোবর-বিপ্লব-এর কাছে বাঙালী জাতি ও বাঙলা সাহিত্যের ঋণ অপরিশোধ্য। যদি ভারতবর্ষীয় জনগণ কখনো বিপ্লব সাধন করে তখন বাঙালীর এই দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনা নিশ্চয়ই দাবি করবে যে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা জনগণের বৈপ্লবিক-চেতনাকে অনেকটাই উদ্দীপ্ত করেছিলো।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে বা 'উপসংহার' অংশে আমরা বাঙলাদেশের কিছু কমিউনিস্ট ও বামপন্থায় বিশ্বাসী কবির কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাবো কিভাবে এই সমস্ত কবির রক্তধারায় অক্টোবর-মহাবিপ্লব-এর প্রভাবের জোয়ার স্পর্শ লেগেছিলো এবং সেই উদ্বেলিত ঢেউ-এ তাঁদের কবিতায় যে সুর বেজেছিলো তার অনুরণন আজো আমাদের মনে ভারতবর্ষে এখনো অনাগত এক বিপ্লব-এর স্বপ্নচ্ছবিকে বারবার জাগিয়ে তোলে।

শুধু কি তাই? এই সমস্ত কবিতার বিষয়, ছন্দ, শব্দমালা, উপমা ও রূপক-এর চমৎকারিত্ব বাঙলা আধুনিক-কবিতাকে এক নতুন মাত্রা (Dimension)

প্রদান করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ইতিহাসের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নেপথ্য-কাহিনী, তার নেতৃত্ব, শ্লোগান, পতাকার চিহ্নের কথা, বাঙলা-কবিতায় বারবার উচ্চারিত হলেও তা প্রচার-সাহিত্যের ধর্ম লাভ করেনি, লাভ করেছে শাশ্বত সাহিত্য মূল্য। বাঙলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে তাজা ও নবীন অনেক অদৃষ্টপূর্ব শব্দাবলী ও সৃষ্টি হয়েছে আশ্চর্য উপমালোক।

১০

উপসংহার

যদিও এই 'উপসংহার' পর্বে আমরা আধুনিক বাঙলা-কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাবো অক্টোবর মহাবিপ্লবের প্রভাব বাঙলা-কবিতাকে কিভাবে অনু-প্রাণিত করেছে, কিন্তু কখনোই বিস্মৃত হবো না যে এই প্রভাব বাঙলা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং চমৎকারিত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে সর্বোত্তম-ভাবে—তাই বাঙলা-কবিতা থেকে এই উদাহরণ সংগ্রহের পরিকল্পনা।

সন্দীপের চর
বিষ্ণু দে
প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭

কবিতার নাম **মৌভোগ**

"এদিকে ওড়ে লাল কমলের নীল কমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।"

[ব্যবহৃত শব্দ কাস্তে, লাল নিশান, মজুর। বাঙলা রূপকথার দুই জন-প্রিয় রাজপুত্রের সঙ্গে উপমিত হয়েছে কৃষক-মজুরের অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। রূপকথাতেও লালকমল ও নীল-কমল ছিল দুই ভাই।]

কবিতার নাম **লালতারা**

"জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা
*   *   *
দুচোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা।"

[ব্যবহৃত শব্দ লালতারা। চোখের দুটি কালো তারার সঙ্গে ক্রেমলিনের প্রাসাদশীর্ষে স্থাপিত উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে কৃত্রিম তারার উপমার চমৎকারিত্ব লক্ষ্যণীয়]

কবিতার নাম **সমুদ্রে স্বাধীন**

"রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে।"

[ব্যবহৃত শব্দ রুশ বালে। হাওয়ায় পাহাড়ের ভেসে যাবার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা যেমন দর্শককে মুগ্ধ করে রুশ বালের নর্তক-নর্তকীদের শরীরকে বাতাসের মতো ভারমুক্ত করে স্বচ্ছন্দে নেচে বেড়ানোর অনায়াস ছন্দ ও তেমনি মুগ্ধতা আনে। উপমাটি তুলনাহীন।]

কবিতার নাম **চৈত্রে বৈশাখে**

"এ মৃত্যু, মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন।"

[ব্যবহৃত শব্দ লেনিন।]

কবিতার নাম **১৫-ই অগাস্ট**

"উনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই
মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে।"

[ব্যবহৃত শব্দ জিন্দাবাদ।]

পূর্ব লেখ

১৯৩৫-১৯৪০ সালের মধ্যে রচিত

কবিতার নাম **মুদ্রা রাক্ষস**

"মার্কস না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভুলে' রাজনীতিকে পেশা।"

[ব্যবহৃত শব্দ মার্কস, রাজনীতি।]

কবিতার নাম **৬নং কবিতা**

"আকাশে উঠল ও কি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।"

[ব্যবহৃত শব্দ কাস্তে। ভ্রান্তিমান অলংকারের এক সুন্দর ও অভিনব

উদাহরণ। বঙ্কিম চাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকায় চিহ্নিত বাঁকা কাস্তের তুলনা অত্যন্ত আকর্ষক]

কবিতার নাম **জন্মাষ্টমী**

"লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
এবল ইন,
টারেষ্টিং" * *
অলকা, আমার দিন রজনীর স্বপ্নভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্টালিনের মতো।"

[ব্যবহৃত শব্দ লেনিন, স্টালিন]

কবিতার নাম **কোডা**

"সান্ধ্য-সভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশ-বিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়।"

* * * *

"গোপনতা মানি যুদ্ধের পরামর্শে
তবু এ-জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণী সংঘর্ষে
নেতি প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয়?"

[ব্যবহৃত শব্দ স্তালিনগ্রাদ, শ্রেণী সংঘর্ষে।]

পদাতিক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রথম সংস্করণ, ১৯৪০

কবিতার নাম **মে-দিনের গান**

"চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।"

[ব্যবহৃত শব্দ চিমনি, সাইরেণ-শঙ্খ, হাতুড়ি ও কাস্তে। কারখানার চিমনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা তীক্ষ্ন সাইরেনের আও-

রাজের সঙ্গে শঙ্খধ্বনির তুলনা আমাদের সচকিত করে তোলে।]

কবিতার নাম — **সকলের গান**

"কমরেড আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?"

[ব্যবহৃত শব্দ — কমরেড, লাল উল্কি]

কবিতার নাম — **কানামাছির গান**

"কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ
জানি, আজ নেই অন্যগতি,
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

* * *

এখানে এসেছি আষাঢ়ে একদা
মিলের ধোঁয়ায় পড়লো মনে,
কাল বৈশাখী নামবে যে কবে
আমাদের হাত মিলানো গানে।"

[ব্যবহৃত শব্দ — লাল প্রত্যূষ, কৃষক-মজুর, মিলের ধোঁয়া, হাত-মিলানো গানে। 'লাল প্রত্যূষ' ও 'কাল বৈশাখী' শব্দ দুটিতে যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তার অর্থ বিপ্লব-এর সূচনা ও ধ্বংসের তাণ্ডবে পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে উল্টে দেওয়া।]

কবিতার নাম — **নারদের ডায়রি**

"নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা ;
ঈশ্বর-ব্যক্তির টিকি পাবে না কো নাসিক চড়াই,
আদালত সচ্চরিত্র, রেস্তোরাঁয় আড্ডা তাই ভোঁতা।"

[ব্যবহৃত শব্দ — লালকোর্তা সূর্য, নিষিদ্ধ খনির গর্ভ। 'লালকোর্তা সূর্য' বলতে বোঝানো হয়েছে সূর্যের মতো প্রদীপ্ত 'লাল-ফৌজ'কে। 'নিষিদ্ধ খনির গর্ভ' বলতে বোঝানো হয়েছে বেআইনী, আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি। এতো জান্তব অর্থ অথচ কবিতা।]

কবিতার নাম **পদাতিক**

"চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বান-বিষ্ঠা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট ?
বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

* * * *

উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে।

* * *

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থের উল্লাস।"

[ব্যবহৃত শব্দ চীনা লালসৈনিক, বেঅনেট, বোমাত্মক এরোপ্লেন, বিস্ফোরক দিন, বিপ্লব, অগ্নিবর্ণ সংগ্রাম, সংক্রামক স্বাস্থের উল্লাস, গলিতনখ পৃথিবী। এই কবিতায় 'বোমাত্মক', 'বিস্ফোরক দিন', 'সংক্রামক স্বাস্থের উল্লাস' প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙলা কবিতার জগতে নতুন তো বটেই দুঃসাহসিকও বটে। যুদ্ধ পিপাসু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি সারা পৃথিবীর উপর অপঘাত মৃত্যুর যে খেলায় মেতেছে তাকে কি নিদারুণ শ্লেষাত্মক বাক্যে কবি প্রকাশ করেছেন। কবির শপথ উচ্চারণের চরণটিও কি দৃপ্ত—'গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো সংক্রামক স্বাস্থের উল্লাস']

কবিতার নাম **শ্রেষ্ঠী বিলাপ**

"জনজাগরণে সদলবলেই মেনেছি হার
হে বলশেভিক, মারণমন্ত্র মুখে তোমার।
ইতিহাস দেশ বিদেশে ক্ষিপ্র ধরে কৃপাণ,
বন্দরে দল গড়েছে শ্রমিক, গ্রামে কৃষাণ।
রোখো বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার করো নিপাত
হে দীনবন্ধু, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত।"

[ব্যবহৃত শব্দ জনজাগরণ, বলশেভিক, বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার করো

নিপাত। এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি সেই যুগে রাজনৈতিক-উত্থানের দিনগুলিতে আতঙ্কিত ধনিক সমাজের মনের কথাটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন।]

ঘুম নেই

স্থকান্ত ভট্টাচার্য

রচনাকাল : ১৯৪০ ও পরবর্তী কয়েকটি বছর

কবিতার নাম **পয়লা মে'র কবিতা, ১৯৪৬**

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?

* * *

সন্ধান করি তাজা রক্তের
তৈরী হোক, লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।"

[ব্যবহৃত শব্দ লাল আগুন, তাজা রক্ত, লাল আগুনে ঝলসানো]

এই কবিতার প্রভাব প্রসঙ্গে স্থকান্ত ভট্টাচার্যের সমসাময়িক স্থভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন "...স্থকান্তের সেই ডাক আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে। অগ্নিকোণের সমস্ত তল্লাট জুড়ে শৃঙ্খলিত মানুষ আজ উঠে দাঁড়িয়েছে।"[১]

কবিতার নাম **রোম ১৯৪৩**

"ভেঙেছে সাম্রাজ্য স্বপ্ন ছত্রপতি হয়েছে উধাও
শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর
'সাথী, আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়ার নাও'
রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির।

* * *

এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে
যদিও কুয়াসা ঢাকা আকাশের নীল
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েট পাশে।"

[ব্যবহৃত শব্দ শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ, হাতিয়ার, ত্বরিত সূর্য, বিপ্লবী, সোভিয়েট]

কবিতার নাম **প্রিয়তমাস্থ**

"সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে

আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি
স্বদেশের সীমানায়।
ধূষর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী,
স্নিগ্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে
নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার অপরাহত রাইফেল হাতে :"

[ব্যবহৃত শব্দ — প্রহরী, ধূষর তিউনিসিয়া, স্নিগ্ধ ইতালী, নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তি, অপরাহত রাইফেল]

পূর্বাভাস

সুকান্ত ভট্টাচার্য

রচনাকাল : ১৯৪০-১৯৪৪

কবিতার নাম — **উদ্যোগ**

"বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হ'য়ে যাক নিশ্চিহ্ন,
ঘরে তোলো ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।"

[ব্যবহৃত শব্দ — দুর্জয় ঘাঁটি, দুর্বৃত্ত, একাগ্র দেশ, বিপ্লবী প্রাণ, কাস্তে, হাতিয়ার, শান দাও। "মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে প্রত্যেক ধনবাদী দেশের কবিদের মধ্যেই বালক সুকান্তকে খুঁজে পাওয়া যায়।"[২] আমরা পূর্বেও বলেছি রুশ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের শোষিত মানুষের মনে যে আশা জাগিয়েছিলো সাহিত্যে তার অনিবার্য প্রভাব পড়ছিলো। অবিভক্ত বাঙলাদেশে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ছিলো গভীর ও ব্যাপক। কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ইচ্ছাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে দিয়েছিলো কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার আগে রচিত কিশোর সুকান্তর এই কবিতা। শুধু তাই নয়, সুকান্তর এই কবিতার প্রতিটি চরণ আজ বাঙলাদেশে প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে—
"বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।' ও 'ঘরে

তোলো ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।"]

কবিতার নাম **পরাভব**

"দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর।
বিজিগীষা ?—সন্দিহান আগামী দিনেরা :
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, (লাল-সূর্য মুক্তির প্রতীক ?
আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর।)"

[ব্যবহৃত শব্দ লাল-সূর্য, মুক্তির প্রতীক, অরণ্যবাসর]

কবিতার নাম **বিভীষণের প্রতি**

"... ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম
ছড়ায় শত্রু শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।
এখানে কৃষক বাড়ায় ফসল মিলিত হাতে,
তোমার স্বপ্ন চূর্ণ করায় শপথ দাঁতে,
যদিও নিত্য মূর্খ বাধার ব্যর্থ জুলুম :
তবু শত্রুর নিধনে লিপ্ত বাসনার ধুম।"...

[ব্যবহৃত শব্দ রক্ত-কুসুম, শবের গন্ধ, শপথ দাঁতে, মূর্খ বাধা, শত্রুর নিধনে লিপ্ত বাসনা।]

কবিতার নাম **জাগবার দিন আজ**

"...আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাবো আমার দেশ, যাবে না তা' শত্রুর দখলে,
তাই আজ ফেলে শিল্পীর তুলি আর লেখনী,
একতাবদ্ধ হও এখনি।"...

[কবির এই শপথ ছিলো সেদিন বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকের শপথ।]

সমর সেনের কবিতা (১৯৩৪-১৯৪৬)
সমর সেন
প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১

কবিতার নাম **রোমন্থন**

"...তারপরে কলেজে প্রবেশ, প্রথম যৌবন,

* * *

ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ :
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ কর,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।…"

[ব্যবহৃত শব্দ — ধর্মঘট, খাজনা, বরবাদ, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক]

কবিতার নাম — **পরিস্থিতি**

"…যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।"…

[ব্যবহৃত শব্দ — পৈত্রিক আশ্রয়, বেকার, বামপন্থী পত্রিকা, বিপ্লবের গান। লক্ষ্যণীয় এই যে, চল্লিশের দশকে একজন নিঃসঙ্গ, আশ্রিত বাঙালি বেকারেরও স্বপ্ন ছিল বিপ্লব।]

কবিতার নাম — **নানাকথা**

"…দুযুগ গত,
রক্ত আশ্বিনে রুষ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁতচাপা বৃদ্ধ গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম।…
…জানি, ওরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ ;
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে:
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।"

[ব্যবহৃত শব্দ — রুষ বিপ্লব, জারজ সন্তান, রসদ, দাঁতচাপা বৃদ্ধ গণিকা, গলিত ধনতন্ত্র, পঙ্গপাল। কবির ইতিহাস-চেতনা তাঁর কবিতায় খুব বেশি। কবি বিশ্বাস করেন, শস্য লোভী ও পরজীবী পঙ্গপাল-স্বরূপ ধনতন্ত্র একদিন কমিউনিস্ট পার্টির

হাতুড়ি ও কাস্তের যুগপৎ আঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে। অভি-
নব শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি অত্যন্ত দক্ষ]

কবিতার নাম বসন্ত

"…আসমুদ্র হিমাচল হে হিন্দুস্থান,
কানে বাজে
ক্ষুরধার নদীসঙ্কুল, চীনের আহ্বান।
কৃষ্ণসাগর থেকে বল্‌টিক পর্যন্ত
বিপর্যস্ত সোভিয়েট-ভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান
পোড়ামাটিতে কি চিড় ধরে, সবুজ অঙ্কুর ভিড় করে
হে হিন্দুস্থান ?…"

[ব্যবহৃত শব্দ চীনের আহ্বান, কৃষ্ণ সাগর থেকে বল্‌টিক পর্যন্ত, পোড়া-মাটি, চিড়, সবুজ অঙ্কুর ভিড় করে।]

কবিতার নাম পঞ্চম বাহিনী

"…দাড়ি নেড়ে ঝোড়ো হাওয়ায়
বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেঙ্গে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনে কে লিয়ে মরণকে লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।…
…এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কী করে আসবে বাটে,
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।…"

[ব্যবহৃত শব্দ দেঙ্গে, হিম্মৎ, জানোয়ার, হাতিয়ার, তেজ হাতিয়ার, বার্লিন। এই অসাধারণ কবিতায় কবি এক হিন্দুস্থানী মজুরের মুখে হিন্দী ও উর্দুতে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তার দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমরা মুগ্ধ হই। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মুক্তির নানা আন্দোলনে অনেক হিন্দি ও উর্দুতে রচিত গান কবিতা ও শ্লোগান বাঙালি জাতির কাছেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো।

একই কবিতার পরবর্তী স্তবক-এ কবি বৈষ্ণব পদাবলীর মেঘ মেদুর ছন্দে বিশ্বজয়ী হিটলারের পতনের ছবিকে কবিতার ভাষায় চিরকালীন করে তুলেছেন। "দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে"র আড়ালে আমরা যেন হতাশায় ও কান্নায়

ভেঙে পড়া দুর্ধর্ষ হিটলারের মুখচ্ছবিটিকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি।]

কবিতার নাম **খোলা চিঠি**

"…সাম্রাজ্যবাদের এই নাভিশ্বাস মুহূর্তে
প্রতি বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাহিনী
দেশে দেশান্তরে নতুন সাম্রাজ্যপ্রয়াসী।
তার প্রতিরোধ এ দেশে—আমাদের প্রতিজ্ঞা।…
…শীত শেষ, ১৯৪২ সালে মহাযোদ্ধা বসন্ত এল,
এ বসন্ত কাদের ? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে,
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিযানে,
উদয়ী সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে,…"

[ব্যবহৃত শব্দ সাম্রাজ্যবাদ, নাভিশ্বাস মুহূর্তে, প্রতিবিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাহিনী, লাল সৈন্য, বলিষ্ঠ জয়গানে, বন্য সৈন্য, উদয়ী সূর্যের দেশ।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রুশ-বিপ্লব ও তার পরবর্তী কালের প্রবহমান ইতিহাসের প্রভাব আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মবোধের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আমাদের মগ্ন-চৈতন্যেও। এই প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক তা নির্ণয় করতে হলে আরো বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন।

এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সেই বৃহৎ-কর্মের উদ্বোধন ঘটুক।

নির্দেশিকা